চতুর্থ বার ( মুদ্রিত ১৯০৭ )

# কালাচাঁদ।

দ্বিতীয় অংশ।

পঞ্চম পর্ব্ব

কলিকাতা,

৩৪।১ কলুটোলাষ্ট্রীট বঙ্গবাসী ষ্টীমমেসিন প্রেস হইতে

শ্রীবিহারীলাল সরকার দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মূল্য ।৵৹ ছয় আনা মাত্র।

# কালাচাঁদ।

## পঞ্চম পর্ব্ব—তীর্থ ভ্রমণ।

### প্রথম পরিচ্ছেদ।

কি লিখি?—কি চাও? অভ্রভেদী ভীমগিরির বর্ণন করিব কি? বড় নীরস! বীচিমালা-বিভূষিত মহাসাগর আঁকিব কি?—সে যে অতলস্পর্শ, ডুবিয়া যাইব। কলকলনাদিনী, তরতর-বাহিনী স্রোতস্বিনীর ক'থাটাই বলিনা কেন?—কাজ নাই, ভাসিয়া যাইব, হাবুডুবু খাইব। তবে ব্যোমপথের বিরাট কথা শুনিবে কি? সে যে শূন্যাকাব, কূল-কিনারা নাই! আচ্ছা, এইবারে না হয়,—পবিত্র-প্রণয়ের

প্রকরণ প্রকটিত হউক না?—প্রণয়ত পচে গেছে! ক্ষমা করিবেন!

কাঁঠালপাড়ার রাস দেখিবে কি? সে কাজ বড় মন্দ নয়! তবে আসুন।

একদিকে হুগলী-চুঁচুড়া-চন্দননগর, অন্যদিকে নৈহাটী-ভাটপাড়া-কাঁঠালপাড়া,—মধ্যে গঙ্গা। জনপদ সমৃদ্ধিশালী। প্রতিবৎসর হেমন্তকালে, গঙ্গার উপকূলে, কাঁঠালপাড়ার রাস-মহোৎসব হয়। বহুলোক সমাগত হয়। দেবদর্শন হয়; আর বেচা-কেনা, জুয়াচুরি-বাটপাড়ী, মারামারি-কাড়াকাড়ি সমস্তই চলে। যাত্রিদল-মধ্যে ইতরশ্রেণীর স্ত্রীলোকের সংখ্যাই বেশী। লম্পট, শঠ, শ্যাম-নটবরের সংখ্যাও নিতান্ত কম নহে। ভাল মানুষও গিয়া থাকেন। রাশীকৃত কেঁচকেঁচির মাজুরি রাসে বিক্রীত হয়। সে সময় গৃহস্থের গৃহে গৃহে ঐ মাদুর।

সূর্য্য ডুবু-ডুবু। সন্ধ্যা হয়-হয়। বেশ মিঠুনি শীত। যেখানে রাসের মেলা বসে,—বেচা-কেনা হয়, তাহার ঈষৎ দূরে, বটগাছের তলায় একটা

মহাকবি ঘনরাম শ্রীধর্ম্মমঙ্গলে ঠিক ঐ কথাই লিখিয়াছেন ;—

ঈষৎ কৃপায় যাঁর ভূপতি ভিক্ষুক।
পঙ্গু লঙ্ঘে গিরি বাচাল হয় মূক॥
সদা সুখ সম্পদ সভায় সুসম্মান।
রথাদি গো গজ বাজী নর নৌকা যান॥
ভাগ্যবান্ ভারতভুবনে সেই ধন্য।
লক্ষ্মীর চরণে যার ভকতি অনন্য॥
সেই ধনী ধার্ম্মিক ধরণী মধ্যে ধীর।
যবে যার মন্দিরে কমলা হন স্থির॥
সমর-সুধীর বীর স্থির মতিমন্ত।
গণনীয় গায়ক গভীর গুণবন্ত॥
সে হয় সুকৃতী সৎ সজ্জন সংসারে।
কৃপাবতী শ্রীমতী লক্ষ্মীর কৃপা যারে॥
লক্ষ্মীর কৃপার পাত্র জেতে যদি হীন।
দরিদ্র সজ্জন কত তাহার অধীন॥
সভায় সম্মান তার সর্ব্বলোকে করে।
বিফল জনম, যার লক্ষ্মী নাই ঘরে॥

কালিদাস লিখিয়াছেন ;—

একো হি দোষো গুণসন্নিপাতে
নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্কঃ ॥

এ কথার অন্য একজন কবি উত্তর দিয়াছেন ;—

একো হি দোষো গুণসন্নিপাতে
নিমজ্জতীন্দোরিরিতি যো বভাষে।
নূনং ন দৃষ্টং কবিনা হি তেন
দারিদ্র্যদোষো গুণরাশিনাশী।

অর্থই সংসারের সারভূত সামগ্রী। ম্লেচ্ছসমাজ, যবনসমাজ, বর্ব্বরসমাজ,—সর্ব্বসমাজেই অর্থ একমাত্র অদ্বিতীয় অধিপতি। কিন্তু হিন্দুর উপদেশ অন্যরূপ। অর্থ অকিঞ্চিৎকর! ক্ষুদ্র-অর্থ নিকৃষ্ট-বণিক্‌জাতিরই গ্রাহ্য, উৎকৃষ্ট-জ্ঞানীর গ্রাহ্য হইতে পারে না। হিন্দুসমাজ-শরীরের জ্ঞানই প্রাণ-স্বরূপ। তাই নগ্ন-পদ অর্থ-দরিদ্র ব্রাহ্মণের পদধূলি,—মহারাজচক্রবর্ত্তীর মুকুটে সসম্মানে স্থান প্রাপ্ত হয়। তাই মণি-কাঞ্চনে, মুক্তা-প্রবালে জ্ঞানী ব্রাহ্মণের স্পৃহা হয় না। তাই বিজ্ঞানময় ব্রহ্মচারী বিলাস-বাস ছাড়িয়া,

কৌপীনে পরিতৃপ্ত, অগুরুচন্দন ছাড়িয়া চিতাভস্মে প্রফুল্লচিত্ত,—মহামূল্য সুকোমল শয্যা ছাড়িয়া শ্মশানভূমে বৃক্ষতলে সুনিদ্রায় অভিভূত।

কিন্তু কালবশে, যুগধর্ম্মে হিন্দুর সমাজ-বন্ধন শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। আজ জ্ঞান-বিজ্ঞান গিরি-গহ্বরে লুক্কায়িত, পাপ-অর্থ পূর্ণ-প্রতাপে প্রস্ফুটিত। অর্থ-শশধর শরদাকাশে ষোলকলা বিস্তার করিয়া সদা হাসিতেছেন, জ্ঞান-রাঘব পাতালে মহীরাবণের গৃহে অবরুদ্ধ হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন! আগুন নিবিয়াছে, ছাই-ভস্মের আধিপত্য-কাল উপস্থিত হইয়াছে। সুধা নাই, ভগ্নভাণ্ড পড়িয়া আছে; মুক্তা নাই, শুক্তা সাদরে গৃহীত হইতেছে; সার-শস্য নাই, কেবল খোষাভুষির কারবার চলিতেছে!

চলুক। তথাচ,—এঘোর দুর্দ্দিনেও, হিন্দুসমাজ সর্ব্বশ্রেষ্ঠসমাজ,—আদর্শসমাজ। শ্রীকবিকঙ্কণ যাহাই বলুন, ঘনরাম চক্রবর্ত্তী যাহাই লিখুন,—হিন্দুসমাজের এখনও যা-কিছু অবশিষ্ট আছে, তাহা অন্য

সমাজের অনুকরণীয়। হিন্দুসমাজরূপ মহা-অট্টালিকার বালিচূণ খসিয়াছে বটে, খিলান ফাটিয়াছে বটে, কার্ণিস চটিয়াছে বটে, ভিত দমিয়াছে বটে, কবাটে ঘুণ ধরিয়াছে বটে, কিন্তু বনিয়াদ পাকা,—অনন্ত-কালের সাক্ষী-স্বরূপ সমভাবেই অবস্থিত। কাল-নিশ্বাসে সে বনিয়াদের অন্তর-বাহির কালো হয় নাই,—বর্ষায় তাহা সিক্ত হয় নাই, শীতে শঙ্কুচিত হয় নাই, গ্রীষ্মে সম্প্রসারিতও হয় নাই,—অনন্ত-কাল অচল অটল,—সদা সমান সমুজ্জ্বল! বৌদ্ধদল-পতিগণের বীর্য্যবান্ বিষম মন্ত্রৌষধ-গুণে সে বনি-য়াদ উড়িয়া যায় নাই; মুসলমানের সাত-শত-বর্ষ-ব্যাপী তীক্ষ্ণধার তরবারি প্রহারেও তাহার ঈষৎ চূণ খসে নাই,—আর, ইংরেজ অবিরত অগণিত তোপ দাগিয়াও, সে মহাভিত্তিকে একচুল পরিমাণও টলাইতে সক্ষম হন নাই।

ভিত্তি এরূপ দৃঢ়, এত পাকা বলিয়াই, বড়কর্ত্তা আজও ব্রাহ্মণ দেখিলেই প্রণাম করেন, ব্রাহ্মণ-গোমস্তাকে 'সেবকশ্রী' পাঠ লেখেন, স্নানান্তে গায়ে

নামাবলী দেন, সন্ধ্যার পর মালা জপেন;—তাই আজও বড়কর্ত্তার গৃহে ভিখারী মুষ্টিভিক্ষা পায়, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হয়, বিষ্ণু-সেবা হয়;—তাই আজও বড়কর্ত্তার নাকে তিলক, গলায় মালা, বুকে ছাপ্। তাই বড়কর্ত্তা আজও আহারের পূর্ব্বে পদযুগল ধৌত করেন, চর্ম্মপাদুকার পরিবর্ত্তে খড়ম পায়ে দেন, ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া অন্ন-ব্যঞ্জনাদি মুখে তুলেন। মহীরুহ শুকাইয়াছে,—কিন্তু মূল এখনও মরে নাই।



## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পৌত্র কালাচাঁদের জন্য, আজ একশত আট রকম ভোগের বন্দোবস্তই হউক, আর পাঁচটা খানসামাতেই কালাচাঁদকে ধরিয়া তেল মাখাইয়া দিউক, কর্ত্তা কিন্তু একপুরুষে বড়লোক। এগার বৎসর বয়সে হুগলীতে আসিয়া সদরামীণের বাসায় তিনি পেট-ভাতায় তামাক সাজিতেন; ছেলেপিলে কোলে করিতেন; এবং মেয়েদের ফর্‌মাস খাটিতেন। ছেলেটীকে চালাক-চোস্ত দেখিয়া সদরামীণ-মহাশয় তাঁহাকে ভালবাসিতেন, মক্স করিতে বলিতেন, জমাখরচ রাখিতে শিখাইতেন। ক্রমে মনিবের অনুগ্রহ বাড়িল। আপন ছেলেদের সঙ্গে তাঁহার কাপড় কিনিয়া দিতেন; পাতে একখানি মাছ পড়িয়া থাকিলে বলিতেন—'হরিকে দিও'; পূজা-পার্ব্বণে, দোলে-চড়কে বা রথে-রাসে হরিকে উৎসব দেখিবার পয়সা পুরস্কার করিতেন।

বাল্যকাল হইতেই হরিতারণ হিসাবী,—একটী পয়সা মা-বাপ্। দুই-চারিটী যা পয়সা পাইতেন, তাহাই জমাইতেন;—জমাইয়া-জমাইয়া একটী টাকা পূর্ণ হইলে, তাহাই আবার অপরকে ধার দিতেন। নূতন কাপড় পাইলে, তিনি তাহা সহসা পরিতেন না,—পুতু-পুতু করিয়া তুলিয়া রাখিয়া, শেষে তাহা লুকাইয়া বিক্রয় করিয়া ফেলিতেন। ক্রমশ বয়প্রাপ্তির সহিত হরিতারণ সদরামীণের বাসার হাটবাজার করিবার ভারও প্রাপ্ত হইলেন। তাহাতে বিলক্ষণ দু-পয়সা রোজগার চলিতে লাগিল। কিন্তু সদরামীণ তাঁহার বাজার-করা-কার্য্যে সন্তুষ্ট ছিলেন। কারণ হরিতারণ ঘুরিয়া-ফিরিয়া, দেখিয়া-শুনিয়া, কষিয়া-মাজিয়া, এত সস্তাদরে জিনিসপত্র কিনিতেন যে, তাহাতে টাকা-প্রতি দু-গণ্ডা পয়সা রাখিলেও, সদরামীণের কোনও লোকসান বোধ হইত না। এইরূপে তিন বৎসর অতীত হইল। হরিতারণের তখন বয়ক্রম চৌদ্দ বৎসর। এ পর্য্যন্ত তাঁহার মাহিনা ছিল না,—কেবল খোরাক-পোষাক। মাহিনা

না থাকুক,—সুদে আসলে তিন বৎসরে তাঁহার রোজগার তখন প্রায় ৫০০৲ টাকা হইয়াছে।

একদিন বালক-হরিতারণ অম্বুরী-তামাক সাজিয়া কলিকায় ফুঁ দিতে-দিতে ধীরে ধীরে পা ফেলিয়া সদরামীণের সম্মুখে উপস্থিত হইল;—তাঁহার হাতে হুঁকা দিয়া বিনীতভাবে হেঁট-মুখে ছল্‌ছল্ চোখে কাছে দাঁড়াইয়া রহিল, নড়িল না। বাজারের সর্ব্ব-প্রধান দোকানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তামাক;—হরিতারণ-কর্ত্তৃক সযত্নে সাজা; তার উপর আবার হুঁকায় নূতন জল-ফেরা। দু-চারিবার টানিতেই সদরামীণের শরীর-গৃহ 'দেল্‌খোষ-বাগ' হইয়া উঠিল। তিনি, হরিতারণের মুখের দিকে ধূঁয়া ছাড়িয়া, খোষ-মেজাজে জিজ্ঞাসিলেন,—"কি হে হরি!—খবর্ কি? আজ তোমার মুখ এত শুক্‌নো কেন?"

হরি ইতিপূর্ব্বে তিন দিন স্নান করে নাই, তেল মাখে নাই, আধপেটা খাইয়াছে, এবং তিন দিনে অন্তত ছয়বার গোপনে শুধু শুধু ধূলায় গড়াগড়ি দিয়া গা ঝাড়িয়াছে। প্রভুকর্ত্তৃক এইরূপ প্রশ্ন

জিজ্ঞাসিত হইয়া, হরিতারণ কাঁদ-কাঁদ স্বরে উত্তর দিল ;—"বাড়ী থেকে পত্তর এসেচে, এবার জমীতে ধান হয় নাই। মা খেতে পাচ্ছেন না—তা কা'কে আর এ দুঃখ জানাই ?—আপনিই মা-বাপ।"

সদরামীণ। তবে এখন তোমাদের চল্‌চে কিসে ?

হরি। তা, এই ধার্‌-টার্‌ ক'রে মা চালিয়েছেন, —কিন্তু আর চলে না। কোন দিন আহার হয়, কোন দিন হয় না। তা, আপনি একটা কিন্নারা না ক'রে দিলে,—আমি আর দাঁড়াই কোথা ?—মাসে যদি দুটী টাকা ঘরে পাঠাতে পারি, তবু মায়ের কতক দুঃখ ঘুচে !

সেইদিন হইতে সদরামীণ, হরিতারণের মাসিক ২৲ টাকা মাহিনা বরাদ্দ করিয়া দিলেন ; এবং তিনি হরিতারণের ভবিষ্যৎ ভালোর জন্য স্বীয় সেরেস্তাদারকে ডাকাইয়া বলিলেন, "হরি আমার বাসায় খাইবে, থাকিবে ; আর তোমার বাসায় প্রত্যহ গিয়া লেখাপড়া শিখিবে ; ছোকরাটী

ভালো;—গরীবের ছেলে,—ইহাকে একটু যত্ন করিয়া আদালতের কাজ-কর্ম্ম শিক্ষা দিও।”

সদরামীণ প্রভু; সেরেস্তাদার ভৃত্য;—প্রভুর আজ্ঞা ভৃত্য ‘অবশ্য পালন করিব’ বলিয়া স্বীকৃত হইল।

হরিতারণের বড়ই মজা হইল। সদরামীণের বাসায় খায়, থাকে, উপরি-রোজগার করে; এবং সেরেস্তাদারের বাসায় আদালতের কাজ-কর্ম্ম শিখে, পাঁচটা-পাঁচ-রকম দেখে-শুনে, এবং কিছু কিছু উপার্জ্জনও চলে। হরিতারণের হাতের লেখা বেশ পরিস্কার,—সেরেস্তাদার সে লেখা বড় পছন্দ করিতেন। ক্রমশ অনেক কাজ-কর্ম্ম তাহার দ্বারা তিনি করাইয়া লইতে লাগিলেন। শেষে তাহার মাসিক ৫৲ টাকা বেতন তিনি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন।

এইরূপে হরিতারণের উনিশ বৎসর বয়স হইল।

সেরেস্তাদার বৃদ্ধ। দাঁত ফোক্‌লা। চুল-গুলি শণের নুড়ি। গাল দুটি চড়িয়ে-ভাঙ্গা। জাতিতে

সুবর্ণ-বণিক্‌। তাঁহার তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী সু-কিঞ্চিৎ প্রখরা। গলার আওয়াজ গুরুগম্ভীর,—সে চিহিঁহিঁ চীৎকার-শব্দে পথের পথিক চমকিয়া উঠে। রঙ্গিণী আবার সদাই রাগে ভরা,—সংসারের কিছুই যেন পছন্দ হয় না। বৃদ্ধ-সেরেস্তাদার তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে যথাসর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়াও, একটী দিনও তাঁহার মন পান নাই। বিশ ভরির ডায়মন-কাটা নিরেট বালা সযত্নে তৈয়ার করাইয়া সেরেস্তাদার প্রিয়ম্বদা প্রেয়সীর কর-কমলে স্থাপন করিলেন। প্রাণপ্রিয়া অমনি সে বালাকে হাতে করিয়াই বলিলেন,—"এ যে, হাল্‌কা বালা,—এ নিশ্চয় নিরেট নয়—আমার সঙ্গে তোমার প্রবঞ্চনা!—ভাল আমার পোড়া অদেষ্ট রে!—" বলিতে বলিতে তৎক্ষণাৎ অমনি তিনি সেই বালা টান মারিয়া দূরে ফেলিয়া দিলেন। এইরূপ ব্যাপার সদাই ঘটিত। সেরেস্তাদার পত্নীভয়ে সদা থরহরি কম্পমান—সদা ত্রাহি মধুসূদন!

প্রিয়ম্বদা-পত্নীর আর একটী সদ্‌গুণ ছিল। তিনি কিছু অধিক মাত্রায় বিবেকবতী হইয়া-

ছিলেন,—সুতরাং লৌকিক-লজ্জা-রূপ-পক্ষীটী তাঁহার দেহ-পিঞ্জর কাটিয়া উড়িয়া, নিভাও হইয়া পলাইয়াছিল। অতএব কটীর কসন, অঙ্গের বসন স্বভাবতই শিথিলভাব ধারণ করিয়াছিল। অনেক সময়, কি স্ত্রী, কি পুরুষ—সকলেরই নিকট তাঁহার সমভাব। উত্তমাঙ্গের অবগুণ্ঠন-মেঘ উন্মোচন-পূর্ব্বক পূর্ণ-মুখচন্দ্রখানিকে গবাক্ষরূপ আকাশে তিনি সদাই উদিত করিয়া রাখিতেন। তখন তাম্বূল-রাগে তাঁহার অধর রঞ্জিত হইত, হাসি-জ্যোৎস্নায় রাজপথ আলোকিত হইত, আঁখি-ঠারে পুরুষের পাগল-প্রাণ আকৃষ্ট হইত। তখন কেবল,—

অনিমিষে বিনোদিনী হেরিছে বিনোদ।
বিনোদের বিনোদিনী দেখিয়া প্রমোদ।
বিপরীত বিপরীত উপমা কি দিব।
উর্দ্ধে কুমুদিনী নিম্নে কুমুদ-বান্ধব॥

হরিতারণ কথঞ্চিৎ খর্ব্বাকৃতি। উনিশ বৎসর বয়স হইলেও, তখন দেখিতে ১৪ বৎসরের অধিক বলিয়া বোধ হইত না। এ-দিকে আবার হরিতারণ,

হরিতারণ। আপনি যা বল্‌চেন, তাই কর্‌বো—কিন্তু এক আমার আবেদন আছে। আমি যতদিন এ চাক্‌রী করিব, ততদিন মাহিনার অর্দ্ধেক আমি সেই সেরেস্তাদারের পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণার্থ প্রদান করিব।

সদরামীণ মনে মনে বলিলেন, "সাধু্ সাধু্!"

হরিতারণ সেরেস্তাদার হইলেন; স্বতন্ত্র বাসা করিলেন; মাহিনার অর্দ্ধেক (সদরামীণকে দেখাইয়া) প্রতি মাসে প্রিয়ম্বদা-পত্নীকে দিতে লাগিলেন; এবং নাথ-হীন গৃহস্থের বাটীতে প্রত্যহ একবার দিবসে প্রকাশ্য তত্ত্বাবধারণের জন্য,—স-নাথ-করণের জন্য যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিলেন। চারিমাস পরে হঠাৎ একদিন শুনা গেল, প্রিয়ম্বদা-পত্নীর গৃহে হাপ্‌-ডাকাতিগোছ হইয়া তাঁহার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত হইয়াছে।

হরিতারণ পরদিন প্রাতে আহা! আহা!—হায়! হায়!—মরি! মরি!—করিতে লাগিলেন। কিন্তু উপায় নাই,—চোর পলাইয়াছে। ডাকাতির কিছু

দিন পরে, প্রিয়ম্বদার ঘরে রাত্রে ইঁট, পাটখেল পড়িতে আরম্ভ হইল;—কোন দিন বা আস্ত কাঁচা মড়ার মাথা উঠানে দৃষ্ট হইতে লাগিল। তখন অগত্যা প্রিয়ম্বদা, 'বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস' ভাবিয়া, কলিকাতায় আসিয়া অবাধ-বাণিজ্যে প্রাণ-মন-দেহ অর্পণ করিলেন। হরিতারণ নিষ্কণ্টক হইলেন।

দেখিতে দেখিতে হরিতারণ, সদরামীণের বিশ্বস্ত, প্রিয়তম সেরেস্তাদার হইয়া উঠিলেন। সদরামীণ বৃদ্ধ হইয়াছিলেন,—লিখিতে হাত কাঁপিত। সুতরাং হরিতারণ মোকদ্দমার রায় পর্য্যন্ত লিখিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময় হইতেই তাঁহার নাকে তিলক, মাথায় টীকি প্রভৃতির কিছু কিছু সূত্রপাত হইল। সময়ে সময়ে তাহার গলদেশে রুদ্রাক্ষ-মালাও শোভা পাইত। অনুগত লোকে বলিতে লাগিল, হরিতারণ স্বয়ং ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির।

সেরেস্তাদার হওয়ার পর, হরিতারণ স্বতন্ত্র বাসা করেন। তিনি অলৌকিক মিতব্যয়ী ছিলেন। তখন সস্তা-গণ্ডা ছিল; সর্ব্বরকমে তাঁহার মাসিক

বাসাখরচ মায় কাপড় ১॥/০ এক টাকা নয় আনার অধিক হইত না। পৌনে দুই মাস অন্তর ধোবা-বাড়ী কাপড় কাচিতে দিতেন। একজন প্রতিবেশী দোকানদারের সহিত সবিশেষ প্রণয় জন্মিয়াছিল। বাদী-প্রতিবাদীগণের নিকট হইতে পুরস্কার-স্বরূপ যে সকল সওগাদ পাইতেন, তাহার সমস্তই মুদীকে দিতেন,—ঘরে কিছুই রাখিতেন না। আম, কাঁঠাল, মাছ, দই, সন্দেস, ঘি, চাল, ডাল—এ সমস্ত উপহার-দ্রব্যই মুদীব দ্বারা বিক্রীত হইত। খরিদদারের অসুবিধাহেতু যেদিন মুদী মাছ লইত না, সেদিন তিনি পাড়ার ইতর-শ্রেণীর লোককে বাধ্য রাখিবার জন্য, তাহাদের মধ্যে মাছ বণ্টন-পূর্ব্বক বিলাইয়া দিতেন। তৈল-খরচ ভয়ে নিজে কিছুতেই ঘরে মাছ রাখিতেন না। হরিতারণের আহার ছিল,—কেবল খেঁসারির ডাল-ভাতে এবং ভাত। যেদিন খুব সমারোহ হইত,—সেদিন লবণ-সংযোগে সু-অল্প তেঁতুলগোলা পাতের উপর শোভা সম্পাদন করিত। হরিতারণ দণ্ডে

দণ্ডে তামাক খাইতেন বটে, কিন্তু একদিনও এক পয়সার তামাক কিনিতেন না। সন্ধ্যার পর নিকট-বর্ত্তী একজন উকীলের বাসায় পাশা খেলিতে যাইতেন;—সেখানে তাঁহার হর্দম্ তামাক চলিত; খেলা-ভঙ্গে গৃহ-প্রত্যাগমনকালে তথা হইতে প্রায়ই দু-ছিলিম তামাক হাতে করিয়া আনিতেন। তাহা-তেই তাঁহার প্রাতঃকালটা চলিয়া যাইত।

সেরেস্তাদারী, মান্যের চাকুরী; তথাচ হরিতারণের বাসায় রযুয়ে ব্রাহ্মণ নাই; লোকে টেপাটিপি করিত। হরিতারণ কথায় কথায় প্রতিবেশীমণ্ডলীকে বুঝাইয়া বলিতেন,—"আমি স্বপাক ভিন্ন কখন আহার করি না।"

হরিতারণ যে, মোকদ্দমার রায় লিখিতেন, তাহা ক্রমশ গোপনভাবে সর্ব্বত্রই প্রচার হইয়া পড়িয়াছিল। ক্রমশ বাদী-প্রতিবাদীগণ তাঁহার যেন কেনা-গোলাম হইয়া দাঁড়াইল। তিনি মহা-মজায় উভয়-কুল হইতে মধু লুটিতে লাগিলেন। বহু মধু সঞ্চয় করিয়াও, তিনি প্রথম পাঁচ বৎসর

গরিবাণী-চাল্ ছাড়েন নাই। সেই স্বপাক অন্ন—সেই ১৸/০ এক টাকা নয় আনায় বাসাখরচ বর্ত্তমান রহিল।

কারণ ছিল। চক্ষু-লজ্জা বল, ভক্তি বল, সম্মান বল,—তাঁহার যাহা কিছু, সেই সদরামীণের প্রতি ছিল। পাছে মনিব কোনরূপ সন্দেহ করেন, এই নিমিত্ত তিনি চা'ল-চলন কিছুই বদল করেন নাই। বিশেষ তিনি স্বভাব-কৃপণ। ব্যয়সংক্ষেপই তাঁহার সুখ। এইরূপে ছয় বৎসর অতীত হইলে, সদরামীণের মৃত্যু ঘটে। স্বর্ণ-ডিম্ব-প্রসবিনী রাজ-হংসীর মৃত্যুতে গৃহস্থের কিঞ্চিৎ অর্থ-কষ্ট হয় বটে,—কিন্তু হরিতারণের যেন মহান্ হর্ষোদয় হইল। তাঁহার বুক হইতে যেন শক্তিশেল খসিয়া পড়িল। তিনি সংসার সুখময় দেখিতে লাগিলেন।

নূতন সদরামীণ আসিয়া রাজকার্য্য গ্রহণ করিলেন। হরিতারণ, ইন্দ্রের শচীর ন্যায়, তাঁহারই অনুগমন করিতে লাগিলেন। নবভূপতির বাসায় প্রাতঃ-সন্ধ্যা দুই-বেলা আনাগোনা করিয়া, সস্তাদরে

হাটবাজার করিয়া দিয়া,—হরিতারণ অল্পকাল মধ্যেই নবপ্রভুর পরম প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন! হাকিম-বশের পর তিনি স্বকার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। প্রথম—চোটায় টাকা ধার দেওয়া; দ্বিতীয়—বিষয় বা গহনা ইত্যাদি বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার দেওয়া; তৃতীয়,—কখন স্বনামে কখন বেনামীতে মহাল ডাকা।

অদৃষ্ট যখন যাঁহার ফলে, তখন তাঁহার পক্ষে সবই সম্ভব হয়। পাঁচ হাজার টাকার সম্পত্তি, হরিতারণ পাঁচ শত টাকায় কিনিয়া লইতে লাগিলেন। তিনি যে তালুক তিনশত টাকা মুনফা দেখিয়া লইলেন, ক্রমশ তাহার মুনফা তিন হাজার টাকায় দাঁড়াইল। হরিতারণের গৃহে যেন ভূতে টাকা বহিতে লাগিল। কথিত আছে, বার্ষিক বার হাজার টাকা জমীদারীর মুনফা করিয়া, হরিতারণ সন্দেস জল-খাবার খাইয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, প্রথম প্রথম জল-খাবার আদৌ তিনি মুখে দিতেন না;—একবেলা রাঁধিয়া দুইবেলা চালাইতেন।

ক্রমশ, জল-খাবার হিসাবে তিনি মুড়ি ধরিলেন;—তার পর মুড়ুকি;—অন্তিমে, দ্বাদশ-সহস্র টাকার বার্ষিক আয়ের পর—প্রত্যহ একজোড়া হিসাবে সন্দেস সুরু করিয়াছিলেন। যখন মুড়ুকি চলিয়াছিল, তখন হইতেই একজন রঘুয়ে-ব্রাহ্মণ তিনি রাখিয়াছিলেন। সে লোকটী পেটভাতায় রাঁধিত,—এবং আদালতের কাজকর্ম্ম শিখিত। যখন সন্দেস চলিল, তখন তাঁহার অনেক বন্ধুবান্ধব তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া বলিল,—"এ সামান্য মাটীর ঘরে থাকা আপনার আর ভাল দেখায় না!—অন্তত নীচে-উপর চারকুঠারি একটী দালান করুন।"

হরিতারণ। বাপ্‌রে আমি কত দৌড়ের মানুষ!—আমার বেসাৎ কি? সঙ্গতি কি?—যে, বিদেশে আমি ইঁট গাড়িব? এ ইটেল-চণ্ডী ঘরে ঢুক্‌লে কি আর রক্ষা থাক্‌বে!!

এইরূপে ক্রমশ নিজগুণে হরিতারণ কালেক্টরীর সেরেস্তাদার হইলেন। তখন আর তাঁহাকে পায়

কে? আকাশে শশধর ষোলকলায় হাসিল, নিম্নে কুমুদিনী কামকলায় ফুটিল;—মলয় বায়ু মৃদুমন্দ বহিল, বসন্তের প্রেমপাখী কুহু-কুহু ডাকিল; হরি-তারণ কোটীপতি হইলেন।

প্রচুর অর্থ উপার্জ্জিত হইল, কিন্তু তাঁহার মন প্রফুল্লিত হইল না। তিনি রাজ-সম্মান, সামাজিক-সম্মান,—অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

সেই সময় হুগলীতে প্রভূত অর্থব্যয়ে তাঁহার অপূর্ব্ব অট্টালিকা বিনির্ম্মিত হইল। স্বগ্রাম হইতে পরিবারবর্গ আসিল। দাসদাসী নিযুক্ত হইল। সোণা-রূপার হুঁকা, ফর্সী, গুড়্গুড়ি তৈয়ারি হইল। সোণা-রূপার থাল, রেকাবী, বাসন, বাটী হইল। পাল্কী করিয়া কাছারি যাতায়াত আরম্ভ হইল। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের প্রতি ভক্তি বাড়িল,—দুই চারি টাকা দান-খাতে খরচ পড়িতে লাগিল। ছেলেরা মাহিনা দিয়া স্কুলে পড়িতে আরম্ভ করিল। বার্ষিক পিতৃ-মাতৃ-শ্রাদ্ধে হুগলীর বহুলোক তাঁহার বাসায় পাত পাড়িতে থাকিল।

এইরূপে হরিতারণ সমাজে সম্মানিত হইতে লাগিলেন,—সমাজের একজন হইয়া উঠিলেন।

তখন তাঁহার ধার্ম্মিক হইতে সাধ হইল। তিনি স্বদেশে—স্বগ্রামে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিলেন; অতিথিশালা বসাইলেন; আশ্বিনে দুর্গোৎসব, ফাল্গুনে দোল, আষাঢ়ে রথ—এ সমস্তই চলিতে লাগিল। কোন কোন বৎসর পৌষমাসে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণকে বনাত, এবং কাঙ্গালীগণকে কম্বল-দান করিতে লাগিলেন।

একটা কথা বলিয়া রাখি, হরিতারণ এইরূপ ধর্ম্মকর্ম্মের প্রথমাবস্থায় শিবভক্ত বা শৈব ছিলেন; ক্রমশ বিষ্ণুভক্ত বা বৈষ্ণব হইলেন। পূর্ব্ব-নির্ম্মিত শিবমন্দির ভাঙ্গিলেন না বটে, কিন্তু শিবপূজার জাঁকজমক কমাইয়া দিলেন। পুরাতন শিবমন্দিরের সম্মুখেই ৺লক্ষ্মী-নারায়ণজীউর এক বৃহৎ নাট-মন্দির উত্থিত হইল। ধূমধামে সেবার বন্দোবস্ত হইল। সে যাহাই হউক, এখন হরিতারণ স্বয়ং প্রায় প্রত্যহই সন্ধ্যার পর বন্ধুজন-বেষ্টিত হইয়া, খোষ-

গল্প করিতে করিতে হরিনামের মালা জপ করিয়া থাকেন; এবং মধ্যে মধ্যে "রাধা রাধা বল," "হরি হরি বল"—ধ্বনি করিয়া উঠেন।

তার পর, তাঁহার রাজসম্মান পাইবার বাসনা বলবতী হইল। সময়ে-অসময়ে, পর্ব্বে-অপর্ব্বে, বড়-দিনে-ছোটদিনে,—জজ, মাজিষ্ট্রর, এবং কমিশনরের বাড়ী ভেট যাইতে লাগিল। কাঁচামিঠে আম, লিচু, কুল, নেবু, কলা,—পাকা ফজ্‌লী আম, বোম্বাই আম, জাম, কাঁঠাল,—পাঁঠা, খাশী, ভেড়া, শাম্পেন,—ফুল, মালা, তোড়া,—ভেট স্বরূপ বাজারের সমস্ত উৎকৃষ্ট সামগ্রীই ঐ ত্রিমূর্ত্তির নামে যথাক্রমে উৎসর্গীকৃত হইতে লাগিল। ভোগে পরিতৃপ্ত হইয়া ত্রিমূর্ত্তি—ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর,—হরিতারণের উপর করুণা প্রকাশ-পূর্ব্বক তাঁহার দ্বারা, সার্ব্বভৌম হিতের জন্য, চাঁদার খাতায় সহি করাইয়া লইতে লাগিলেন। পরমপুরুষ প্রভুত্রয়ের প্রেমে পুলকিত হইয়া হরিতারণ অকাতরে দুই শত, পাঁচ শত, দুই হাজার, দশ হাজার, টাকা পর্য্যন্ত চাঁদা দিতে

আরম্ভ করিলেন। তখনকার শ্রেষ্ঠ সম্মান ছিল,—"রায়বাহাদুর।" অচিরে, উপাস্য দেবতাগণের প্রসাদ-স্বরূপ তিনি 'রায়বাহাদুর' উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। তখন তাঁহার নামটী দাঁড়াইল,—'রায় শ্রীহরিতারণ দাসদত্ত বাহাদুর'।

অতঃপর হরিতারণ, প্রকৃত বড়মানুষ হইবার জন্য নানারূপ ঢঙ, রঙ, সঙ—শিখিতে, ফলাইতে, এবং সাজিতে লাগিলেন। তখন একটু মোটা হইবার তাঁহার বাসনা হইল; নেয়াপাতি-রকমের ভুঁড়ি নামাইবার জন্য তিনি বহু চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সেই পাকা, পাকৃসিটে, ঝুণো খর্ব্ব-শরীরে ভুঁড়ি কিছুতেই নামিতে চাহিল না। তবে টাকার গরমে এবং রাজ-ভোগে, যেরূপ একটু নুদুস-নাদুস, চিকণ-চাকণ হইতে হয়, তাহা তিনি পূর্ব্ব হইতেই কতকটা হইয়াছিলেন। কিন্তু স্থূলতা আরও অধিক বৃদ্ধির জন্য, দুধের বরাদ্দ বাড়াইতে,—একজন বিশ্বস্ত বন্ধু উপদেশ দিল। প্রত্যহ পাক্কি আড়াইসের খাঁটি দুধ খাইয়া বড়-কর্ত্তার পেটের

অসুখ হইল।" তখন হরিতারণ দুধ হজমের জন্য আফিঙ ধরিলেন। ফল কথা, শরীর যেরূপ ছিল, সেইরূপই রহিল;—গর-হজমে গো-দুগ্ধের মাত্রা কমাইতে হইল,—কেবল আফিঙ-সেবনটা রহিয়া গেল।

"খাইতে পারি না,"—"এক ছটাক চেলের অন্ন রোচে না,"—"একটী সন্দেস ভাঙ্গিয়া আধখানির একটু কোণ খাইলেই অম্বল হয়"—এই সব কথা বলাই আহার-বিষয়ক বড়মানুষীর প্রধান লক্ষণ। বড়কর্ত্তাও কালক্রমে বলিতে আরম্ভ করিলেন, "পাঁচ সনের পুরাণ মিহি বাঁদসাভোগ চাল ভিন্ন অন্য চাল খাইলে আমার অসুখ করে। তাই বা কত-কটি? প্রত্যহ নিক্তিদ্বারা ওজন করিয়া আমার জন্য দুই ভরি চাল রসুই হয়। বলিব কি,—যেদিন গিন্নি গোপনে দু-ভরি দু-আনা চাল রাঁধিতে দেন, সেদিন আমার পেট ফাঁপে।" বস্তুত, বড়কর্ত্তার অগ্নিমান্দ্য হইয়াছিল। বৃদ্ধকাল উপস্থিত,—ক্ষুধার হ্রাস অবশ্যম্ভাবী। দেহের বাঁধন

ছাড়িতে আরম্ভ হইলে কি আর যৌবনকালের সেই বিষম ক্ষুধা থাকে! বিশেষ, নানা সুচিন্তা-কুচিন্তায় বড়কর্ত্তার মনপ্রাণ সদাই জর্জ্জরিত। কাজেই ক্ষুধা নাই। চিন্তাই মনুষ্যের জ্বর। জ্বরে পূর্ণমাত্রায় আহার করিতে কে পারে? তবে বড়কর্ত্তা লোকের কাছে তাঁহার আহারের পরিমাণ যতটা কম বলিয়া পসার বাড়াইতেন, ততটা কম অবশ্যই নহে। বৃদ্ধ ব্যক্তি সাধারণত যেরূপ আহার করিয়া থাকে, তিনিও সেইরূপ আহার করিতেন। তবে তিনি এটা-ওটা-সেটা পাঁচ প্রকার ব্যঞ্জনাদি খাইতেন বলিয়া, অন্নের মাত্রা কিছু কম হইয়াছিল। একটা কথা বলিয়া রাখি,—কালেভদ্রে কচিৎ কোথাও নিমন্ত্রণে, অথবা স্বগৃহে, কোন বিশেষ বন্ধুবান্ধবের সহিত খাইতে বসিলে, তিনি গোড়া হইতেই,—"আর না,—আমাকে আর দিও না, আমি কিছুই খাইতে পারি না,"—ইত্যাদিরূপ ধ্বনি করিতেন,—এবং বসিয়া-বসিয়া-বসিয়া যেন বহুকষ্টে যৎসামান্য যৎকিঞ্চিৎ সামগ্রী উদরস্থ করিতেন।

বড়লোক হইলে কম খাইতে হয়,—ইতরলোকেই অধিক খায়—ইহাই বড়কর্ত্তার ধারণা।

বড়লোক হইলে একটা ব্যারাম থাকা চাই। প্রত্যহ ডাক্তার আসিয়া বক্ষ পরীক্ষা করিয়া, প্রেসক্রুপ্‌ষণ লিখিবে, কবিরাজ আসিয়া নাড়ী টিপিয়া বটিকা দিবে, হেকিম আসিয়া রোগের অবস্থা দেখিয়া-শুনিয়া যাইবে,—তবেত বড়লোক! সুতরাং বহুদিন হইতে বড়কর্ত্তা একটী রোগের অন্বেষণ করিতেছিলেন,—খুঁজিয়া পান নাই। ক্রমশ, কদাচিৎ কখনো তাঁহার "অম্বল" হইতে লাগিল। তিনি এই সুযোগ পাইয়া রাষ্ট্র করিয়া দিলেন, "আমার অম্বল-শূল ব্যাধির উপক্রম হইয়াছে।"

এইরূপে কালক্রমে রায় শ্রীহরিতারণ দাস-দত্ত বাহাদুরের বড়-মানুষত্বের কোন উপকরণই অসম্পূর্ণ রহিল না।



# তৃতীয় পরিচ্ছেদ।



এককালের পেটভাতায়-তামাক-সাজা হরিতারণ আজ প্রকৃত-প্রস্তাবে খাঁটি বড়লোক হইয়া উঠিয়াছেন। জাঁক-জমকে বাহ্যাড়ম্বরে তাঁহার গৃহ পূর্ণ। ক্ষুধানলে দেহ দগ্ধ হইতে থাকিলেও, কালাচাঁদ সে ঐশ্বর্য্য না দেখিয়া থাকিতে পারিলেন না। ঠাকুরদাদার সঙ্গে যাইতে যাইতে কালাচাঁদ দেখিলেন,—অন্দর-বাটী চক্‌মিলান,—সাদা চূণকাম সূর্য্যের আভায় ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। প্রত্যেক খিলানের উপর কোথাও গণেশমূর্ত্তি, কোথাও হরগৌরীমূর্ত্তি, কোথাও রাম রাজা, কোথাও সীতাহরণ। সারি সারি চারিদিকের পাথরের থামে সবিস্তারে কৃষ্ণলীলা বর্ণিত হইয়াছে,—বেদব্যাস শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করিয়াছিলেন;—এক্ষণে—চিত্রকর এবং ভাস্কর উভয়ে মিলিয়া সেই রচনাকে চিত্রাকারে সজীব করিয়া রাখিয়াছে।

সর্ব্বদিক্ সুপ্রসন্ন। সমীরণ সুখস্পর্শ হইয়া মন্দ মন্দ বহিতেছে। সরোবর কমলদলে শোভমান! অলিকুল মধুপানে আকুল হইয়া গুণগুণরবে গান করিতেছে। দেব ও ঋষিগণ আনন্দে পুষ্পবৃষ্টি আরম্ভ করিয়াছেন। এমন সময় কংসের কারাগারে, দেবকীর গর্ভে, ভগবান্ হরি ঐশ্বর্য্য-রূপে আবির্ভূত হইলেন। সেই বালক অতি অদ্ভুত। তাঁহার লোচন প্রফুল্ল কমল তুল্য; চতুর্ভুজ; শঙ্খচক্রগদা-পদ্মধারী; বক্ষে শ্রীবৎস চিহ্ন; গলে কৌস্তুভমণি; পরিধান পীত বসন; বর্ণ নিবিড় জলধর তুল্য শ্যাম। ভগবানের এই মূর্ত্তি দেখিবামাত্র বসুদেব এবং দেবকী বিস্ময়-উৎফুল্ল নয়নে, কৃতাঞ্জলি-পুটে তাঁহার স্তব আরম্ভ করিয়াছেন। প্রথম স্তম্ভে এই চিত্র।

দ্বিতীয় স্তম্ভে কালাচাঁদ দেখিলেন, ভগবান্ যোগ-মায়াবলে দুই-হস্ত-দুই-পদ-বিশিষ্ট প্রকৃত বালক হইয়াছেন। বসুদেব তাহাকে কোলে লইয়া কংস-ভয়ে কারাগার হইতে পলাইতেছেন। সূতিকা-গৃহের

ঠাকুরদাদার অন্দরমহল।



বৃহৎ কপাট, লৌহ-কীলক, যেন আপনাপনি খুলিয়া যাইতেছে। দ্বারপাল এবং পুরবাসীগণ—সকলেই যেন ঘোর-নিদ্রায় অভিভূত হইয়া অচেতন হইয়া পড়িয়াছে। সেই স্তম্ভে আরও একটী চিত্র আছে। বসুদেব, শ্রীকৃষ্ণকে কোলে লইয়া তরঙ্গ-ভঙ্গ-ময় ফেনিল যমুনা পার হইতেছেন; নব-নীল-নীরদ ঘন-ঘোর বর্ষণ করিতেছে;—স্বয়ং অনন্ত মহা-ফণা বিস্তার করিয়া,—ছত্ররূপে জল নিবারণ করিতে করিতে, বসুদেবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছেন। এ ছবি দেখিয়া কালাচাঁদ ভাবিলেন,—এ কিরকম গাঁজাখুরি? সাপে চক্র ধরিয়া ছাতার-স্বরূপ হইয়াছে!! বড় মজা'ত!

তৃতীয় স্তম্ভে চতুর্থ চিত্র। মায়াবিনী পূতনা পরমা সুন্দরী রমণী হইয়াছে। তাহার কেশকলাপ প্রফুল্ল-মল্লিকামালায় বিভূষিত; নবীন নধর নিতম্বে মেদিনী লজ্জা পাইতেছে; পীনোন্নত পয়োধর-ভারে সেই কামিনী যেন থর থর কাঁপিতেছে; কটাক্ষে যেন মুনির মন হরণ করিতেছে; সে,

শিশু-শ্রীকৃষ্ণকে কোলে লইয়া দুর্জ্জয় গরল-বিলেপিত স্তন পান করিতে দিয়াছে। ভগবান্ যেন মহাক্রুদ্ধ হইয়া গাঢ়-নিষ্পীড়নপূর্ব্বক নিশাচরীর স্তন তাহার প্রাণের সহিত পান করিতেছেন! এ ভাবটী বড়ই চমৎকার! বলিহারি কারিকরের চিত্রকার্য্য!!

চতুর্থ স্তম্ভে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নানা চিত্র। নন্দপত্নী যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে কোলে করিয়া আদর করিতেছেন। হঠাৎ শিশুকে গিরিশিখর তুল্য গুরু বোধ করিয়া তিনি যেন ভারবহনে অসহিষ্ণু হইলেন। একস্থানে দানব তৃণাবর্ত্ত চক্রবায়ুর রূপ ধরিয়া শ্রীকৃষ্ণকে হরণ করিয়া লইয়া উড়িয়া পলাইতেছে। অন্যস্থানে, সেই আকাশ-পথেই শিশু-শ্রীকৃষ্ণ দৈত্যের গলা টিপিয়া ধরিয়াছেন,—মায়াবী দানব পতনোন্মুখ হইয়াছে।

পঞ্চম স্তম্ভে, কৃষ্ণ-বলরাম হামাগুড়ি দিতেছেন। কোথাও শ্রীকৃষ্ণ গোবৎসের পুচ্ছ ধরিয়া আছেন,—বৎস দৌড়িতেছে। কোথাও তিনি একটী বাছুর কোলে করিয়া বসিয়া আছেন। কোথাও শ্রীকৃষ্ণ

দুগ্ধ চুরি করিয়া খাইতেছেন। কোথাও, বানর-গণকে নবনী বিলাইতেছেন। কোথাও শীকাস্থ ভাণ্ড শ্রীকৃষ্ণ নাগাল পান নাই,—একটা নগা লইয়া আসিয়া সেই ভাণ্ড ছেঁদা করিতেছেন। কোথাও তিনি চুপি চুপি অদোহন-কালে বৎস সকলকে খুলিয়া দিয়া গাই পিয়াইয়া দিতেছেন। কোথাও শ্রীকৃষ্ণ মাটী খাইয়াছেন,—যশোদা তাঁহাকে হাঁ করিতে বলিয়াছেন। যশোদা বিস্ময়ে পুত্রের মুখাভ্যন্তর নিরীক্ষণ করিতেছেন। কোথাও শ্রীকৃষ্ণ নোড়া লইয়া দধিভাণ্ড ভাঙ্গিতেছেন। কোথাও যশোদা তাঁহাকে বন্ধন করিতেছেন;—কিন্তু দড়ীতে কুলাইতেছেনা . বলিয়া, মাতা বড়ই অপ্রতিভ হইতেছেন!

ষষ্ঠস্তম্ভে, শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক যমলার্জ্জুন পাত।

অষ্টম স্তম্ভে, বালকবৃন্দসহ বনে শ্রীকৃষ্ণের গো-চারণ।

নবমে, অঘাসুর সর্পশরীর ধরিয়া বৎসপাল গিলিতেছে।

দশমে, কালিয়দমন। এখানে চিত্রকর চিত্রকার্য্যের চরমোৎকর্ষ সাধন করিয়াছে! মহাসর্প রোষভরে চক্ষুদ্বারা যেন গরল উদ্গীরণ করিতেছে; শিখযুক্ত জিহ্বাদ্বারা অবিরত চোবাল চাটিতেছে; আর, শ্রীকৃষ্ণ তাহার মস্তকোপরি নৃত্য করিতেছেন।

একাদশে, বস্ত্রহরণ। শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের বস্ত্র লইয়া বৃক্ষোপরি বসিয়া আছেন। গোপাঙ্গনাগণ আপন আপন করতল দ্বারা যোনিদেশে আচ্ছাদন করত ভগবানের নিকট বস্ত্র ভিক্ষা করিতেছেন।

দ্বাদশে, শ্রীকৃষ্ণের গিরিগোবর্দ্ধন ধারণ।

ত্রয়োদশে, শ্রীকৃষ্ণের মহারাস। অবলা গোপীগণ মণ্ডলরূপে অবস্থিতা; শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের দুই-দুই-জনের মধ্যস্থলে এরূপ ভাবে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, এবং উভয় পার্শ্বস্থ দুই-দুই-জন গোপীর গলদেশ এরূপভাবে আলিঙ্গন করিয়াছেন যে, গোপাঙ্গনাগণ প্রত্যেকেই তাঁহাকে স্বস্ব নিকটস্থ দেখিতেছে এবং প্রত্যেকেই যেন মনে করিতেছে,—ইনি কেবল আমাকেই আলিঙ্গন করিয়াছেন, যেন ইনি কেবল

আমাকেই অন্য গোপী অপেক্ষা অধিক ভাল বাসেন। ধন্য নির্ম্মাণকৌশল! ধন্য কারিকরের অপূর্ব্বশিক্ষা!

চতুর্দ্দশে, কৃষ্ণ-বলরাম মল্লবেশে মহারোষে কংস-সভায় অবতীর্ণ।

পঞ্চদশে, কংস-বধ।

ষোড়শস্তম্ভে, রুক্মিণী-হরণ।

এইরূপ কৃষ্ণলীলা বিষয়ক নানাবিধ চিত্রে সেই ষোলটী স্তম্ভ অলঙ্কৃত হইয়াছে।



## চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ক্ষুধার্ত্ত কালাচাঁদ সেই বিরাট ব্যাপার অবলোকন করিয়া প্রকৃতই অবাক্!—এমন যে মহাক্ষুধা, তাহাও যেন কিছুক্ষণের জন্য তিনি ভুলিয়া গেলেন। অন্দর-মহলের সেই অভূতপূর্ব্ব শোভা দেখিয়া মনে করিতে লাগিলেন,—"ঠাকুরদাদা লক্ষপতি, না ক্রোড়পতি? এরূপ শ্বেতপাথরের মেজে, এরূপ শ্বেতপাথরের থাম, তাহার উপর এরূপ কারিকুরি—ইহা'ত সামান্য অর্থব্যয়ে হইবার নহে,—না জানি, ইহা কতলক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছে!—কিন্তু কোথা হ'তে ঠাকুরদাদার হাতে এত টাকা আসিল?"

ধনঞ্জয়-হস্তে খাণ্ডব-বনদাহ হইতে রক্ষা পাইয়া, ময়-দানব ইন্দ্রপ্রস্থে পাণ্ডবের সেই বিশ্ববিমোহন সভা বিরচন করেন। হরিতারণ দ্বারা যাবজ্জীবন-কারাবাস হইতে রক্ষিত হইয়া, একজন উত্তর-

পশ্চিম-দেশবাসী হিন্দুস্থানী, হুগলীতে ঠাকুরদাদার এই অপূর্ব্ব অন্দর-মহল তৈয়ারি করিয়া দেন। ঐ হিন্দুস্থানী, নৌকা করিয়া, কলিকাতা অঞ্চলে আফিম্ চালান দিত। বহুদিন হইতে তাহার এ ব্যবসা চলিতেছিল। এ ব্যাপার গবর্ণমেণ্টের কতক কর্ণগোচর হইলেও, গবর্ণমেণ্ট সহজে শীঘ্র চোর ধরিতে পারেন নাই। উক্ত আফিম্-ওয়ালার পুলিস ত বশে ছিলই,—এমনও শুনা যায় যে, খুব বড় না হউক, মাঝারি-মাঝারি রাজকর্ম্মচারীগণ পর্য্যন্ত তাঁহাকে সম্মান করিয়া চলিতেন। এ দেশে ক্রমশ এত চোরাই-আফিমের প্রাদুর্ভাব হইল যে, তাহাতে গবর্ণমেণ্টের আফিমের আয় কতক পরিমাণে প্রকাশ্যত কম পড়িল। গবর্ণমেণ্ট তখন সজীব হইলেন। চারিদিকে ধর্-ধর্-ধর্ ধ্বনি পড়িয়া গেল। পাকা পাকা, বড় বড় গোয়েন্দা নিযুক্ত হইল। পুরস্কার পাঁচ হাজার টাকা পর্য্যন্ত ঘোষিত হইল। এমন সময়, একদিন হুগলীর পার্শ্বস্থ গঙ্গা দিয়া বিষম বোঝাই একখানি গয়নার

নৌকা যাইতেছিল। হুগলীর পুলিস তাহা আক্রমণ করিল। গমের নৌকার দাঁড়ি-মাঝির সহিত পুলিসের ভয়ঙ্কর দাঙ্গা হইল,—চারিজন কনষ্টবল হত হইল! শেষে গমের নৌকা ডুবিল। নৌকার আরোহীগণ অন্য একখানি পান্‌সীতে গিয়া প্রাণ রক্ষা করিল। পুলিস-সৈন্য রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইয়া গেল। আবার তীর হইতে পুলিস-সৈন্য প্রেরিত হইল; পান্‌সিস্থ ব্যক্তিবৃন্দ ধৃত হইল। বিপরীত মোকদ্দমা বাধিল। পুলিস অভিযোগ আনিল,—ঐ গমের নৌকায় হিন্দুস্থানীর বাইশ মন আফিম্ ছিল। ঐ নৌকার দাঁড়ি-মাঝিগণ সমস্তই লেঠেল; ইহা ব্যতীত চারিজন অস্ত্রধারী দ্বারবান্ ছিল; স্বয়ং আপিম্‌ওয়ালাও ঐ নৌকায় ছিল। আমরা গমের বস্তা সরাইবার চেষ্টা করিবা মাত্র, মাঝিরা মাথা ফাটাইয়া চারিজন কনষ্টবলের প্রাণ বধ করিল। অন্যান্য কনষ্টবলগণ কাজেই পলাইয়া আসিল। আপিম্‌ওয়ালা,—মাল নিশ্চয় ধরা পড়িবে বুঝিয়া, তৎক্ষণাৎ নৌকা ডুবাইয়া, আফিম্ ভাসাইয়া

দিল। শেষে আমরা ডুবারি দ্বারা এই চামড়ার থলেটী গঙ্গার ভিতর হইতে পাইয়াছি,—ইহাতে আধমণ আন্দাজ আফিম্ আছে। এইরূপ ৪৫টী চামড়ার থলে ছিল,—আমরা পূর্ব্বেই এ সংবাদ পাইয়াছিলাম।

আফিম্ওয়ালা হিন্দুস্থানী; সে এজেহার দিল, আমি এ বিষয়ের ভাল-মন্দ কিছুই জানি না। আমার নিবাস আগরা। কলিকাতায় আমার কাপড়ের এবং শ্বেত-পাথরের কারবার আছে। আমি চলিয়া যাইতে অক্ষম বলিয়া বাঁকিপুর হইতে এই বোঝাই-নৌকায় চড়িয়াছি। (বলা বাহুল্য তখন ভারতের কোথাও রেলপথ ছিল না।) হঠাৎ এই হুগলীর সম্মুখে গঙ্গায় আমাদের নৌকায় ডাকাত পড়িল। মাঝিরা আত্মরক্ষার্থ প্রথমত চেষ্টা করে। উভয় পক্ষে খানিক খুব লড়াই হয়। শেষে ডাকাত-দল বেগতিক দেখিয়া নৌকা ডুবাইয়া দিল। কতকগুলা মাঝি তীক্ষ্ণ তরবারির প্রহারে প্রাণে মরিল, কতক ডুবিয়া গেল,

আর কতক বোধ হয় সাঁতার দিয়া পলাইল। নৌকা-ডুবির পর, আমি গঙ্গায় পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছিলাম, একজন পান্‌সীওয়ালা আসিয়া আমাকে তুলিল। তারপর, পুলিস গিয়া আমাকে ধরিয়া লইয়া আসে। ইহাইত ব্যাপার। ইহা ছাড়া আমি আর কিছুই জানি না।

এইরূপে উভয়পক্ষে বিষম মোকদ্দমা বাধিল। মাজিষ্টর আফিম্‌ওয়ালাকে দায়রা সোপরদ্দ করিলেন। সকলে বলিল, এইবার নিশ্চয় তাহার যাবজ্জীবন কারাবাস হইবে।

আফিম্‌ওয়ালা হাজতে পচিতে লাগিল। বড়ই কাতর হইল। প্রাণের আশা ছাড়িয়া দিল। আগরা হইতে তাহার ছোট-ভাই মোকদ্দমার তদ্বির জন্য বহুঅর্থ লইয়া হুগলীতে আসিল।

ঠাকুরদাদা আফিম্‌ওয়ালার তদ্বিরকার হইলেন। তাহাকে অভয় দিলেন। হাজতে তিনি তাহার সহিত দেখা করিলেন। সে, তাঁহার পা দুটা জড়াইয়া ধরিল। বলিল, "আমি আপনাকে লক্ষ

টাকা দিব,—আপনি আমাকে খালাস করিয়া দিন।” ঠাকুরদাদা হাসিয়া বলিলেন, “আমি অর্থের অভিলাষী নহি,—আপনার ন্যায় মহৎ ব্যক্তিকে মুক্ত করাই আমার উদ্দেশ্য! কেবল মোকদ্দমার তদ্বির জন্য,—উকীল-মোক্তারগণকে দিবার জন্য, সাক্ষীগণের জন্য, জুরিগণের জন্য—যে টাকা আবশ্যক হইবে, তাহা দিলেই হইবে।—আমি স্বয়ং কিছুই চাই না।”

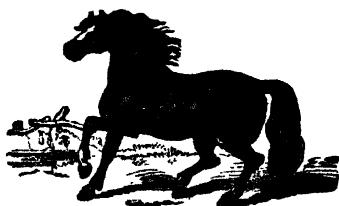
মোকদ্দমার তদ্বির জন্যই প্রায় চল্লিশ হাজার টাকা সংগৃহীত হইল। আফিম্‌ওয়ালা খালাস পাইল। তখন সে, পুরস্কারের-স্বরূপ ঠাকুরদাদাকে নগদ ৫০ হাজার টাকা গণিয়া দিল, এবং দুই লক্ষ টাকা ব্যয়ে মার্বল-পাথরের চিত্রময় অন্দর-মহল তৈয়ারি করাইয়া দিল। প্রায় তিন বৎসরে এই বাটী প্রস্তুত হয়। জয়পুর, এবং আগরা অঞ্চল হইতে অনেক ভাল ভাল কারিকর এই নিমিত্ত আসিয়াছিল। আফিম্‌ওয়ালা অনেক সময় স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণ করিয়া একার্য্য সমাধা করে।

আফিম্‌ওয়ালার ইচ্ছা ছিল,—বহির্বাটীও খুব

জমকাল ভাবে বিনির্ম্মিত হয়। কিন্তু ঠাকুরদাদা তাহাতে রাজী হইলেন না। সদরের শোভা সদাই লোকে দেখিবে,—লোকে হয়ত ভাবিবে, ঠাকুরদাদা বুঝি ঘুষখোর,—ঘুষে বড়মানুষি করিতেছে,—বোধ হয় এই ভাবিয়াই তিনি বহির্বাটীকে অন্দরের ন্যায় অপূর্ব্বভাবে নির্ম্মাণ করিতে স্বীকৃত হন নাই। তবে সদরও নিতান্ত মন্দ নহে,—দালান, ফটক, প্রকোষ্ঠ,—এ সমস্তই ইষ্টক-নির্ম্মিত, এবং যথা-সম্ভব শোভা-সমন্বিত। বিশেষ, ফটকের বাহার অপেক্ষাকৃত উত্তম। বড়-মানুষ হইলে সোজাসুজি যেরূপ গৃহাদি নির্ম্মিত হইতে হয়, সদরবাটী ঠিক্ সেই ধরণের। কিন্তু অন্দরের কথা স্বতন্ত্র। বড় বড় রাজার ঘরেও সেরূপ অন্দর সচরাচর সহজে দৃষ্ট হয় না।

আবাস-গৃহ এরূপ পাথর এবং ইষ্টকদ্বারা আশ্চর্য্যভাবে নির্ম্মিত হইলেও, সাবেক, পুরাণ সেই ভাঁড়ার-ঘরটী এখনও মাটির দেওয়াল-বিশিষ্ট ছিল! ঐ ভাঁড়ার-ঘর পয়মন্ত, লক্ষ্মীমন্ত বলিয়া ঠাকুরদাদা উহা ভাঙ্গেন নাই।

ক্ষুধার্ত্ত কালাচাঁদ অন্দর দেখিয়াই মুগ্ধ। কোন কথাটী কহিলেন না। পশ্চাতে নিবদ্ধ-নৌকাবৎ কালাচাঁদ, ঠাকুরদাদা-ষ্টীমারের সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে যাইতে লাগিলেন।



## পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

অন্দরের উঠান পার হইয়া, কালাচাঁদ দ্বিতলে উঠিবার সিঁড়িতে পা দিলেন। পায়ে নরম ঠেকিল,—পিছল বোধ হইল,—বেশ আরাম-আরামও লাগিতে লাগিল। নীচে চক্ষু নামাইয়া ভাল করিয়া দেখিয়া বুঝিলেন,—এ সিঁড়ি বালিচূণের নহে,—মার্ব্বল পাথরে রচিত। ভাবিলেন, "কাণ্ডখানা কি? ব্যয়কুণ্ঠ ঠাকুরদাদা কতটাকা উপার্জ্জনের পর কেবল এক সিঁড়িতেইএত টাকা ব্যয় করিতে সক্ষম হইয়াছেন!—এ রহস্য কেহ কি ভেদ করিতে পারেন?"

দ্বিতলে উঠিয়া দেখিলেন, এক দরদালান; মেজে পাথরের!—কালাচাঁদের বোধ হইল, এ পাথরগুলা অপেক্ষাকৃত কিছু কম মূল্যের,—কেন না, ইহা তাঁহার পায়ে পূর্ব্ববৎ মোলায়েম ঠেকিল না।

সম্মুখে এক বৃদ্ধা স্ত্রী আসিয়া দাঁড়াইলেন। লক্ষ্মীরূপিণী সতী—যেন প্রকৃতই পবিত্রতার

আধার। পরিধান রাঙ্গাপেড়ে ঘন-বুনান কাপড়। গলায় মালা। নাকে তিলক। সিঁথা, সিন্দূরে সবিশেষ বিলেপিত। হাতে সুবর্ণকঙ্কণ,—লৌহ। ঘোম্‌টা ঈষৎ টানা। বয়স ষাট-পঁয়ষট্টি বৎসরের কম হইবে না।

সেই সতীসাধ্বী,—কালাচাঁদকে দেখিয়া ছল-ছল নেত্রে, ধীরে ধীরে বলিলেন,—"বাছা, এত দিন কি আমাদিগে ভুলে থাক্‌তে হয়?—"

এই কথা বলিতে না-বলিতে বৃদ্ধার চক্ষু দিয়া টস্‌-টস্‌ জল পড়িতে লাগিল।

ঠাকুরদাদা, কালাচাঁদকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"ইনি তোমার পিতামহী, প্রণাম কর।"

কালাচাঁদ, ঠাকুরদাদার সহধর্ম্মিণীকে,—অর্থাৎ তাঁহার বর্ত্তমান ঠাকুরমাকে, ভূমিষ্ঠ হইয়া ভক্তিভাবে দণ্ডবৎ হইলেন।

ঠাকুরমা মাথায় হাত দিয়া সুগম্ভীর-স্বরে আশীর্ব্বাদ করিলেন,—"বাছা, একশত বৎসরের হইয়া বাঁচিয়া থাক।"

ঠাকুরদাদা, তীব্রকটাক্ষে সহধর্ম্মিণীর পানে চাহিলেন। সরলমতি ঠাকুরমা, সে কটাক্ষ দেখিতে পাইলেন না। কিন্তু কালাচাঁদ তাহা দেখিলেন।

ঠাকুরমা কালাচাঁদের প্রতি চাহিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন, "বাছা, তুই আমার কেলেসোণা,—তোকে আমি খাওয়াতে মাখাতে পেলেম না—একি আমার কম দুঃখ? ওঁকে সেদিনও বলিলাম, আমার কেলেসোণার খবরটী আনাও। উনি কোথাও তোর সন্ধান পেলেন না। বাছা, তোর আপন ঠাকুরমা এবং আমি—আমরা দুই জনে দুই "যা" ছিলাম। তিনি সতীলক্ষ্মী ছিলেন,—আগেই গেলেন,—কিন্তু বড় কষ্টপেয়ে গেছেন,—তোর বাপ তখন সাতমাসের-টী,—তোর বাপ দুধের জন্য কাঁদ্‌তো,—বেশী দুধ দিতে তখন আমরা কোথা পাবো? একদিন ছেলেটী কাঁদ্‌চে—সতীলক্ষ্মীও, ছেলেটীকে কোলে ক'রে কাঁদ্‌চেন। আমি জিজ্ঞাসিলাম,—দিদি তুমি কাঁদ্‌চো কেন? দিদি বল্‌লেন, 'ছেলের দুধে কুলায় নাই,—তাই ক্ষুধায় কাঁদ্‌চে।

এই রকম রোজ কাঁদে।' তখনত আমাদের পয়সা-কড়ি ছিল না যে,—বেশী দুধ রোজ-ক'রে খাওয়াব! আমি বলিলাম, 'দিদি! সেজন্য তুমি কেঁদো না। আমার মাইয়ে খুব দুধ আছে,—আমি খাওয়াচ্চি,—ছেলে আর কাঁদ্‌বে না।' আমি ছেলেকে মাই দিলাম, ছেলের পেট ভরিল,—কান্না থামিল। সেই দিন থেকে দিদির জ্বর হলো,—তিন দিনের দিন দিদি গঙ্গা পেলেন। বাছা!—কেলেসোণা! সেই দিন থেকে আমার মাই খাইয়ে তোর বাপ্‌কে মানুষ করে ছিলাম। তোর বাপ্ রাত্রে একদণ্ড মাই ছাড়্‌তো না,—আমার এই বুকের উপর সমস্ত রাত শুয়ে মাই খেতো,—এই রকম পাঁচ বছর ধরে মানুষ করে ছিলাম। সুরেশের বাপকে, তোর বাপ মাই খেতে দেয় নাই,—চারি বছরের ছেলে হয়েও তোর বাপ মাই ছাড়ে নাই। সুরেশের বাপ তখন আড়াই বছরেরটী। যদি লুকিয়ে কখন তাকে মাই দিতাম, তোর বাপ জান্‌তে পেরে, অমনি দৌড়ে এসে আমার চুল ধরে টেনে

পোড়ারমুখী—তুই বুঝি ভাইকে মাই দিচ্ছিলি'—এই বলিয়া আমার পিঠে, সে গুম্ গুম্ কীল মারিত। তোর বাপের সে মিষ্টি কথাগুলি আজও সব মনে আছে। বাছা! কেলেসোণা! তুই তার ছেলে,—তুই আজ যেটের কোলে ২৫ বছরের হয়েচিস্—ঠাকুরমা বলে কি একদিনও তোকে আমার কাছে আস্‌তে নেই? ওঁকে (হরিতারণকে) যত বলি, কেলেসোণাকে একবার নিয়ে এস; উনি তত রেগে বলেন, "ওর মামারা আস্‌তে দেয়না ত, আমি কি কর্‌বো?" ধন্যি! বাছা তোর পাষাণ শরীর—একবারও কি এ দিকে উঁকি মার্‌তে নেই?—"

এই বলিয়া বৃদ্ধা হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

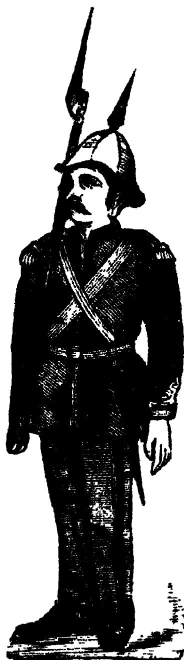
কালাচাঁদ বিনয়নম্রস্বরে উত্তর দিলেন, "ঠাকুরমা, তুমি কেঁদো না। আমি এবার থেকে আস্‌বো।"

ঠাকুরমা। বাছা! তুমি আসা-আসির কথা বল কেন? তুমি এই-খানে বারমাস থাক না

কেন? তোমার ত এই ঘর। আমি আর ক-দিন বাঁচ্‌বো? যে-ক-দিন বাঁচি, তোমায় খাওয়াই, মাখাই, দেখি। তোমার একটী বিয়ে দি—নাতবৌ ঘরে আসুক। সুরেশ তোমার চেয়ে প্রায় পাঁচ-বছরের ছোট। আমার ইচ্ছা ছিল, আগে তোমার বিয়ে দিয়ে, পরে সুরেশের বিয়ে দিব। আজ তিনবছর হলো, সুরেশের বিয়ে হয়েচে! তখন 'উনি' তোমাকে কত খুঁজ্‌লেন। আমি বল্‌লাম,—কেলেসোণা বড়,—বড় থাকৃতে ছোটর বিয়ে হতে পারে না। তা, 'উনি ত' তোমাকে কোথাও খুঁজে পেলেন না,—কাজেই সুরেশের আগে বিয়ে দিতে হলো। বাছা, এ তোমার ঘর, আমি তোমার ঠাকুরমা,—পর মনে করিও না,—তুমি ঘরের ছেলে, ঘরেই থাক। আমি তোমার বিয়ে দিয়ে তোমাকে ঘরবাসী কর্‌বো—এইটীই আমার সাধ।

ঠাকুরদাদার মুখ রক্তিম-বর্ণে রঞ্জিত হইল। এবারও কালাচাঁদ তাহা লক্ষ্য করিলেন।

ঠাকুরদাদার বক্ষ কাঁপিল, মাথা ঘুরিল, মুখ শুকাইল;—বিচক্ষণ বুদ্ধি-কালাচাঁদ তাহাও বুঝিতে পারিলেন।



## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

দ্বিতলে যেটী সর্ব্বোৎকৃষ্ট গৃহ বলিয়া আখ্যাত, সেই গৃহেই আহারের বন্দোবস্ত হইয়াছে। উৎকৃষ্ট অর্থে,—ঘরটী খুব লম্বা-চৌড়া, উত্তর-দক্ষিণ খোলা,—ভাল মার্ব্বল পাথরের মেজে; ঝাড়-লণ্ঠন খাটানো; দেওয়ালে চিত্র-করা। এ ঘরটী যেন অন্দররে বৈঠকখানা।

ঠাকুরমা, সুরেশের মা এবং দুইজন পাচিকা-ব্রাহ্মণী—এই ঘরে আহারীয় দ্রব্য সাজাইতেছিলেন। তিন জনের স্থান হইয়াছিল; ঠাকুরদাদা, কালাচাঁদ এবং সুরেশ।

সুরেশ, ঠাকুরদাদার পৌত্র,—বংশধর,—সোহাগের সাগর। সুরেশের বয়ক্রম ঊনবিংশতি। ষোল বৎসরে তাঁহার বিবাহ হয়। বিবাহকালে সুরেশ হুগলী-কালেজের ছাত্র ছিলেন।

সুরেশ এখন লেখাপড়া-ত্যাগী, সঙ্গীতে অনু-

রাগী। সেতার-বাজনা শিখিতেছেন! একজন ওস্তাদকে মাহিনা করিয়া রাখিয়াছেন। সেতারের সহিত সঙ্গত করিবার জন্য একজন বাদকও নিযুক্ত আছে।

সুরেশচন্দ্র, পোষাক-পরিচ্ছদেও বিশেষ মনোযোগী। সাড়ে তিনশত টাকা দিয়া একখানি বালাপোষ তৈয়ারি হইতেছে। মুরশিদাবাদ হইতে খলিফা আসিয়াছে।

সুরেশ ক্রমশ যে এত উন্নতি করিতেছেন, ঠাকুরদাদা সে বিষয় সম্যক অবগত ছিলেন না। তবে একথা তিনি শুনিয়াছিলেন, সুরেশ কালেভদ্রে ক্বচিৎ একটী আধটী গান গাহিয়া থাকেন, কখন বা পূজা-পর্ব্বোপলক্ষে ইংরেজী-ফ্যাশনে টেড়ি কাটেন, মাসান্তে বা কখন একটু আতর-গোলাপ মাখেন। তা, বয়স-দোষে এমন এক-আধটু ঘটিয়াই থাকে। নচেৎ ঠাকুরদাদা যদি জানিতেন যে, সুরেশ পয়সা খরচ করিয়া ওস্তাদ রাখিয়াছে, সাড়ে-তিনশত টাকা মূল্যের বালাপোষ তৈয়ার

করিতেছে, তাহা হইলে'ত এতক্ষণ মাথামুড় খুঁড়িয়া, বুক চাপড়াইয়া, বাড়ী ফাটাইয়া দিতেন। সুরেশ যে, ভাল ছেলে, সে সম্বন্ধে তিনি বিশেষ পরীক্ষাও পাইয়াছিলেন।

একবার একজন গোঁয়েন্দা আসিয়া তাঁহাকে সংবাদ দেয়, "সুরেশ বাবু একটী সেতার ৭৫৲ টাকায় কলিকাতা হইতে খরিদ করিয়া আনিয়াছেন; গোয়ালিয়র-বাসী একজন ওস্তাদ সেই সেতার বাজাইতেছে। আজ তিন দিন হইল, সে ওস্তাদ আসিয়াছে।" এই কথা শুনিয়া কর্ত্তা ক্রোধে ক্ষোভে কেমন যেন বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হইলেন। গোয়েন্দাকে বলিলেন, "বলিস্ কি?—বলিস্ কি?—তবে কি সুরেশ আমার সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছে? উঃ! সর্ব্বনাশ হলো, সর্ব্বনাশ হলো!—সুরেশ এখন কোথা বল্‌তে পারিস্?"

গোয়েন্দা। আর—মোশাই! তিনি নিজের বৈঠকখানায় ব'সেই একাণ্ড কর্‌চেন।

কর্ত্তা। এখন গেলে দেখ্‌তে পাওয়া যায় কি?

গোয়েন্দা। হাঁ, পাবেন বৈকি ?

গোয়েন্দা—সেই পতিতপাবন পরামাণিক। একদা কোন বিশেষ কারণবশত, সুরেশ, পতিতকে জুতা মারিয়াছিলেন। পতিত প্রতিশোধ লইবার চেষ্টায় ছিল। অদ্য সুযোগ পাইয়া পতিত বাদ সাধিল।

যাত্রাকালে কর্ত্তা বলিলেন, "পতিত, তুমিও আমার সঙ্গে এস।"

যোড়হাতে পতিত উত্তর দিল, "হুজুর! মাপ কর্‌বেন,—বাবু আমাকে দেখ্‌লেই, আজ না হয়, এর পর মেরেই ফেল্‌বেন। আমাকে তিনি আপনার সঙ্গে দেখ্‌লেই ঠিক করে ল'বেন,—এই বেটাই ঠাকুদ্দাকে ডেকে এনেচে।"

তখন কর্ত্তা একাই, সুরেশের বৈঠকখানাভিমুখে অর্দ্ধ-দৌড়ন-গোছ-ভাবে যাইতে লাগিলেন।

সুরেশচন্দ্রের বৈঠকখানা গোহাল-বাড়ীতে। এখানে গোহালবাড়ী অর্থে গোরু থাকিবার বাড়ী নহে। ঐ স্থানে—কে-জানে,—পূর্ব্বে কবে বুঝি গরু থাকিত, তাই উহার নাম আজও গোহাল-

বাড়ী! গোহালবাড়ীটী—এখন বাগানবাড়ী;—একটী পুকুর আছে; এবং উপর-নীচে দুই-কুঠারী এক দ্বিতল দালানও আছে। এই বাগান—চতুর্দ্দিকে প্রাচীর বেষ্টিত। বাগানের ফটকে অবশ্যই দ্বারবান নাই। তবে যেদিন সুরেশচন্দ্র, বৈঠকে বসিয়া গীতবাদ্যাদি ক্রিয়ায় বিশেষ নিমগ্ন হন, সেদিন ফটকে একজন প্রহরীস্বরূপ লোক বসিয়া থাকে।

অন্দরের খিড়্‌কি দিয়া গেলে, বাগানে শীঘ্র সহজেই যাওয়া যায়। কিন্তু সদরের বহিঃরাস্তা দিয়া বাগানে একটু ঘুরিয়া যাইতে হয়। কর্ত্তা সদর-রাস্তা দিয়াই যাত্রা করিলেন।

সুরেশ, চালাক ছেলে। আটঘাট বাঁধিয়া তবে গীতবাদ্য-কেলীকৌতুকে রত হইতেন। বাগানের ফটকেত প্রহরী বসিতই; ইহা ব্যতীত বাটীর অন্যান্য দাসদাসীবৃন্দ সুরেশের গোয়েন্দা স্বরূপ ছিল।

ওদিকে, নাতিকে ধরিতে সদররাস্তা দিয়া ঠাকুরদাদা দ্রুত-পদে চলিলেন,—এদিকে সর্ব্বাগ্রে

সুরেশকে সংবাদ দিতে, অন্দর দিয়া একজন ভৃত্য লম্বালম্ফে দৌড়িল।

ভৃত্য অবশ্যই আগে পৌঁছিল। সুরেশচন্দ্র, প্রকৃতই তখন সেতার-বাদ্যের মহোৎসবে মাতিয়াছেন। বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হইয়া একাগ্রমনে ওস্তাদজীর নিকট হইতে গৎ শিখিতেছেন। এমন সময় তিনি ঠাকুরদাদা আগমনের বার্ত্তা পাইয়া বড়ই বিব্রত হইলেন। হঠাৎ কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। সেতার এবং তবলা বাজনা'ত তখনি বন্দ হইয়া গেল,—কিন্তু সেগুলাকে লুকাইবার কি? ওস্তাদজী, সঙ্গতকার, বয়স্য—ইহাঁদিগকেও বা রাখি কোথা? এদিকে,—ঐ বুড়াকর্ত্তা আসিল, ঐ বুড়াকর্ত্তা আসিল,—এইরূপ শব্দ পড়িয়া গেল। কর্ত্তা তখন ফটক পার হইয়া সুরেশকে "সুরো," "সুরো" বলিয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিতেছেন। সুরেশ ভয়ে সাড়া দিতে পারিতেছেন না।

হয় কি, করি কি?—গেল, গেল,—বুঝি আর

সুরেশের সেতার-শিক্ষা।



ARTIST PRESS

বাঁচিল না! কর্ত্তা ক্রমশই অগ্রবর্ত্তী হইতে লাগিলেন।

সেতার-বাদক ওস্তাদজী তৈয়ারি লোক। তিন-সংসার তাঁহার কেহ নাই,—পুত্রকন্যা নাই, সহ-ধর্ম্মিণী নাই, ভাই-বন্ধু নাই;—তিনি কেবল দেশে দেশে ওস্তাদি করিয়াই বেড়ান। নানা দেশ ভ্রমণ-নিবন্ধন তিনি নানা বিষয়-ব্যাপার দর্শন করিয়াছেন,—সুতরাং অভিজ্ঞতা বিলক্ষণ আছে। বিশেষ, অন্যান্য স্থানে এমন্-সব মজলিসে তিনি অনেকবার অনায়াসে সু-সুখে সু-উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

এরূপ সঙ্কটে উপস্থিত-বুদ্ধি ওস্তাদজী বলিলেন, "ভয় কি?—ঐ যে আমকাঠের বড় সিন্দুকটা রহিয়াছে, ঐটাতে সেতার এবং ঢোলক-তবলা রাখা হউক, এবং আমিও ঐটাতে লুকাইতেছি,—তুমি সিন্দুকে চাবি দাও—"

সুরেশ। আপনি হাঁপিয়ে যাবেন যে—

ওস্তাদজী। না—না—সিন্দুকের মুখে একটু ফাঁক আছে—আমকাঠের ডালায় তেওড় আছে।

এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ ওস্তাদজী সেতার ঢোলক তবলা লইয়া স্বয়ং সিন্দুকে ঢুকিয়া পড়িল। পড়িয়া বলিল,—"শীঘ্র চাবি দাও,—আর, রতন! (বাদক) তুমি ও-ঘরে গিয়া ব'স। কর্ত্তা যাই এ-ঘরে আসিবেন,—তুমি অমনি সিঁড়ি দিয়া নামিয়া ঐ কাঁঠালগাছের আড়ালে বসিয়া থাকিবে।—আর গণেশ! (সুরেশের জমা-খরচ শিক্ষক)!—তুমি জমা-খরচের খাতা পাতিয়া বাবুকে সুদ-কশা শিখাও।"

উপদেশমত শীঘ্র সকল কার্য্য সমাধা হইল। গণেশ সম্মুখে দুইখানা জমা-খরচের খাতা রাখিল;—এবং কাগজ কলম দোয়াত লইয়া, সুরেশচন্দ্রকে সুদ-কশা শিখাইতে লাগিল।

গণেশ বলিতেছে,—"তিনবৎসর মেয়াদে একজন ৭১২৷৷৹ টাকা ধার লইল। মাসিক সুদ টাকা প্রতি ৴১২৷৷৹ আড়াই পয়সা। তিন মাস অন্তর সুদ আসলে চড়িবে। দুই বৎসর পাঁচ মাস এগার দিন পরে কর্জ্জিদার ব্যক্তি, বিষয় হস্তান্তরের

চেষ্টায় আছে। সুতরাং মেয়াদ তিন বৎসর থাকিলেও, এক্ষণে নালিষের কারণ হইল। বল দেখি, তুমি তাহার নামে সুদে-আসলে কত টাকার দাবীতে লালিষ করিবে?

সুরেশচন্দ্র নিবিষ্টচিত্তে সুদ কসিতে লাগিলেন। গণেশ বলিতেছে, "সুদ, আসলে চড়িবে—যেন মনে থাকে,—"

এমন সময় ঠাকুরদাদা দ্বিতলের গৃহে আসিয়া পৌছিলেন। তিনি যাহা দেখিলেন, তাহাঁতে স্বভাবতই তাঁহার রাগ কমিল। জিজ্ঞাসিলেন,—"সুরেশ! তুমি কি করিতেছ"?—

সুরেশ। আজ্ঞে, একটা সুদকসার ভয়ানক শক্ত অঙ্ক কসিতেছি।

ঠাকুরদাদা। কি অঙ্ক?

সুরেশ। এই এই—তিন মাস অন্তর সুদ,—আসলে চড়িবে।

ঠাকুরদাদা। তিন মাস অন্তর কেন?—এইরূপ হিসাব কর।—কর্জ্জদার, তিন মাস অন্তর সমস্ত

সুদ চুকাইয়া দিবে। যদি না দেয়,—সুদের যদি পাই-পয়সা বাকি রাখে, তবে মাসে মাসে সমস্ত সুদ আসলে চড়িবে,—

সুরেশ। আজ্ঞে, তবে তাই কর্‌চি—

ইংরেজীলেখাপড়া ভাল হইল না দেখিয়া, ঠাকুরদাদা জমীদারীর কাজকর্ম্ম, এবং সুদ কসিবার হিসাবাদি শিখাইবার জন্য গণেশ পণ্ডিতকে নিযুক্ত করেন। গণেশ প্রথম-প্রথম মাষ্টার নিযুক্ত হইয়া,—সুরেশকে সুদকসাদি শিখাইবার কিছু চেষ্টা পাইয়াছিল। কিন্তু শিখাইতে গেলে, চাকুরি থাকে না। কাজেই মাষ্টারও, ছাত্রের দলে মিশিল।

সে যাহা হউক, সুরেশের একান্তভাব দেখিয়া ঠাকুরদাদা সন্তুষ্ট হইলেন। ভাবিলেন, "সুরেশচন্দ্র যেরূপ মনোযোগের সহিত সুদের হিসাব শিখিতেছে, তাহাতে উহাদ্বারা ভবিষ্যতে বিষয় রক্ষা হইতে পারে।"

ঠাকুরদাদা, নাতিকে উপদেশ দিলেন, "এঘরের জিনিসপত্র যত্ন ক'রে রাখ্‌বে,—সতরঞ্চ, চাদর,

বালিস—প্রত্যহ রোদে দিবে। আমকাঠের এই বড় সিন্দুকটায় রুই ধরে নাই'ত?"

সিন্দুকের নামে সুরেশের মুখ শুকাইল।

ঠাকুরদাদা কিন্তু সিন্দুকের কথা ছাড়িলেন না। তিনি বলিতে লাগিলেন,—"ঐ সিন্দুকটী আমার লছ্‌মী। ঐ সিন্দুকে এক-শ-টাকা রাখ্‌লে দু-শ-টাকা হতো—"

এই বলিয়া ঠাকুরদাদা সিন্দুকের নিকট গিয়া স্বহস্তে সিন্দুকের ধূলা ঝাড়িতে লাগিলেন।

সুরেশের চক্ষুস্থির। ঠাকুরদাদা যদি বলেন,—"সিন্দুক খুলিব,—সিন্দুকটা কেমন আছে দেখিব,—" তাহা হইলে'ত মরিলাম। লোক রোগে মরে, দংশনে মরে, জলে ডুবিয়া মরে, আগুনে পুড়িয়া মরে, অস্ত্রাঘাতে মরে,—কিন্তু সিন্দুক খুলিলেই যে সুরেশ মরে,—এ কিরকম কথা?—কেমন শাস্ত্র? এদিকে সিন্দুকের ডালাটী তোলা হইবে, ওদিকে সুরেশের প্রাণটী উড়িয়া যাইবে,—এইবা কেমন হিসাব? হিসাবপত্র বুঝি না,—কিন্তু সুরেশ বস্তুত মৃত্যুই ভাবিতেছিলেন।

ওস্তাদজী অনেক-দেশ-দর্শী কিনা,—তাই অনেক দিন হইতেই তাঁহার একটু কাশীর ব্যারাম সঞ্চিত হইয়াছে। তিনি মাঝে মাঝে খুক্ খুক্ কাশেন।

সিন্দুকের ভিতর উপবিষ্ট ওস্তাদজীর অতি সামান্য মাত্রায় গলায় কাশীর আমেজ আসিতে লাগিল। কেহ চিন্তিত হইবেন না,—এ তেমন বেশী কাশী নয়,—বোধ হয় একবার খুব আস্তে আস্তে গলা-খেঁকারি দিলেই, এ কাশী সারিয়া যাইতে পারে।

ওস্তাদজী ভাবিতে লাগিলেন, "আমি যদি এখন এ কাশীটা চাপিয়া রাখিতে না পারি,—তাহা হইলেত সর্ব্বনাশ! প্রাণ যায়, তাও স্বীকার, তবু কাশিব না।"

ওস্তাদজীর পেট ফুলিতে লাগিল, ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতে আরম্ভ হইল।

সিন্দুকের ভিতর সহস্র মশায় ওস্তাদজীকে দংশন করিল,—তবু তিনি নড়িলেন না। নড়িলে যদি শব্দ হয়!!

একটা কাঁকড়া-বিছায় ওস্তাদজীর পায়ে বিষম কামড়াইয়া দিল। ভয়ঙ্কর জ্বালা। ওস্তাদজী ভাবিলেন, সাপ নাকি? তিনি অন্তরে "উ-হু-হু, গেলাম,—" করিতে লাগিলেন। একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক স্থির করিলেন, কথা কিছুতেই কওয়া হবে না। যদি সাপ হয়, তবেত নিশ্চয় মরিব,—এখন কথা কহিয়া লাভ কি? যদি বিছার কামড় হয়, তবে জ্বালা তুই-চারি দণ্ডের পর নিশ্চয় নিবৃত্তি পাইবে। সুতরাং এখন কথা কহিয়া সব ফাঁক করি কেন?

কতকগুলা আরসুলা উড়িয়া ওস্তাদজীর গায়ে, মুখে, নাকে বসিতে লাগিল। তুর্গন্ধে নাড়ী উঠিবার উপক্রম হইল। ওস্তাদজী বিষম বিব্রত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু তথাচ তাঁহার বাক্যনিঃসরণ নাই। ধন্য ওস্তাদ!!

ওস্তাদজী লোক-মুখে শুনিয়াছিলেন, যেস্থানে সাপে কামড়ায়, সেস্থান বা তাহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের "সাড়্" থাকে না,—তথায় চিমুটী কাটিলে লাগে

না। তিনি সেই দক্ষিণ-পদটা একটু সরাইয়া চিম্‌টী কাটিয়া পরীক্ষা করিবার চেষ্টা করিতে গেলেন। যাই পা সরাইবেন, অমনি একটু হুড়ুৎ করিয়া শব্দ হইয়া উঠিল।

সিন্দুকের দিকেই সুরেশের লক্ষ্য ছিল। এ শব্দ তখনই তাঁহার কাণে গেল। শব্দ শুনিয়াই তিনি অজ্ঞান-প্রায় হইলেন। তাঁহার সর্ব্ব-শরীরের যেন বাঁধন খুলিয়া গেল। যেন অন্তর্জ্জলির সময় উপস্থিত!

সে শব্দ ঠাকুরদাদার কর্ণকুহরে অবশ্যই প্রবিষ্ট হইয়াছিল। তিনি সুরেশকে জিজ্ঞাসিলেন,— "সিন্দুকে ইন্দুরে বাসা করে নাইত? সিন্দুকের ডালা খু'লে মধ্যে মধ্যে হাওয়া লাগাতে হয়— সিন্দুকের কাগজপত্র মধ্যে মধ্যে রোদে দিতে হয়!—সিন্দুক পরিষ্কার রাখিলে, তাহাতে কখন ইন্দুরও ঢোকে না, উইও ধরে না। নিয়ে এস'ত একবার চাবি-কাটীটে,—সিন্দুকটা খুলে দেখি।"

প্রকৃতই সুরেশের তখন কণ্ঠশ্বাস উপস্থিত।

ওস্তাদজী ভাবিতেছেন, "এইবার প্রকৃতই বুঝি মুস্কিল বাধিল। কিন্তু সুরেশের যদি বুদ্ধি থাকে, তবে এখনও খানিক রক্ষা হয়। সুরেশ খানিক খুঁজিয়া বলুক্‌না কেন,—চাবিকাটী পাওয়া গেল না—হারাইয়া গিয়াছে। তা'হলে, ঠাকুরদাদা'ত সুরেশের আর মাথা নিতে পার্‌বে না,—নাহয় একটু ধম্‌কাবে। তারপর, কামার ডাকো, চাবি ভাঙ্গো, সিন্দুক খোলো,—সে এখন ঢের কালের কথা! কিন্তু সুরেশের এ বুদ্ধিটুকু হবে কি?—অথবা আমারই চুক্‌ হইয়াছিল। সিন্দুকে ঢুকিবার সময় আমিই যদি সুরেশকে বলিয়া রাখিতাম যে, ঠাকুরদাদা চাবিকাটী চাহিলে,—ব'লো,—'হারাইয়া গিয়াছে,'—তাহা হইলেত এখন সব গোলই মিটিত। আমারই আহাম্মকি হইয়াছে।"

আর চাহিয়া দেখিতেছ কি? সুরেশের কপালে গঙ্গামাটী দাও, মুখে গঙ্গাজল দাও, কাণের কাছে হরি-সংকীর্ত্তন কর,—সুরেশের মৃত্যু সন্নিকট!

সুরেশের বাক্‌রোধ। "চাবিকাটী দিতেছি, কি

দিব, কি খুঁজিয়া পাইতেছি না,”—ঠাকুরদাদার কথায় তিনি এরূপ কোনও উত্তর দিতে পারিলেন না। যিনি মৃতপ্রায়, তিনি কথা কহিবেন কেমন করিয়া?



## সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পরমায়ু থাকিতে মানুষ মরে না। সুরেশের আজও দিন ফুরায় নাই, তাই সুরেশ দৈবানুগ্রহে বাঁচিয়া উঠিলেন।

যে চাকর লম্ফ-লম্ফে দৌড়িয়া আসিয়া, ঠাকুর-দাদার আগমনবার্ত্তা-বিষয়ে সুরেশকে প্রথম সংবাদ দেয়, সেই চাকরটাই হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া বলিল, "কর্ত্তা মোশাই, শীঘ্র আসুন,—ভাঁড়ার ঘরে সাপ বেরিয়েচে—"

চাকরের কম্পন।

কর্ত্তা। বলিস্ কিরে?—কি সাপ?—কি সাপ?

চাকর। মস্ত সাপ!—সে আর আপনাকে কি বল্‌বো!!

কর্ত্তা। কাকেও কামড়ায় নাইত?

চাকর। তাই বা কেমন করে বল্‌বো!—আপনি শীঘ্র আসুন। গিন্নি ডাক্‌চেন!

কর্ত্তা আগে আগে, চাকর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল।

বহির্বাটী এবং অন্দরের মধ্যস্থলে এক মাটীর ভাঁড়ার ঘর। এটী ঠাকুরদাদার দুঃখের দশার ঘর। সেকালে এই ঘরের একপাশে তিনি রাঁধিতেন, একপাশে শুইতেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ঘরটী লক্ষণ-যুক্ত বলিয়া ঠাকুরদাদা ভাঙ্গেন নাই।

ঠাকুরদাদা ত সাপ দেখিতে ছুটুন, এদিকে সুরেশচন্দ্র তাড়াতাড়ি উঠিয়া সিন্দুকের চাবি খুলিয়া ফেলিলেন। দেখিলেন, ওস্তাদজী সংজ্ঞাহীন। তাঁহার মুখটা হাঁ-করা; জিব্‌টা খানিক বাহির হইয়া পড়িয়াছে; নিশ্বাস বহিতেছে কি না সন্দেহ! চক্ষু দুটা মুদ্রিত। সুরেশ প্রথম দৃশ্যেই ভাবিলেন,—ওস্তাদজী বুঝি হাঁপাইয়া মরিয়াছেন। তারপর তাহার নাকের নিকট হাত লইয়া গিয়া দেখিলেন, এখনও মরেন নাই,—এখনও একটু একটু নিশ্বাস বহিতেছে। শেষে সুরেশ এবং তাঁহার শিক্ষক—উভয়ে ধরাধরি করিয়া,

সিন্দুক হইতে ওস্তাদজীকে বাহির করিবার চেষ্টা করিলেন। ওস্তাদজীর অবস্থা—তদ্‌বৎ,—নড়ন-চড়ন নাই,—অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একেবারে যেন শিথিল হইয়া এলাইয়া পড়িয়াছে।

প্রকৃতই কি ওস্তাদজীর মরণ নিকট? তাহা নহে। ঠাকুরদাদা যখন সাপ ধরিতে গেলেন, ওস্তাদজী তখন ভাবিলেন,—সিন্দুক হইতে সহজ অবস্থায় আমার বাহির হওয়া হইবে না,—একটা পেঁচ দেখাইতে হইবে। আমি মড়ার মত হইয়া থাকি,—আমাকে তুলুক, বাতাস করুক, মুখে জল দিউক,—তবে আমার চেতন হইবে। সুরেশ যখন আমাকে পাখার বাতাস দিতে-দিতে বলিবে, 'ওস্তাদজী! আপনি আজ আমার জন্য বড়ই কষ্ট পেলেন!' আমি তখন বলিব, 'আপনার কার্য্যে প্রাণটাগেলেও আমি কোন কষ্ট বোধ করিতাম না। এ কষ্ট ত ছার!—আপনার জন্য আমি সর্ব্বস্ব দিতে পারি।' সুরেশ বালক। কিছুই বুঝিবে না। সে আমার কেনা-গোলাম হইয়া থাকিবে। শেষে, এই

সিন্দুকে ঢোকার দরুন অন্তত একশত টাকা পারিতোষিক আদায় করিয়া লইব।”

ওস্তাদজী যাহা ভাবিয়াছিল, তাহাই ঘটিল। সুরেশ খুসি হইয়া, গুণে মোহিত হইয়া, উপসংহারে ওস্তাদকে নগদ দেড়শত টাকা এবং একখানা পুরাণ কাশ্মীরি-শাল বক্‌শীশ দিল।

ওস্তাদজীর নাম তারিণী। কি জাতি, তাহা কে জানে?—কিন্তু তাঁহার পৈতা আছে। বাঙ্গালী। পোষাকটা কিন্তু হিন্দুস্থানীর মত। কথা অধিকাংশ সময়, অপরিচিত লোকের সাক্ষাতে তিনি হিন্দীতে কহিয়া থাকেন। তিনি অনেককেই বলেন, আমার নিবাস গোয়ালিয়র। কেহ পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিলে বলেন, গোয়ালিয়রে বহুকাল বাস ছিল,—এখনও বাসা-বাটী তথায় আছে। আমিই গোয়ালিয়র-রাজাকে সেতার শিখাইতাম, কিন্তু রাজা একদিন একটু সামান্য কড়া কথা বলায়, আমি চাকুরী ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া আসিয়াছি।

সেতার-বাজনা ব্যতীত, ওস্তাদজী অনেকানেক

উৎকট রোগের অনেকানেক উৎকট ঔষধ জানিতেন।

সে যাহাই হউক, ধনবান ব্যক্তির লেখাপড়া-বিহীন উঠন্ত-বয়স্ক বালক দেখিলেই, তিনি যেন চীলের ন্যায় ছোঁ মারিয়া থাকেন।



# অষ্টম পরিচ্ছেদ।



যাউক। চাকর, ভাঁড়ার-ঘরের কতক মাটী খুঁড়িয়া ঐ সাপ, ঐ সাপ!—ঐ চক্কর, ঐ চক্কর!—এইরকম বুলি প্রথমত আরম্ভ করে। কাজেই তথায় লোক জমিয়া গেল। সকলেই বলিল, সাপ বটে,—তবে বাস্তু-সাপে কোন দোষ নাই। কেহ বলিল, আমি অমুক দিন ঠিক ঐখানে সাপ দেখিয়াছিলাম। কেহ বলিল,—একদিন আমি ঐ সাপের লেজে পা দিয়াছিলাম। কেহ বলিল, একদিন রাত্রে সাপটা আমাকে দেখিয়া সড়াৎ ক'রে চলিয়া গিয়া, ঐ গর্ত্তে সান্ধাইয়াছিল। গিন্নি সাপের কথা শুনিয়া কপাটের অন্তরালে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সেই চাকরকে ডাকিয়া বলিলেন, শীঘ্র কর্ত্তাকে ডেকে নিয়ে এস। তাই প্রভু-ভক্ত চাকর লাফাইতে-লাফাইতে দৌড়িয়া গিয়া, সুরেশের শ্রীমন্দির হইতে কর্ত্তাকে দৌড়-কাটাইয়া আনিল।

কর্ত্তা আসিয়া পৌঁছিলে, আরও অধিক লোক-সমাগম হইল। চাকর খুব উৎসাহে আবার মাটী-খোঁড়া-কার্য্য আরম্ভ করিল। কর্ত্তা চাকর্‌কে বলি-লেন, "দেখিস্, মান্‌কে! সাবধানে মাটি কাটিস্—সাপ্‌টা যেন উল্‌টে তোকে চোটায় না।" চাকর্ উত্তর দিল, "আমার গুরুর সেরকম আজ্ঞে নেই! দেখুন, আমি শীগ্‌গির সাপ ধরে নিয়ে যাচ্চি,—"

এইরূপ আধঘণ্টা অতিবাহিত হইল, সাপ ধরা পড়িল না। মাণিক কোথা হইতে খানিকটা সাপের খোলস্ আনিয়া কর্ত্তাকে দেখাইল। বলিল, "দেখুন, হুজুর!—এই খোলস্ দেখুন,—সাপ আজ ধরা পড়িবে না—কাল ধরিয়া দিব।"

সকলে নিশ্চিন্ত হইয়া ঘরে গেল। এমন সময় পতিত পরামাণিক উঁকি-ঝুঁকি মারিতে-মারিতে কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইল। বলিল,—"কেমন কর্ত্তামোশাই! আমি যা বলেছিলাম, সব মিল্‌ল'ত?—"

কর্ত্তা। পতে! তোর মত মিথ্যাবাদী লোকত

আমি কোথাও দেখি নাই! তুই সোণার ছেলে সুরেশের মিছা কুৎসা ক'রে বেড়াস্! তোর কথা শুনে আমি দৌড়ে যেয়ে দেখি,—সোণারচাঁদ আমার, মন দিয়ে সুদকসা শিখ্‌চে,—তুই নচ্ছার-বেটা বলিস্ কিনা, সুরেশ সেতার বাজিয়ে ব'খে গেল! বেঁরো বেটা নাপ্‌তে আমার ঘর থেকে!—মিথ্যাবাদী!—

পতিত সম্ভ্রান্ত নাপিত। এরূপ গালাগালি হঠাৎ কোথাও বড় খায় না। বিশেষ, পতিত একটু ঠোঁট-কাটা এবং বিলক্ষণ মুখ-টান।

পতিতও যথাসাধ্য, যথাসম্ভব ক্রোধ করিয়া বলিল, "আর যা বলুন,—পতিতকে মিথ্যাবাদী বল্‌বেন না। পতিত গরীব ব'লে পতিতকে দুঘা মারতে পারেন,—কিন্তু পতিতকে মিথ্যাবাদী বল্‌বেন না। আপনার মত ভদ্দর লোকের মুখে ও-কথা সাজে কি?—"

কর্ত্তা। পতে! তুই জানিস্, তোকে এখনি জুতিয়ে লম্বা করে দিব—

পতিত। তা মারুন না কেন?—পতিত-ত

তাতে পেছ-পাঁও নেই;—পতিত এই দাঁড়িয়ে রইলো,—জুতিয়ে লম্বা করুন, চেপ্টা করুন,—পতিত কোন কথা কবেন না। কিন্তু পতিতকে মিথ্যাবাদী বল্‌বেন না,—ও-কথাটী মুখ দিয়ে বার্‌ কর্‌বেন না!—পতিত, জেতে নাপিত বটে, কিন্তু সন্ধে-আহ্নিক না করে পতিত জল-গ্রহণ করেন না। অনেক কায়ত-বামুনের চেয়ে পতিতের নিষ্ঠে আছে। পতিতকে আর যা বলুন, সবই সহ্য হবে, কিন্তু পতিত যে, মিছে কথা কয়, একথাটী ব'ল্‌তে পাবেন না; একথা ব'ল্‌লে আপনার ধর্ম্ম থাক্‌বে না!

কর্ত্তা। বেটা, ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির এসে দাঁড়ালো গো!—বেরো বেটা বাড়ী থেকে—নহিলে এখনি জুতো খাবি—বেরো বেটা—

পতিত। (ঈষৎ শ্লেষের সহিত) বেটা কাকে বলে?

কর্ত্তা। লাগাও পঁচিশ জুতি!

কর্ত্তার ইঙ্গিতমতে পতিতের পৃষ্ঠে একজন

ভৃত্য মৃদুমন্দ-মনোহররূপে পাঁচ-সাত-দশ ঘা জুতা বসাইয়া দিল। পতিত ধূলা ঝাড়িতে ঝাড়িতে ক্রোধভরে বাহিরে আসিল। পতিত, চৌকাট ডিঙ্গাইয়াই অর্দ্ধস্ফুটস্বরে বিড়্-বিড়্ করিয়া বকিতে আরম্ভ করিল,—"আঃ—মার্ অমনি পড়ে রয়েছে কি না?—ঘরে পূরে কে-না কাকে মার্‌তে পারে? ঘরে ঢুকিয়ে আমি অমন, রাজার বেটাকেও ঘাস কাটা'তে পারি! মহীরাবণ, পাতালে ঢুকিয়ে রামচন্দরকেও মেরেফেল্‌তে গেছলো!—ওঃ, কি আমার মার্ গো?—পথে এসে একবার মারুন না দেখি?" এইরূপ সমস্ত রাস্তা বক্‌বক্ বকিতে বকিতে শ্রীলশ্রীযুক্ত পতিতপাবন পরামাণিক মহাশয় বাসা অভিমুখে চলিলেন।

পতিতকে একজন জিজ্ঞাসিল, "পতিত! কি হয়েছে? আপনা-আপনি অমন বক্‌চো কেন?"

পতিত উত্তর দিল, "বকি কি আর সাধে? এই,—দাওয়ানজী মোশায়ের সঙ্গে জুতোজুতি হয়ে গেল,—তা কি বল্‌বো, আমি একা ছিলাম।

সঙ্গে একজনও লোক থাক্‌লে, পতিত কি সহজে ফিরে আসিত?”

এরূপ কিংবদন্তী, পতিত সেদিন ঘরের ভাত বেশী করিয়া খাইয়াছিল।



## নবম পরিচ্ছেদ।

পতিতকে জুতা-মারার দিন হইতে ঠাকুরদাদার ধ্রুব-ধারণা হইয়াছিল,—সুরেশ অতি সৎ ছেলে— উহার যোড়া নাই,—হিংসায় কেবল কোন কোন লোকে উহার বদনাম রটায়।

ইহার উপর, ঠাকুরদাদা সুরেশকে প্রাণের সহিত ভালবাসেন। কাজেই সুরেশ যা করেন, তাই তাঁহার ভাল লাগে; সুরেশ যা চাহেন, তাই তখনি পান; সুরেশের দোষ, তাঁহার চক্ষে গুণ বলিয়া মনে হয়।

কিন্তু তাই বলিয়া, সুরেশ নগদ টাকা চাহিলে, ঠাকুরদাদার নিকট যে প্রাপ্ত হইতেন, তাহা নহে। সুরেশও বুদ্ধিমান, কখন নগদ টাকা চাহেন নাই। নগদ টাকার রোজগার অন্য উপায়ে হইত। এই দেখুন,—সুরেশ বলিলেন, আমি স্কুলে আর পড়িব না। ঠাকুরদাদা একটীবার মাত্র বলি-

লেন, "স্কুলে পড়্‌বে বৈকি? স্কুলে না পড়্‌লে হয় কি?" সুরেশ অমনি কাঁদ-কাঁদ হইলেন। ঠাকুরদাদা আর থাকিতে না পারিয়া কহিলেন, "আচ্ছা, থাক্—তুমি ঘরে বসেই পড়। আর, বেশী ইংরেজী পড়িবারই তোমার আবশ্যক কি? ঘরে ব'সে জমীদারীর কাজ শিখ। আমি তোমার জন্যে যা রেখে গেলাম, কাজ-কর্ম্ম-শিখে বজায় রাখ্‌তে পার্‌লে, তোমার ছেলের ছেলে পায়ের উপর পা দিয়ে ব'সে খেতে পার্‌বে।"

স্কুল-পরিত্যাগের কিছুদিন পরে, সুরেশ ধরিলেন, গোহালবাড়ীতে আমি বসিব,—ঐখানে বসেই আমি জমা-খরচ লিখিব, সুদকসা শিখিব।

ঠাকুরদাদা, ঈষৎ দূরস্থিত বাগান-বাটীটী আরব্ধ-যৌবন পৌত্রকে প্রথমে দিতে কিছুতেই স্বীকৃত হন নাই। সুরেশচন্দ্র না-ছোড়বন্দ হইলেন,—কেননা ঠাকুরদাদার চক্ষু-কর্ণের অগোচরীভূত, অশ্রুত, নির্জ্জন বৈঠকখানা না পাইলে, সুরেশের সুবিধা হয় না। একদিন রাষ্ট্র হইল, সুরেশ রাগ

করিয়াছেন, ভাত খান নাই। গৃহে হুলস্থূল পড়িল। গৃহিণী কর্ত্তাকে উপরোধ ধরিলেন, "তাতে দোষ কি? ছেলে গোয়াল-বাড়ীতে থাক্‌তে চাচ্চে, থাকুক না কেন?—তুমিত সব বোঝনা! বল্‌তে নেই, শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে,—ছেলে এখন ডাগর হয়েচে, তোমার সাক্ষাতে দিনরাত কি বসে থাক্‌তে পারে?"

কর্ত্তা। কি জান, চোখে চোখে রাখ্‌তে হয় নানা কারণে—

গৃহিণী। (জিহ্বা কাটিয়া) না,—না,—সে কথা বলোনা,—সুরেশের আমার, কোন দোষ নেই,—বাছা আমার চোখ্‌ চেয়ে দেখ্‌তে জানে না। অমন ছেলে কি জন্মায়?

কর্ত্তা। তা, আমি জানি, সুরেশের কোন দোষ নাই। ছেলে খুবই ভাল। তবে কি জান,—সুরেশ বংশের একমাত্র তিলক; ও বই আর কেউ নাই; ও-ই আমার একমাত্র ভরসা—তাই আমার ভয় হয়, যদি,—

গৃহিণী। অমন ছেলের উপর সন্দেহ করতে নেই! মিছে সন্দেহ কল্লে ছেলের অকল্যাণ হয়!—

আর বিশেষ কিছুই বলিতে হইল না। সুরেশচন্দ্র সেইদিন হইতে গোয়ালবাড়ীর অধিকারী হইলেন। সেইদিন হইতে সুরেশচন্দ্রের হৃদয়ের স্ফূর্ত্তি ষোলকলায় প্রস্ফুটিত হইল। সেইদিন হইতে আকাশে সুধাংশু হাসিল, বাঁশীর মধুর-রবে যমুনা উজান বহিল। সেইদিন হইতে সুরেশ চন্দ্রের শুষ্ক-পৃথিবী, সরস স্বর্গ হইল।

বালককাল হইতেই সুরেশ, ঠাকুরদাদার সহিত একত্র অন্নাহার করিতেন। কিন্তু সুরেশ ক্রমশ এই একত্র আহাররূপ কার্য্য হইতে অবসর লইবার চেষ্টায় রহিলেন। ঠাকুরদাদা যোদ্ধা খাবার পূর্ব্বে "সুরো সুরো" করিয়া ডাকেন। কারণ সুরো কাছে বসিয়া না খাইলে, তাঁহার ভাত ভাল লাগিত না। সুরেশকে অনেক সময়ই ডাকাডাকিতে বাধ্য হইয়া আসিতে হয়, কর্ত্তার কাছে বসিয়া খাইতে হয়। ক্রমে শিকল কাটিবার বন্দোবস্ত

হইল। প্রথম ৭ দিন অন্তর ১ দিন কামাই। শেষ ১ দিন অন্তর সাত দিন কামাই।—এই ভাবে ঠাকুরদাদার সহিত আহার চলিতে লাগিল। শেষে সব ফুরাইল। এক্ষণে নাতী এবং ঠাকুরদাদা স্বতন্ত্র সময়ে স্বতন্ত্র স্থানে আহার করেন। তবে যেদিন আহারের কোনরূপ বিশেষ উদ্যোগ হইত, অথবা কিছু নূতনত্ব থাকিত, সেদিন ঠাকুরদাদার আজ্ঞানুসারে উভয়েরই একত্র একস্থানে আহারের স্থান হইত। সুরেশও ইহাতে কিছু বিশেষ আপত্তি করিতেন না।

অদ্য কালাচাঁদ আহার করিবেন। ঠাকুরমা কালাচাঁদকে দেখিবার জন্য চিরদিনই বড়ই ব্যাকুলা ছিলেন। যে কালাচাঁদের বাপকে তিনি স্তন্যদুগ্ধ দিয়া মানুষ করেন, সে কালাচাঁদকে যে, তিনি একটী দিনও খাওয়াইতে-মাখাইতে পান নাই—ইহাই তাঁহার অন্তরের দুঃখ। প্রাতে কালাচাঁদের আগমন-মাত্র কর্ত্তা বাটীতে চাকর দ্বারা গিন্নিকে বলিয়া পাঠান "গিন্নিকে ব'লো,—তোমার কেলে-

সোণা এসেচে,—এই-খানে খাবে।” ঠাকুরমা, কালাচাঁদের নাম শুনিয়া আনন্দে অধীর হইলেন,—এবং ষোড়শোপচারে আহারের বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। স্নানান্তে কর্ত্তাও গৃহে গিয়া গৃহিণীকে বলেন, “কালাচাঁদের জন্য উত্তমরূপ আহারের যোগাড় করিও।” গৃহিণী উত্তর দেন,—“সে কথা কি তোমাকে শিখাইতে হইবে? আমি সাধ্যমত কিছুরই ক্রুটী করিব না।” তথাচ তখন কর্ত্তা গৃহিণীসমভিব্যাহারে স্বয়ং রন্ধনশালায় গিয়া আহারের সুবন্দোবস্তের বিষয় আরও একবার স্বমুখে বলিয়া আসিলেন।

অদ্য আহারের বিশেষ উদ্যোগ; কাজেই সুরেশও একসঙ্গে আহার করিবেন।

কালাচাঁদকে প্রথম দেখিয়া ঠাকুরমার যখন পূর্ব্বস্মৃতি জাগরূক হইয়াছিল, হর্ষ-বিষাদে যখন তাঁহার দু-নয়নে দশ-ধারা বহিতেছিল, তখন ঠাকুরদাদা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“সুরেশ এসেচে কি?”

ঠাকুরমা। স্থরোকে ডেকে এসেচে—এলো বলে! ঐ যে আস্‌চে—খড়মের শব্দ পেয়েচি!



## দশম পরিচ্ছেদ।

সুরেশ হেলিয়া-ডুলিয়া, ধীরে ধীরে পা ফেলিয়া, কোমর ঘুরাইয়া, আসিতেছেন! পরিধান উৎকৃষ্ট পট্টবস্ত্র। গায়ে আঙরাখা,—কি কাপড়ের তৈয়ারি তা জানি না,—কিন্তু তা দিয়া সর্ব্বাঙ্গের সর্ব্বস্ব দেখা যাইতেছে! গলায় সোণার হার। অঙ্গুলে হীরক অঙ্গুরী। বাউরি চুল। কচি-কচি দিব্য গোঁফের রেখা। অধরৌষ্ঠ টুকটুকে লাল। গণ্ডস্থল বেশ গোলগাল হইলেও, কেমন যেন ঈষৎ চড়িয়ে-ভাঙ্গা। নয়ন আয়ত বটে, কিন্তু কোল কেমন বসা। বক্ষ প্রশস্ত। কটীতট ক্ষীণ। নাসিকা শ্রীকৃষ্ণের বাঁশরী। বর্ণ গৌর।

সুরেশচন্দ্র নব-কার্ত্তিকটীর ন্যায় আসিতেছেন বটে, কিন্তু ভাব কেমন বিমর্ষ-বিমর্ষ বা বেজার-বেজার! সুরেশ বোধ হয় ভাবিতেছেন, "কে জানে, আজ কোথা থেকে কে একটা লোক

এসেছে,—তার সঙ্গে ব'সে একত্র খেতে হবে!! লোকটা কি জাত, তার ঠিক নাই,—তবু তার সঙ্গে এক পংক্তিতে আহার করিতে হবে! ঠাকুরদাদার যেমন খেয়ে-দেয়ে কাজ নাই, যাকে-তাকে অমনি বাড়ী ঢুকিয়ে ফেলেন! যেরকম শুন্‌লেম, তাতে'ত লোকটা নিশ্চয়ই হাড়ী বা বাগদী হবে! লোকটা যক্ষ্মা কালো, গায়ে গন্ধ, চুলগুলো ঝাঁকড়-মাকড়,—আঙ্গুলগুলো শক্ত যেন বাকারি! আমি ওর সঙ্গে একত্র ব'সে কখনই খাবো না—আজ না হয় উপ'স ক'রে থাক্‌বো;—ঠাকুরদাদাকে বল্‌বো, আমার জ্বর হয়েচে।" না,—জ্বরের কথা বলা হ'বে না!—ঠাকুরদাদা—যদি নাড়ী দেখে ফেলেন—তবেই গোল হবে। বলবো,—পেটকাম্‌ড়াচ্চে! আচ্ছা, দেখা যাউক,—শেষে যা হয়, একটা এক-রকম স্থির করা যাবে।

বোধ হয় এইরূপ চিন্তামগ্ন হইয়াই সুরেশচন্দ্র আস্তে আস্তে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। দর-দালানে উঠিয়া দূর হইতে কালাচাঁদমূর্ত্তি দেখিয়াই

তিনি অবাক্। সুরেশের চক্ষে কালাচাঁদ এইরূপ প্রতীয়মান হইলেন,—"রংটা কালো মিস্‌মিস্ করিতেছে, মোটা-সোঁটা কুঁদিকাটা মুষ্‌কি জোয়ান, গোল-গোল রাঙ্গা-রাঙ্গা চোখ্ দুটা কুমারের চাকের ন্যায় কেবল ঘুরিতেছে, দাঁতগুলা কিড়্‌মিড়্ করিয়া যেন তাঁহার হৃদপিণ্ড কামড়াইতে আসিতেছে!"

সুরেশ মনে মনে কহিলেন, "এটা কি মানুষ, না ভূত? এমন জানিলে এখানে কে আসিত?—ঠাকুদ্দা এবং ঠকুমা দু-জনেই রয়েচেন, পালাইবা কেমন করিয়া?"

অগত্যা সুরেশ নিকট আসিতে বাধ্য হইলেন। আগমনমাত্র ঠাকুরমা স্নেহভরে সুরেশচন্দ্রকে সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন, "অ,—সুরো! তোর দাদা এসেচে দেখেচিস্,—পেন্নাম কর্—"

সুরেশের চক্ষুস্থির। মনে মনে কহিলেন,—"ইনি আবার দাদা!!—তবেইত গিয়াছি!—"

ঠাকুরদাদা। ইহাঁর নাম কালাচাঁদ। তুমি

এঁকে বোধ হয় এখন চেনোনা; ছেলেবেলায় তুমি একবার-মাত্র দেখেছিলে। আমার জ্যেষ্ঠ সহোদরের পৌত্র। তোমার দাদা। ইহাঁকে প্রণাম কর।

কর্ত্তা এবং গৃহিণী উভয়েই যখন অনুরোধ করিলেন, তখন সুরেশ আর থাকিতে পারিলেন না। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া, হৃদয়ে "হরি রক্ষা কর, হরি রক্ষা কর" বলিতে বলিতে, তিনি কালাচাঁদের পদপ্রান্তে আপন মস্তক নমিত করিলেন। কালাচাঁদও সুযোগ সুবিধা ছাড়িবার লোক নহেন। প্রণাম করিয়া উঠিবামাত্র, তিনি সুরেশের সহিত অমনি কোলাকুলি যুড়িয়া দিলেন। সে বড় সহজ কোলাকুলি নহে;—সাত দিন সুরেশের গায়ে ব্যথা ছিল। গায়ের ব্যথায় সুরেশের বিশেষ কষ্ট নাই;—কিন্তু কোলাকুলি কালে যে তাঁহার বাউরি-চুল ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল, ইহাতেই তিনি মর্ম্মাহত হইলেন।

সুরেশ ভাবিলেন, "দর্শনেই এই ব্যাপার,—না-জানি একত্র ভোজনে আরও কত বিভ্রাট-

বিপত্তি আছে! আজ কাহার মুখ দেখিয়া উঠিয়াছিলাম, বলিতে পারি না! এ কালসাপকে, এ যমদূতকে কেন ঠাকুর্দ্দা ঘরে ঢুকিতে দিলেন? উঃ, মূর্ত্তি দেখ, ঠিক যেন কালভৈরব!”



## একাদশ পরিচ্ছেদ।

কালাচাঁদের ক্ষুধা ক্রমশই বর্দ্ধনশীল। সমুদ্র শুষ্ক হইয়াছে,—পূর্ণ করিতে হইবে।

কর্ত্তা, গৃহিণী, এবং পৌত্রদ্বয়—চারিজনে ভোজন-গৃহের সমীপবর্ত্তী হইলেন। সুরেশের মাতা সে ঘর হইতে সরিয়া গিয়া, ঈষৎ অন্তরালে দাঁড়াইলেন। সে ঘরে রহিল কেবল দুইজন পাচিকা-ব্রাহ্মণী।

কালাচাঁদের দৃষ্টি আহারের দিকে। দূর হইতে দেখিলেন,—ঘরটী কেবল বাটী, থাল, রেকাবীতে ভরা। সবই সাদা-পাথরের—সাদা ধপ্‌ধপ্ করি-তেছে। কালাচাঁদের হৃদয়ে আর আনন্দ ধরে না। উদর! আর খাইতে পারি না, বলিও না!—যত আশ, যত সাধ,—আজ যোলকলায় সম্পূর্ণ করিয়া লও। রসনা! রস-সাগরে ডুবিয়া থাক; হাঁপাইলাম, বলিতে পাইবে না!

সারি সারি তিনখানি আসন; ঈষৎ দূরে-

নাতি ঠাকুরদাদার ভূরি-ভোজন।



দূরে অবস্থিত। প্রথম-খানিতে বসিলেন, ঠাকুর-দাদা;—দ্বিতীয় থানিতে কালাচাঁদ;—তৃতীয় খানিতে সুরেশ। সুকোমল পশমের আসনে বসিয়া কালা-চাঁদ মনে মনে কহিলেন,—"আ! আজ—কি সুখ!"

বাঁশবনে ডোমকাণা। সারি সারি—রেকাব-বাটীর অনন্ত-সারি দেখিয়া, প্রথমত কালাচাঁদ কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না। কোন্‌টায় কি আছে, কোন্‌টাই বা আগে খাইতে হয়, কোন্‌টাই বা ঝাল, কোন্‌টাই বা অম্বল, কোনটাই বা ডাল, কোন্‌টাই বা তরকারি?—প্রথমে ইহার কিছুই মীমাংসা করিতে সক্ষম হইলেন না! ভাবিলেন, ইহাও কম বিপদ নয়!

চারিদিক অল্প পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিয়া কালাচাঁদ মনে মনে কহিলেন,—'এই যে, এখনও ভাত দেয় নাই দেখ্‌চি-যে!'

তখন তিনি সবিস্ময়ে ভাবিতে লাগিলেন,—"কেন এমন হইল?—অন্ন নাই, কেবল ব্যঞ্জনাদির

সমাবেশ। ঘোঁড়া নাই, কেবল চাবুকের ধূম। চন্দ্র নাই, কেবল নক্ষত্ররাজির প্রস্ফুটন। স্ত্রী নাই, কেবল সুন্দরী শ্যালিকা-কুলের শোভা।”

ঠাকুরদাদা ওদ্দিকে আচমন করিতে বসিয়াছেন। ধর্ম্মভাবে প্রণোদিত হইয়া চক্ষু বুজিয়া মনে মনে কতই তন্ত্রমন্ত্র বলিতেছেন। কখন বা জল লইয়া চারিদিকে ছিটাফোঁটা ছড়াইতেছেন। কখন বা অঙ্গুলি-কোণে অন্ন-ব্যঞ্জনাদি লইয়া ভূমে রাখিতেছেন।

সুরেশ ঠাকুরদাদার আহারের সময় এই সব কার্য্যে বিষম বিরক্ত ছিলেন। ঠাকুরদাদার সহিত একত্র আহার না করার ইহাও একটা প্রধান কারণ ছিল। যে হেতু, আচমন গণ্ডূষাদির পর ঠাকুরদাদা আহার করিতে না বসিলে ত, সুরেশ আহারে বসিতে পারেন না। যেদিন আবার দুই একজন অপরিচিত ব্যক্তি এক সঙ্গে খাইতে বসিত, সেদিন ঠাকুরদাদার আচমন-গণ্ডূষ-কার্য্যে অধিক বিলম্ব ঘটিত।

আজও আচমনে বিলম্ব ঘটিতেছে। কেননা পাশে কালাচাঁদ।

বিলম্ব ঘটায় কালাচাঁদের সুবিধা হইল। তিনি দেখিয়া দেখিয়া, সামগ্রী-পত্র চিনিয়া লইবার অবসর পাইলেন। প্রথম দৃশ্যে তিনি দেখিলেন,—বাটী-রেকাবী'ত একশতের কম কিছুতেই নহে,—কিন্তু উহাতে এতটুকু-এতটুকু করিয়া জিনিস কেন? মুগের ডাল আধ ছটাক, বুটের ডাল আধ ছটাক, কড়ায়ের ডাল আধ ছটাক, মুসুরির ডাল আধ ছটাক,—ডাল'ত চারি রকম!—কিন্তু মালে যে ফাঁক! এর চেয়ে আদা ও হিং দিয়ে কেবল একবাটী কড়ায়ের ডাল দিলে'ত বেশ হইত! কাজ কি ছাই মুগের-ডেলে?—উহা'ত রোগার পত্তি!—আমি কি কাহিল, না রোগ থেকে উঠেচি, না আমার হজমশক্তি কম?—যে, আমাকে অতটুকু মুগের ডাল দিয়েচে!! উটুকু কি?—মাছের ঝোল বুঝি! যাহ্ হউক, উটুকুকে'ত নশ্যি করিলেই হয়! ইনি বুঝি সুক্তানি,—ফুঁদিলে উড়ে যান! ঐটী বুঝি গুড়-অম্বল,—ফোঁটা কাটি-

লেই হয়! ঈস্,—উনি বুঝি খয়রা মাছ ভাজা,—যেন একটী টীক্‌টীকির ছানা। আরে খেলে যা,—একখানা ধূমো ফুলকাটা রেকাবি ক'রে সিকিভরি ওজনের দু-গাছি শাকভাজা কেন?—নিশ্বাসে উড়ে যাবে যে! আর, এসবের ওদিকে সারি-সারি যে সব বাটী সাজান রয়েচে, ওগুলাতেই বা কি আছে? সুমুখে যে সব বাটী রয়েচে, তার দু-চারিটা বুঝিলাম, দশ-বিশটা না হয় না-ই বুঝিলাম,—তুরকারী-ফরকারি মাথামুণ্ডু যা-হোক কিছু একটা হবে!—মোদ্দা, ঐ গুলো কি?—সারি-সারি থাকে-থাকে যে সাজান, ওর ভিতর কি আছে?—বুঝি ক্ষীর-ছানা-ননি হবে,—পায়েস ও আছে, বোধ হচ্চে! ঐটে যদি পায়েস হয়, তাহলে'ত খড়্‌কে ক'রে জিবে ঠেকাতে হবে। আচ্ছা, আমি কি পাখী? ঠোঁটে ঠেকাতেই যে, পায়েসে কুলাবে না!—ছি! কেবল ধাষ্টেম! না, নাতি ব'লে ঠাকুদ্দা তামাসা কোচ্চেন? যেমন আশা করিয়া আসিয়াছিলাম, তেমনি তার প্রতিফল পাইলাম। এই, সবগুলা এক করিয়া

খাইলেও যে, গলা ভিজিবে না! এক কলসী জল চাই,—এ, শিশির কুড়াইয়া কলসী কত পূরাইব?

যাউক। তরকারির জন্য তত এসে-যায় না! ভাত আনিলে, ভাত কিছু বেশী করিয়া চাহিয়া লইয়া খাইব। তরকারির অভাব ভাতে পূর্ণ করিব। ঠাকুরদাদা তরকারিতে যেরূপ সরু কাটিয়াছেন, ভাতেও ত সেইরূপ সরু কাটিতে পারেন। তা কাটেন কাট্‌বেন,—আমি কিন্তু চক্ষুলজ্জা খাইয়া আবার দ্বিগুণ ভাত চাহিয়া লইব। আগে উদরের তৃপ্তি, তারপর চক্ষুলজ্জা।

এদিকে ঠাকুরদাদার আচমন শেষ হইল। আচমনান্তে ঠাকুরদাদা বলিলেন, "কালাচাঁদ! তুমি আমার জন্য খেতে এত দেরী কচ্ছিলে কেন? আমার কি জান,—৺লক্ষ্মী-নারায়ণে সমুদায় বস্তু অর্পণ ক'রে, তবে আমি খেতে পাই! সেই রাধা-বিনোদন, বংশীবদন শ্রীকৃষ্ণকে দিলেই আমার খাওয়া হয়! আহা! রাধিকা-রমণের প্রসাদ,—

অমৃত, অমৃত!!—কেলেসোণা! তবে খেতে ব'স। সুরেশ! তুমিও খাও,—"

কালাচাঁদ সবিস্ময়ে ভাবিতে লাগিলেন,—"ঠাকুরদাদাটা বলে কি?—ভাত কৈ?—যে, খাব! খাই কি?—ভাত নাই, কেবল তরকারি খাইয়া থাকিব নাকি? এ,—যে, মহামুস্কিল বাধালে দেখচি! আচ্ছা দেখিনা,—ঠাকুরদাদাটা আগে কোন্ তরকারিটে খায়!"

কালাচাঁদ দেখিলেন, ঠাকুরদাদা একটা মেটে-রঙের তরকারি হাতে করিয়া ভাঙ্গিতেছেন। ভাঙ্গিয়াই তিনি কালাচাঁদকে বলিলেন, "কেলেসোণা! এই পোলাওয়ে আচ্ছা করিয়া নেবু মাখিয়া খাও! পোলাও বড় গরম জিনিস! দিন-সময় বড় খারাপ পড়েছে।—সুরেশ! তুমি সাবধান!"

এতক্ষণে কালাচাঁদ সব বুঝিলেন। বুঝিলেন, অদ্য ভাত নয়,—পোলাও। বুঝিলেন, এ সব তামাসা নয়, সত্য বিষয়। বুঝিলেন, ইহা ইন্দ্রজাল নয়, প্রকৃতই অন্নব্যঞ্জন। বুঝিলেন, দুই দিন ত

অন্নাহার হয়ই নাই, এ, তৃতীয় দিনও বুঝি অনাহারে থাকিতে হইল।

কালাচাঁদ প্রথমে বস্তুতই পোলাও চিনিতে পারেন নাই,—তাই তখন “ভাত ভাত” করিতেছিলেন! একখানি বৃহৎ থালের উপর প্রকৃতই একমুঠা আন্দাজ পোলাও ছিল। তাহাও অমনি-একটু চূড়-করিয়া নৈবেদ্যের মত বাড়া। কালাচাঁদ মনে করিয়াছিলেন, ইহাও বুঝি কোন এক-রকম তরকারি হইবে! ভাতই হউক, আর পোলাওই হউক,—শুদ্ধ ঐ-কটী যে, কেহ বাড়িয়া একজন যুবা পুরুষের সম্মুখে ধরিবে,—ইহা তিনি কখনও ভাবিতেও পারেন নাই।

যাই হউক,—ঠাকুরদাদার ইঙ্গিত পাইয়া, কালাচাঁদ সেই পোলাও ভাঙ্গিলেন; ভাঙ্গিয়া, ঠাকুরদাদার দেখা-দেখি, গণা দুটী ভাত প্রথম মুখে দিলেন। তারপর, চারিটী। তস্যপর, ছয়টী। অবশেষে আটটীর হিসাবে মুখে উঠিতে লাগিল।

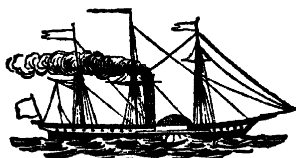
পাঁচ সাতবার ঐরূপ অন্ন মুখে দিয়া, কালাচাঁদ

চিন্তা করিতে লাগিলেন, "এরূপভাবে শুষ্ক হইয়া থাকিবার আবশ্যক কি? আরও পোলাও চাহিয়া লই না কেন? এ বিষয়ের যুক্তি কি?"

কালাচাঁদ পুনরায় চিন্তা করিলেন,—"আবার যদি পোলাও চাই, তাহা হইলে, যতগুলি পোলাও প্রথমবারে দিয়াছে, এবার তাহার অর্দ্ধেকগুলি দিবে। তারপর যদি চাই, না-হয় আবার ততগুলিই দিল। ফের যদি চাই, না-হয় আরও ততগুলি পোলাও দিল। কিন্তু, তা হলেই বা কি হচ্চে? তা'তেই না কোন্ আমার পেট ভর্‌বে? অতকটী করিয়া ষোল-দুগুণে বত্রিশবার দিলেও যে, আমার কিছু হবে না। তবে আর দ্বিতীয়বার পোলাও চাহিয়া ফল কি? চাহিলে জাত যাইবে, পেট ভরিবে না,—অতএব না চাওয়াই স্থির-সিদ্ধান্ত! বরঞ্চ এমত হাত দেখাই যে,—যতটুকু পোলাও দিয়াছে, উহার দশ-আনা ভাগ পাতে রাখি, ছয়-আনা ভাগ মাত্র খাই। ঠাকুরদাদা যদি বলেন, 'কালাচাঁদ! পাতে পোলও পড়ে রইল যে, আর একটু

খাওনা’ আমি উত্তর দিব, ‘ক্ষুধা নাই,—যাহা খাইয়াছি, তাহাতেই উদর পূর্ণ হইয়াছে।’

এই ভাবিয়া কালাচাঁদ তখন হৃষ্টচিত্তে খাইতে আরম্ভ করিলেন।



## দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

এমন সময় ঠাকুরমা একজন পাচিকা-ব্রাহ্মণীর সহিত একটা বড় রুইমাছের মুড়া লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঠাকুরদাদা যখন আচমনে বসেন, ঠাকুরমা তখন রন্ধনশালার দিকে গমন করেন। মাছ বনাইবার সময় ঠাকুরমা আপনা-আপনি একবার বলিয়াছিলেন, এই বড় মুড়াটা কালাচাঁদ খাবে। কাহাকেও লক্ষ্য করিয়া বিশেষ-রূপে এ-কথা তিনি বলেন নাই। যখন পোলাও প্রভৃতি পাত্রে সজ্জিত হয়, সুরেশের মা বলেন, 'এ বড় মুড়া কাহাকেও দিয়া কাজ নাই,—এখন রাখো,—কর্ত্তা যদি বলেন, তবে যাহাকে হউক দেওয়া হইবে।' সুরেশের মা জানিতেন,—'কর্ত্তা নিজে মুড়া খান না, সুরেশের পাতে মুড়া দিলেও তিনি রাগ করেন;—বলেন, রুইমাছের মুড়া বড় তৈলাক্ত; উহা খাইলে হজম হয় না, পেট

ঝাঁপে, আমাশয় হয়। বিশেষ, রুয়ের মুড়ো খাইয়া অমুক ব্যক্তির ওলাউঠা হইয়াছিল।' এতৎকারণ নিবন্ধন বড় মুড়া কাহাকেও প্রথমে প্রদত্ত হয় নাই।

ঠাকুরমা ঘরের ভিতর আসিয়া, কালাচাঁদের পাতে মুড়া না দেখিয়াই, পাক-শালায় দৌড়িয়া ছিলেন। তথা হইতে মুড়া, আরও কয়েক খানা মাছ, এবং ঝোল, ব্রাহ্মণীকে দিয়া লইয়া আসিলেন। আসিয়াই বলিলেন, "বড় মুড়া,—এই কেলেসোণাকে দাও।"

কালাচাঁদ তখন পোলাও ভোজনের মজায় বিভোর!—অন্তরে হাসিয়া ঠাকুরমাকে বলিলেন,—"উঃ, আমার খুব পেট ভরেচে,—আমি আর কিছু খাইতে পারিব না—"

ঠাকুরদাদা এই মুড়া-ঘটিত ব্যাপার অবলোকন করিয়া ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—"কি—ও," "কি—ও"

ঠাকুরমা। বড়মুড়া কেলেসোণা খাবে—

ঠাকুরদাদা। তা, দাও—কিন্তু মুড়া বড়ই গরম-জিনিস! কিহে কালাচাঁদ! খেতে পার্‌বে'ত?

কালাচাঁদ। আজ্ঞে, না। যা খেয়েচি, তাহাতেই ছাতি-সমান হয়ে উঠেচে—

ঠাকুরমা। হেঁরে,—কেলেসোণা! তোর খাওয়া অমন উড়েগেল কেন?—এই ছেলে বয়স,—এখন খাবিনা'ত, খাবি কবে? আমি বল্‌চি,—তুই খা, কোন অসুখ্‌ ক'র্‌বেনা!

পাচিকা, গৃহিণীর ইঙ্গিত-মত, কালাচাঁদের সম্মুখে সমুড়া-সমাছ-সঝোল বাটী রাখিল।

ঠাকুরমা বলিতে লাগিলেন, "কেলেসোণা! আমার দিব্য, তোকে খেতে হবে! তোর নাম ক'রে, বাছা! মুড়া বনান হয়েচে,—ও মুড়া কি আর কাকেও খেতে আছে?"

কালাচাঁদ তখন যেন বিশেষ অনুরোধে পড়িয়াই, বাধ্য হইয়া, না-পারি—না-পারি করিয়া, দু-আঙ্গুলের অগ্রভাগ দ্বারা মুড়ার একটু কোন্‌ ঈষৎ খুলিয়া, তাহারই অর্দ্ধেক-টুকু একবার মুখে দিলেন।

ঠাকুরমা। কেলেসোণা! পোলাওয়ে একটু ঝোল মেখে খা,—এখনও যে অনেক পোলাও রয়েচে,—খেলি কৈ?

কালাচাঁদ। কি বল্‌বো,—ঠাকুমা!—আমি এখন আর খেতে পারি না,—বিশেষ, আজ আবার খিদে নাই।

ঠাকুরদাদা। যা পারো, তাই খেও,—ওঁর (ঠাকুরমার) কথা শুনে যেন বেশী খেওনা—

কালাচাঁদ। আজ্ঞে,—না। তা কি কখন হয়?

ঠাকুরমা। হাঁ—হাঁ—ওঁর (ঠাকুরদাদার) কথা তোর শুন্‌তে হবে না। উনি সব্ জানেন কি না? উনি নিজে কিছু খেতে পারেন না, তাই মনে করেন, বুঝি আর কেহই খেতে পারে না। এই উঠন্ত-বয়সে, বাছা! তুই কি আর একটা গোটা মুড়ো খেতে পারিস্ না?

কালাচাঁদ। ঠাকুমা! আগে আগে আমি খুব খেতে পাত্তাম,—এখন কেমন হয়েচে, অন্ন আর মুখে রোচে না। তবে তুমি বল্‌চো,—আর একটু খাই—

এই বলিয়া কালাচাঁদ মুড়াটী লইয়া নাড়িতে চাড়িতে লাগিলেন। মনে মনে ভাবিলেন,—"হায়! ক্ষুধায় প্রাণ বাহির হইয়া যায়, অথচ এ মুড়া—এমন বৃহৎ, ঘৃতাক্ত, সরস, সুমিষ্ট মুড়া, আমার খাইবার যো নাই! এমন বিড়ম্বনায়, এমন খয়ে-বন্ধনে কখন'ত পড়ি নাই! মহারত্ন করতলগত, অথচ আমি দীন-দরিদ্র! সবই আছে, কিন্তু কিছুই নাই! এ, কি—এ?"

এই ভাবিয়া কালাচাঁদ, মুড়ার গা হইতে আঙ্গুলে করিয়া একটু ঝোল লইয়া, পোলাওয়ে মাখিয়া গুটী-আষ্টেক অন্ন মুখে দিলেন।

ঠাকুরদাদা। সাবধান! কেলেসোণা! সাবধান! একটু হাত-রেখে! জান'ত, এর উপর আবার পায়েস-পিষ্টক আছে।

কালাচাঁদ। আজ্ঞে, হাত খুবই রেখেচি,—। আর, পায়েস-পিষ্টক'ত আমি খাই-ই না। পিটে খেলেই অম্বল হয়,—বুক জ্বালা করে!—

ঠাকুরদাদা। বটে, বটে—ঠিক কথা,—বল কি?

তবে পায়েস-পিষ্টক তোমার ছোঁয়া হবে না—আমারও ওতে অম্বল হয়।

ঠাকুরমা, ঠাকুরদাদার উপর কৃত্রিম কোপ করিয়া বলিলেন,—"তুমি চুপ করে থাক'ত! বাছা খাচ্চে, খাগ্ না?—তুমি অমন টীক্‌টীক্ কর্‌লে, বাছা খেতে পার্‌বে কেন? কেলেসোণা! তুমি ওঁর কথা শুন না,—তুমি যত পার, তত খাও।"

কালাচাঁদ ঠাকুরমাকে "খাইতেছি" বলিয়া, একবার মুড়ায় অঙ্গুলি-চতুষ্টয় বুলাইয়া তাহাই মুখে দিলেন।

লোল রসনা লোলুপ। কিন্তু উপায় নাই। জঠর দাবানল জ্বলিতেছে,—নির্বাণ হইবে কিসে? ক্ষুধায় শরীর ঝিম্ ঝিম্ করিতেছে, মাথা ঘুরিতেছে,—মহৌষধ মিলিবে কোথা? হাই উঠিতেছে, চোখে জল পড়িতেছে, কাণ ভোঁ ভোঁ করিতেছে,—করিব কি?—যাইব বা কোথায়?

কালাচাঁদের কষ্ট হইল। কালাচাঁদ ভাবিতে লাগিলেন, "ঠাকুরমা আজ যেন স্বয়ং অন্নপূর্ণা

অবতীর্ণা হইয়া অন্ন বিলাইতেছেন, তথাচ আমি অনাহারে মরিলাম! এই ধনবান ব্যক্তির গৃহে, চর্ব-চোষ্য-লেহ্য-পেয় সমস্ত সামগ্রীই সমুপস্থিত,—অথচ ক্ষুধায় তৃষ্ণায় আমার প্রাণ যায়-যায় হইতেছে। এমন উদ্যোগে, এমন সংযোগে, এমন অভ্যর্থনায়, এমন আদরে,—অদ্য আমি যদি না অন্ন পাইলাম, তবে কল্য আর কোথায় পাইব?"

কালাচাঁদ আরও গভীর চিন্তা করিতে লাগিলেন, "তবে কি অন্ন আমার অদৃষ্টে নাই? বিধাতা কি অদ্য একান্তই অন্ন মাপান নাই?—তবে কি অদৃষ্টই মূল,—ভগবানই সত্য? দূর! দূর!! অদৃষ্ট আবার কি? কেবল ঘটনাচক্রে পড়িয়াই অদ্য আমি খাইতে পাইলাম না,—এইমাত্র। হুট্ অদৃষ্টকে? আমি মনে করিলে'ত এখনি সব খাইতে পারি! আচ্ছা, আমি আঁচাইয়া উঠিয়া, বাজারে গিয়া একদমে আড়াইসের রসগোল্লা খাইয়া আসিব,—কে আমার গতিরোধ করে, একবার দেখিব?"

এই বলিয়া কালাচাঁদ প্রকৃতিস্থ হইলেন। নখের কোণে একটী সিদ্ধ-পিঠের সূচিকা-বৎ ডগটী কাটিয়া লইলেন। সেইটী দু-আঙ্গুলে টিপিয়া সম্মুখে ধরিয়া, হাসিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন,—"এটী মুখে দিব?—না, নাকে দিব? না মাথায় ঠেকাইব?—না, ফুঁয়ে উড়াইব?" শেষে সেইটীকে মুখের কাছে, ঠোঁটের খুব নিকটে একবার লইয়া গিয়া, তৎক্ষণাৎ হাত ফিরিয়া আনিয়া, আবার অন্য একটা বাটীতে হাত দিলেন। আবার সেই হাত, সেই-অন্য-বাটী হইতে উঠাইয়া লইয়া মুখের কাছে ঠোঁটের নিকট লইয়া গেলেন, আবার সেই হাত তৎক্ষণাৎ ফিরাইয়া আনিয়া অন্য একটা বাটীতে দিলেন। সর্ব্ব রকমে চৌষট্টিটা রেকাবি-বাটী ছিল,—ক্রমশ প্রায় সবগুলিতেই এই রকম করিলেন। শেষে পরিতুষ্ট হইয়া বলিলেন, "ঠাকুরমা, খুব খাইয়াছি, আর খাইতে পারি না—"

ঠাকুরমা। খেলে কৈ বাছা?—অনেক জিনিসত তোমার্ পাতে পড়ে রৈল—

কালাচাঁদ। আজ, যে-খাওয়া খেয়েচি, ঠাকুমা! —কস্মিন্‌কালে এমন খাওয়া খাই নাই—ঠাকুমা, আজকের খাওয়া অনেকদিন মনে থাক্‌বে!—

ঠাকুমা। বাছা, ও একটু-একটু খাওয়া আমার পছন্দ হয় না! বেশ হাম্‌-হাম্‌ ক'রে থাবা-থাবা খাবে, দেখে আমার চক্ষু যুড়াবে। কে জানে, বাছা! এখনকার ও-একরকম কি নূতন খাওয়া উঠেচে, কিছু বল্‌তে পারি না—

কালাচাঁদ। ঠাকুমা! এই তিল তিল করে খেয়েই আমার পেটে তাল হয়েছে;—আমার আর নড়ন-চড়ন নাই, উত্থান-শক্তি নাই। আজ যা হয়েচে, সে আর কি বল্‌বো তোমাকে—"

এই বলিয়া হাস্যবদন কালাচাঁদ পেট ফুলাইয়া ঠাকুরমাকে দেখাইয়া বলিলেন,—"দেখ, ঠাকুমা! পেটে আমার আর একটুও যায়গা নাই।"

ঠাকুমা। পেট ভরিলেই হলো, বাছা!

আহারান্তে উত্থান-কালে ঠাকুরদাদা গম্ভীর মূর্ত্তিতে এক প্রস্তাব করিলেন, "কালাচাঁদ! তুমি

এক কর্ম্ম কর। এখনি একটু নুননেবু এবং হজমীগুলি খাও। আমার ভয়, পাছে গরহজমে অসুখ করে।”

কালাচাঁদ। আমিও তাই বল্‌বো-বল্‌বো মনে ক'রছিলাম। আহার যেরূপ হইয়াছে, তাহাতে অসুখ করাই খুব সম্ভব।

ঠাকুরমা। বালাই!—ষেঠের বাছা, ষষ্ঠীর দাস! অসুখ কেন করিতে গেল?

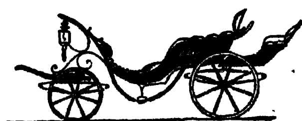
ঠাকরদাদা, ঠাকুরমার কথায় কোন কাণ না দিয়া, কালাচাঁদের উদ্দেশ্যেই বলিলেন, “যদি অসুখ করাই খুব সম্ভব হইয়া থাকে, তবে চাকর'রা পেটে খানিক তেলে-জলে মালিস্‌ ক'র্‌বে কি?”

মালিসের কথায় কালাচাঁদের ভয় হইল। একবার তেলমাখানো-ব্যাপারে কালাচাঁদ অস্থির হইয়াছিলেন। ভাবিলেন, “মালিস যদি মাখানো অপেক্ষা আরও কিছু গুরুতর কাণ্ড হয়, তাহা হইলেত এবার প্রাণটী নিশ্চয়ই বাহির হইয়া যাইবে।” প্রকাশ্যে কালাচাঁদ বলিলেন, “না,—সে-

সব কিছু করিতে হইবে না, নুন-নেবু খাইলেই অসুখ সারিয়া যাইতে পারে।”

ঠাকুরদাদা। আচ্ছা, মালিস এখন থাক্, রোগের অবস্থা বুঝে শেষে যা-হয় করা যাবে।

কালাচাঁদ ভাবিতেছেন, এখন যে, এ ঘর থেকে বা’র হতে পাল্লে বাঁচি!



## ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

আহারাদি সমাপন হইল। উঠিবার সময় কালাচাঁদ আর একটু খাবার জল চাহিলেন।

ঠাকুরদাদা অমনি হাঁ—হাঁ করিয়া উঠিলেন। বলিলেন "অ, কেলেসোণা! খবর্দার! তুমি এখন জল কিছুতেই খেতে পাবেনা। ভোরপূর আহারের পর ঠাণ্ডাজল খাইলে পোলাও হজম হইবে না,—পেট ফুলিয়া দম্‌সম্‌ হইবে।"

ঠাকুরমা, ঠাকুরদাদার উদ্দেশে বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"হেঁ গা! তোমার কেমন কথা? আহা! তেষ্টার জল বাছা একটু খেতে পাবে না!! জল না খেতে পেলে বাছার গলাটী শুকিয়ে যাবে,—কত কষ্ট হবে! কেলেসোণা! তুমি জল খাও, আমি বল্‌চি। তোমার ব্যারাম আছে, আমি আছি।"

এই বলিয়া ঠাকুরমা খানিক জল আনিয়া কালাচাঁদের ঘটিতে ঢালিয়া দিলেন।

ঠাকুরদাদা, ঠাকুরমার উদ্দেশে বলিতে আরম্ভ করিলেন, "তুমিত বুঝনা,—অসুখ হলে ভুগ্‌বে কে?"

ঠাকুরমা। (ঈষৎ ক্রোধভরে) সে ভাবনা তোমার করিতে হইবে না। ভুগিতে হয়, আমি ভুগিব। খাওত, বাছা কেলেসোণা! জল!

কালাচাঁদ মহাবিপদে পড়িলেন। এক দিকে ঠাকুরদাদা, অন্য দিকে ঠাকুরমা। একদিকে শিব, অন্য দিকে শক্তি। উভয়ে সংগ্রাম। মধ্যে কালাচাঁদ। তিনি কোন্ পক্ষ অবলম্বন করিবেন, ভাবিয়া প্রথমত কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না। শেষে স্থির হইল, উভয়েরই মন রাখিতে হইবে। বলিলেন, "না, আমি জল বেশী খাবো না,—জল খাবার তত দরকার নাই! তৃষ্ণা পায় নাই!—এই একটা কুলকুচা করিলেই হইতে পারে!"

এই বলিয়া কালাচাঁদ এক চুমুক মাত্র জল পান করিলেন। ভাবিলেন,—জল চাহিয়া আমি কি ঝক্‌মারিই করিয়াছিলাম। এস্থলে আর যে কথা

কহিবে, সে শ্যালা। এ ন্যাক্ড়ার আগুন যে নিব্লে বাঁচি,—ফুরালে বাঁচি!

সর্ব্বকার্য্য সমাধা হইলে, তিনজনে আঁচাইতে গেলেন। ঠাকুরদাদা চাকরদিগকে ধমক্ দিতেছেন, "ওরে তোরা কি রকম আহম্মক বল্ দেখি?—বেসম্ এনে এখনও রাখ্তে পারিস্ নেই? শীগ্গীর বেসম্ নিয়ে আয়, শীগ্গীর বেসম্ নিয়ে আয়।"

এইরূপে "লে-আও, লে-আও" ধ্বনি পড়িয়া গেল। একজন চাকর একেবারে একসরা বেসম্ লইয়া উপস্থিত হইল। সে, কালাচাঁদের হাতে প্রায় একপোয়া বেসম্ ঢালিয়া দিল। এইবার কালাচাঁদ ফিক্ করিয়া একটু হাসিয়া ফেলিলেন। সে হাসির অর্থ বোধ হয় এইরূপ;—"আহার অপেক্ষা হাত পরিষ্কারের ধূমটা কিছু বেশী দেখিতেছি। হাতে আছে কি—যে, বেসম্ দিয়া মাজ্জিব? ঐ একসরা বেসমের যদি বড়া তৈয়ারি করিত তাহা হইলে বরং খাইয়া বাঁচিতাম। বুড়ো-টা ভুয়া হেঙ্গাম করিতে খুব মজপুত।"

কালাচাঁদ কি করেন,—সেই একপোয়া বেসমেই শুধু শুধু হাত মাজিলেন। আঁচান-পর্ব্ব শেষ হইলে, সুরেশ নীরবে অন্য দিক দিয়া বাটীর বাহির হইয়া গেলেন। সুরেশচন্দ্র গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত একবারও বাঙ্‌নিষ্পত্তি করেন নাই।

কালাচাঁদেরও ইচ্ছা ছিল,—দৌড়িয়া পালাই। কিন্তু তাহা তিনি পারিলেন না,—ঠাকুরদাদার অনুমতি অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। শেষে তিনি স্থির করিলেন,—ঠাকুরদাদার সঙ্গে সঙ্গেই বাহিরে যাইবেন,—আর'ত বেশী বিলম্ব নাই, ঠাকুরদাদার খড়্কে খাওয়া হইলেই সব ফুরায়।

বুড়ার কিন্তু তখনও বুলি ফুরায় নাই। খড়্কে খাইতে-খাইতেই তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন,— "জুয়ান দিয়ে খুব ছোট একটী পান কালাচাঁদের জন্য তৈয়ারি কর;—সুপারি তাতে দিবে না। জুয়ান খুব বেশী দিবে। সুপারিতে পেট কামড়ায়।"

কালাচাঁদ মনে মনে অপরিমেয় হাসি হাসিলেন—"জুয়ানের বরাদ্দ'ত প্রচুর দেখিতেছি। কিন্তু

হজম হইবে কি? অবশিষ্ট আছে কেবল নাড়ী। বাপ্! আমি জুয়ান খাইব না,—শেষে কি নাড়ী হজম হইয়া যাইবে?”

কালাচাঁদ বাহিরে যাইবার জন্য ছট্‌ফট্ করিতেছেন। এক পল সময়, তাঁহার যেন একদণ্ড বোধ হইতেছে। কিন্তু বুড়ার খড়ুকে খাওয়া'ত সহজ নয়!—চলেচে'ত চলেইচে! এই হয়-হয়, আর হয় না।—আবার জাঁকাইয়া বসিয়া, ঠাকুরদাদা নূতন খড়ুকে দিয়া দাঁত খুঁটিতে আরম্ভ করেন। বুড়ার জ্বালায় কালাচাঁদ পাগলপ্রায় হইয়া উঠিলেন।

ঠাকুরমা সোণার ডিবে করিয়া কালাচাঁদের জন্য মণ্ডলঘাটের কর্পূর-কাত পান লইয়া আসিলেন। একটী কালাচাঁদের হাতে দিলেন। চারিটী ডিবাতে রহিল।

ঠাকুরদাদা উঠিয়া পান-ছেঁচা মুখে দিলেন। কালাচাঁদকে বলিলেন, “এস কালাচাঁদ! সদরে গিয়া একটু বিশ্রাম করসে। বিষম রোদ,—খানিক ঘুমাতে পারিলে ভাল হয়।”

ঠাকুরদাদার কথায় কালাচাঁদ হাতে-হাতে স্বর্গ পাইলেন। আহ্লাদে হৃদয় নৃত্য করিয়া উঠিল। কেননা, কালাচাঁদ এইবার অন্দররূপ কারাগার পার হইয়া সুখের সদরে গমন করিবেন।

ঠাকুরমা ঈষৎ তীব্রস্বরে বলিলেন "সে কি কথা? কেলেসোণা বাহিরে শোবে কি? আমি নিজে উহার জন্য যে, তেতলার ঘরে খাটের উপর বিছানা করে রেখেচি,—"

ঠাকুরদাদা। কালাচাঁদ তবে তুমি ঘরেই শুয়ে বিশ্রাম কর।

কালাচাঁদের মাথায় অমনি বজ্রাঘাত হইল। তিনি চারিদিক অন্ধকার দেখিলেন। ঘুরিয়া ভূতলে পড়িবার উপক্রম হইলেন। তবে শরীর নিতান্ত শক্ত বলিয়াই, সে বিষম ঝোঁক সামলাইয়া লইতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

একটু সামলাইয়া কালাচাঁদ ভাঙ্গা ভাঙ্গা সুরে আমৃতা আমৃতা করিয়া বলিলেন, "না,—না,—তা বল্‌চিনা।—আমি আজ বাহিরেই শুই না কেন?"

ঠাকুরমা। (ক্রন্দনের স্বরে) বাছা! তবে তুই বুঝি আমাদিগে পর মনে করিস্! দেখ্ বাছা! এ তোর ঘর! তুই আমার ছেলের ছেলে! চিরদিনের পর আজ তোর মুখটী দেখেচি! তুই শুবি ব'লে, আমি নিজে খাটের উপর বিছানা করে রেখেচি!—আয়্ বাছা! আয়্—তোর ঠাকুমাকে আর কষ্ট দিস্ না!"

এই কথা বলিতে বলিতে ঠাকুরমা, কালাচাঁদের পিঠে হাত দিয়া একটু ধাক্কা দিলেন।

কালাচাঁদ—নাই। মৃত্যুকালে কি এমনি যন্ত্রণা হয়? অন্তরে যেন এককালে সহস্র শূল বিদ্ধ হইতেছে। জিহ্বা যেন টানিয়া কেহ বাহির করিতেছে। গলা শুকাইয়া, ফাটিয়া যেন রক্ত পড়িতেছে। নয়ন-তারায় ছানি পতিত হইয়াছে,—মানুষ আর নজর হয় না। কর্ণ বধির হইয়াছে। মুখ দিয়া যেন সরক্ত ফেন নির্গত হইবার উপক্রম হইতেছে। দৃষ্টিহীন চক্ষু কপালে উঠিয়াছে। প্রকৃতই কালাচাঁদের—মনে হইতেছে, আজ বুঝি

মরিলাম! বুঝি অনন্ত সাগরের অতল জলে ডুবিলাম!

তীক্ষ্ণধার তরবারির দ্বারা কেহ যদি কালাচাঁদের দক্ষিণ হস্তটা কাটিয়া লইয়া যাইত, তথাচ কালাচাঁদ এত মর্ম্মযন্ত্রণা পাইতেন না। কিন্তু দিবসে, অন্দরে, ত্রিতলে, খাটে তাঁহাকে শুইতে হইবে, মহিলাকুল-মধ্যে তাঁহাকে একাকী দিন কাটাইতে হইবে,—ক্ষুধা-পিপাসা উপেক্ষা করিয়া মুখটী বুজিয়া পড়িয়া-পড়িয়া কড়িকাট গণিতে হইবে,—এ যন্ত্রণা কালা-চাঁদের পক্ষে একান্তই অসহ্য।

যিনি বনবিহঙ্গের ন্যায় সদা স্বেচ্ছা-ভ্রমণশীল, অন্দর তাঁহার পক্ষে যম-কারাগার।



## চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

বাল্যে, কৈশোরে যাহাই থাকুন, কালাচাঁদের পক্ষে একালে, স্ত্রীলোক উপেক্ষার জিনিস বা সম্মানের সামগ্রী হইয়াছিল। যুবতী রমণীর প্রতি তিনি মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিতেন না। দৃষ্টি দূরে যাউক, কোন সোহাগিনী সুন্দরী তাঁহার কাছ-ঘেঁসিয়া গেলে, তিনি আস্তে-ব্যস্তে বিব্রত হইয়া পথ ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইতেন। যেন একটু বিরক্ত হইতেন। ভদ্র কুল-মহিলাগণের উপর তিনি অধিকতর সম্মান-ভক্তি দেখাইতেন। পতিতপাবনের গৃহে অবস্থানকালে তিনি হুগলীর রাসমণির ঘাটে প্রত্যহ গঙ্গা-স্নান করিতেন। পাড়ার দুরন্ত বালকগণ স্নানার্থ-গমনশীলা কুলকামিনীর প্রতি কখন কখন তামাসা-ইঙ্গিত করিত। এসব দেখিয়া-শুনিয়া কালাচাঁদ বড় চটিয়া উঠিলেন। একদিন তাঁহার সাক্ষাতেই একটা বখা-বালক, একটী পঞ্চ-

দশ-বর্ষীয়া অবগুণ্ঠনবতী বধূর পানে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, "তোমার চন্দ্রহারে চাবির জিজির কৈগো প্রিয়ে!" বধূ লজ্জায় জড়সড় হইয়া একবারে যেন গুটাইয়া গেল। কালাচাঁদ ক্রোধে কম্পিত হইয়া সেই বুড়া-বালককে বলিলেন, "তোমার'ত বড় বদ্-স্বভাব দেখ্‌চি,—পথে ঘাটে ভদ্রলোকের মেয়েকে ঠাট্টা করা উচিত কি? তোমারই স্ত্রীকে কেউ যদি এই রকম ঠাট্টা করে, তোমার মন তখন কেমন হয়, বল দেখি?"

বালকটীও কমপাত্র নন। তিনি রোখ্ করিয়া উত্তর দিলেন, "তুই কে? তুই আমাকে বল্‌বার কে?"

বালককে আর অধিক বাক্যব্যয় করিতে হইল না। কালাচাঁদ তৎক্ষণাৎ অমনি তাহার গালে এক দারুণ চপটাঘাত করিলেন। বালক ঘুরিয়া পড়িবার যো হইল। কালাচাঁদ তাহার কাণ ধরিয়া বলিলেন, "ফের যদি তুমি স্ত্রীলোককে এরূপ ঠাট্টা তামাসা কর, তাহা হইলে, এই দেওয়ালে নাক্ ঘসাড়ে

মুখ দিয়ে রক্ত বা'র ক'রে দিব।" বালক বা অর্দ্ধ-যুবক এইরূপে উত্তম-মধ্যম পুরস্কার পাইয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে চলিয়া গেল।

কালাচাঁদ তখন বধূর শ্বাশুড়ীকে বলিলেন, "মা, তুমি বউ লইয়া ঘরে যাও,—কোন ভয় নাই।"

তাঁহারা উভয়ে হদ্দ দু-রশিপথ গিয়াছেন, এমন সময় চারি পাঁচটা ধেড়ে-বালক লাঠী লইয়া কালাচাঁদকে মারিতে আসিল। যে বালকটী মার খাইয়াছিল, সে পশ্চাৎ হইতে আঙ্গুল বাড়াইয়া কালাচাঁদকে দেখাইয়া দিল, 'ঐ লোকটা আমায় মেরেচে।' কালাচাঁদ কোনও বাক্য ব্যয় না করিয়া, শীঘ্রহস্তে একজনের হাত হইতে লাঠী কাড়িয়া লইয়া, প্রত্যেক বালকের পশ্চাতে, এক-এক লাঠী বসাইয়া দিলেন। বালকগণ বেগতিক বুঝিয়া, রণে ভঙ্গ দিয়া, উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া পলাইল।

রাসমণির ঘাটে তাঁহাকে আরও একবার এইরূপ লাঠী ধরিতে হইয়াছিল। সে যাহাই হউক, কুল-কামিনীর প্রতি তাঁহার কিছু ভক্তি অধিক দেখা

যাইত। তিনি বারবিলাসিনীগণকে নিতান্ত উপেক্ষা করিতেন। ছোট ছোট মেয়েকে আদর করিতে বড় ভাল বাসিতেন।

কালাচাঁদের আর এক রোগ ছিল,—ইদানীং স্ত্রীলোকের সহিত কথা কহিতে, বা স্ত্রী-মণ্ডলীতে বসিতে সাধারণত বড় বিরক্ত বোধ করিতেন। এইজন্য বন্ধু পতিতপাবন কালাচাঁদের এক নাম দিয়াছিল,—"হুড়কো।"

সেই কালাচাঁদ আজ অন্দরে মেয়ে-দল-মাঝে কেমন করিয়া তিষ্ঠিবেন! কাহারও মল ঝম্-ঝম্ করিবে, কেহ হয়'ত ফিক্ করিয়া হাসিয়া উঠিবে, কেহ হয়'ত দুটা রসের কথা কহিবে,—এ সব কালাচাঁদের সহ্য হইবে না। এসব কাণ্ডে কালাচাঁদের গাত্রে যেন বিষম সুড়সুড়ি লাগে। বিশেষ, খাটে শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িলে, তাঁহার নাক ডাকিবে। সে ডাক শুনিয়া মেয়েরা কতই না তামাসা-ইঙ্গিত করিবে!! আরও এক বিশেষ কথা,—কালাচাঁদ খাটে শুইয়া আছেন,—এমন সময় জানেলার

ফাঁক দিয়া কোন কামিনী যদি তাঁহাকে লুকাইয়া উঁকি-মারিয়া দেখিয়া ফেলেন, তাহা হইলেইত মৃত্যু! একেবারে আধ্যাত্মিক মৃত্যু! বৈদ্যুতিক মৃত্যুতে বরং সময় লাগে, কিন্তু এ মৃত্যু ঘটিতে মোটেই সময় লাগে না।

মার, ধর, কাট,—কালাচাঁদ কিছুতেই অন্দরে শুইতে সক্ষম হইবেন না। লক্ষ টাকা নগদ গণিয়া দাও,—কালাচাঁদ বলিবেন, "মা লক্ষ্মী মাথায় থাকুন,—টাকায় আমার কাজ নাই,—আমি অন্দরে শুইতে পারিব না।"

আজ লইয়া প্রায় তিন দিন কালাচাঁদ একরূপ অনাহারেই আছেন। অন্ন বিনা দেহ দুর্ব্বল। কালাচাঁদ ইতিপূর্ব্বে আশা করিয়াছিলেন, সদর বাটীতে পৌঁছিয়া, কোন এক ছল করিয়া, ঠাকুর-দাদার অনুমতি লইয়া, বাজারে গিয়া আড়াইসের রসগোল্লা খাইয়া আসিবেন। কিন্তু সে আশাও বুঝি নির্ম্মূল হয়! আশা নির্ম্মূল হউক, তত ক্ষতি নাই, কিন্তু না খাইয়া ক দিন বাঁচিব?

কালাচাঁদ ভাবিতেছেন, এখনি কেহ আসিয়া আমাকে যদি খুন করিয়া ফেলে, তাহা হইলে, আমি এ যাত্রা বাঁচিয়া যাই। খুন কবিবার লোক যদি কেহ না থাকে, তবে কেহ অনুগ্রহ কবিয়া অন্ততঃ একটু বিষ দান করুন, কালাচাঁদ তাহাই আজ পূর্ণ আহলাদে পবিতৃপ্ত হইয়া ভোজন করেন।



পাইয়া, রামঠাকুর তাঁহাকে আগবাড়াইয়া আনিতে পথে দৌড়িয়া যান। পাল্কী হইতে নামিয়া কর্ত্তা কিন্তু তাঁহার সহিত কোন কথা কহিলেন না। রামঠাকুর কর্ত্তার পশ্চাৎ-পশ্চাৎ বৈঠকখানার উপর আসিলেন। কাছারীর কাপড় ছাড়িয়া কর্ত্তা অন্দরে জল খাইতে গেলেন। ফিরিয়া আসিয়া, তাকিয়া ঠেস্ দিয়া বসিলে, ব্রাহ্মণ-রামঠাকুর, কায়স্থ-কর্ত্তার ঠিক পদপ্রান্তে গিয়া উপবেশন করিলেন। কর্ত্তা তথাচ কোন কথা কহিলেন না। তখন রাম-ঠাকুরের পেট ফুলিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে কর্ত্তা ভাঙ্গা-ভাঙ্গা-সুরে বলি-লেন, "ঠাকুর-মোশাই! আমার কপালে হাত দিয়া দেখ'ত, গরম হয়েচে কি না?"

রামঠাকুর কপালে হাত না দিতে-দিতেই বলিয়া উঠিলেন, "উঃ, খুব গরম দেখ্‌চি যে! ভয়ঙ্কর গরম!"

বাস্তবিক তখন কর্ত্তার মাথা বা কপাল তাদৃশ গরম ছিল না। বৃদ্ধবয়সে, সন্ধ্যাকালে, দুর্ভাবনার

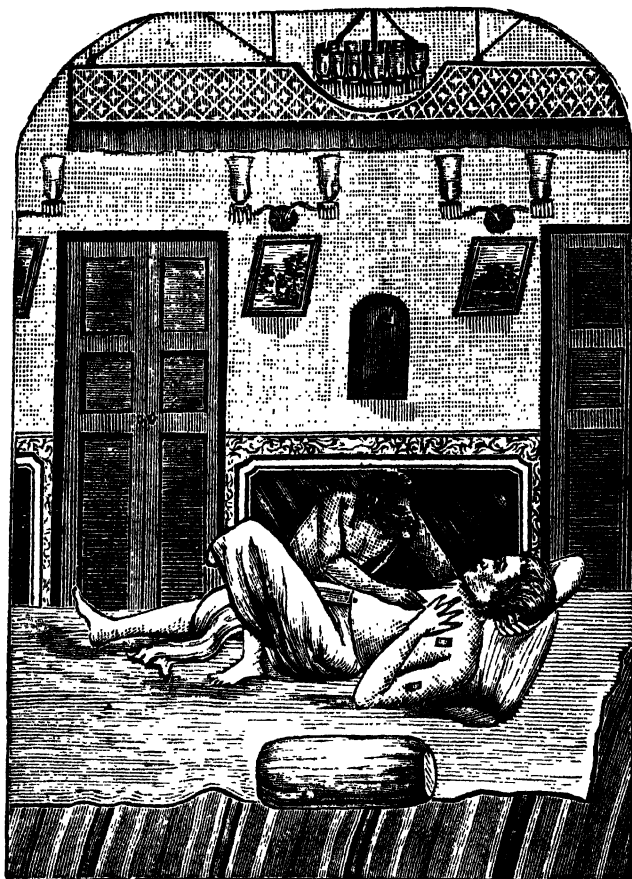
সময় যেরূপ স্বাভাবিক একটু ঈষৎ গরম হয়, সেইরূপই হইয়াছিল। তবে রামঠাকুর এরূপ অত্যধিক গরমের কথা বলিলেন কেন?

রামঠাকুর কর্ত্তার হৃদয় বুঝিতেন। কর্ত্তার অভিপ্রায় ছিল, তাঁহার কপালটাকে এ-সময় সকলে গরম বলুক। কাজেই রামঠাকুর, কপাল গরম না হইলেও, উহাকে গরম বলা একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করেন। বিশেষ, কর্ত্তা যদি বলেন, আমার অমুক অসুখ করিয়াছে;—তদুত্তরে কেহ যদি প্রতিবাদ করিয়া বলেন, "না, ও কিছু নয়,—আপনি বেশ আছেন";—তাঁহা হইলে কর্ত্তা প্রকৃতই দুঃখিত হন, কখন বা রাগও করিয়া থাকেন।

কপালটী ভয়ঙ্কর গরম সাব্যস্থ হইলে, কর্ত্তা আবার বলিলেন, "আমার বুকটা খুব জ্বালা করিতেছে, বোধ হয় আজ ভারি অম্বল হয়েছে।"

রামঠাকুর অমনি কর্ত্তার বুকে হাত বুলাইয়া বলিলেন, "হাঁ, বটে, বুকটা খুবই জ্বালা করিতেছে;—এত অম্বল হ'লো কিসে?"

ঠাকুরদাদার অম্বলের অসুখ।



কর্ত্তা। আজ দ্বিপ্রহরে গুরুপাক জিনিষ ভোজন হয়েছে,—

রামঠাকুর। আপনি খেলেন কেন? আপনি গিন্নীর কথা শুনেন কেন? আহা! গৃহিণী নন্ ত—যেন সাক্ষাৎ ভগবতী! গৃহিণীর গুণেই সংসার! আমি বাড়ীর ভিতর খেতে ব'স্‌লে, গিন্নী বামুনকে ব'লে দেন, "ঠাকুরের পাতে আরও সন্দেস দে, আরও সন্দেস দে!" আমি খেতে পার্‌বো না, তবু গিন্নী ছাড়্‌বেন না। আহা! এমনি তাঁর লোকের প্রতি স্নেহ-যত্ন।

কর্ত্তা এ-সব কথার কোন উত্তর না দিয়া বলিলেন, "দেখ, ঠাকুর-মোশাই! আজ বড় অসুখ হয়েছে—"

রামঠাকুর। (বিস্ময়ে) বলেন কি? বলেন কি? ছিরাম কবিরাজকে ডেকে আন্‌ব নাকি? চাদর লইব নাকি? অসুখইত বটে,—তাই'ত!—ঘোরতর অসুখ!

কর্ত্তা। না, এখন আর কবিরাজ ডাকিতে

হইবে না। একটু ঘুমাইলেই সারিতে পারে। একবার ঘুমাইবার চেষ্টা দেখি,—

এ কথা শুনিয়া রামঠাকুর বড়ই বিষণ্ণ হইলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, বড়কর্ত্তার অসুখ হইয়াছে,—দেওয়ানজীর অম্বলে প্রাণ যায়-যায় হইয়াছে;—এই ব্যাপার লইয়া অন্তত রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত তিনি একটা হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি করিবেন। কবিরাজ আসিলে, তাঁহার নিকট হইতে বল-বৃদ্ধির একটী বটিকা লইয়া তিনি নিজে খাইবেন। অন্দরের দ্বারে একবার দৌড়িয়া গিয়া গিন্নীকে উদ্দেশ করিয়া সংবাদ দিবেন, "কর্ত্তার অসুখ একটু কমিয়াছে, কবিরাজ আসিয়া ঔষধ দিয়াছেন, কোন চিন্তা নাই।"—কিন্তু ইহার মধ্যে কোন কামনাই পূর্ণ হইল না।

দুঃখের উপর দুঃখ। কর্ত্তা যদি ঘুমাইয়া পড়েন, তাহা হইলে ত ভোলা-ময়রার কথা, মনোমোহিনী ময়রাণীর কাহিনী, দোকানে চাবি ভাঙ্গা, সন্দেস খাওয়া—এ-সব কথা ত কিছুই

উত্থাপন করা হইল না! না জানি, কি অশুভ-ক্ষণেই অদ্য যাত্রা করিয়াছিলাম। বারবেলায় কি বাহির হইয়াছিলাম?—

রবৌ বর্জ্জ্যং চতুঃপঞ্চ
সোমে সপ্তদ্বয়ং তথা।

তাহাও নহে! বোধ হয় যাত্রাকালে কেহ হাঁচিয়া থাকিবে! অথবা পথে ধোবা দেখিয়া থাকিব!

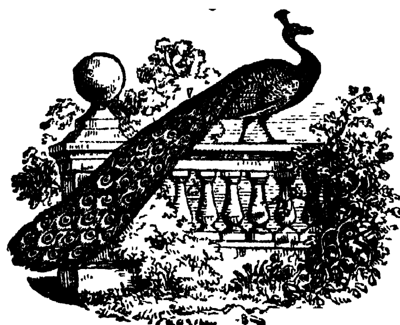
রামঠাকুর এইরূপ চিন্তা করিতেছেন,—এমন সময় কর্ত্তা আবার বলিলেন, "ঠাকুর-মোশাই! তুমি যাবার সময় চাকরদিগে ব'লে যাওত, আমার কাছে যেন কোন লোকজন আজ না আসে। কেহ জিজ্ঞাসিলে চাকররা যেন বলে 'কর্ত্তার অম্বলে বুকজ্বালা ক'রে অসুখ হয়েছে, তাই তিনি ঘুমিয়েছেন।'"

রামঠাকুর। হঠাৎ এমন অসুখটা কিসে হলো?

কর্ত্তা, সে কথার কোন উত্তর না দিয়া বলিলেন, "যদি কালাচাঁদ আসে, তবে তাকে না হয় আমার কাছে পাঠিয়ে দিতে ব'লো।"

রামঠাকুর ভাবিতে লাগিলেন, "তাই'ত!—গতিক কি?—আমাকেও উঠিয়ে দিতেছেন!—আস্‌বে কি না সেই কালাচাঁদটা?—সেটার সঙ্গে এত ভাব কিসে হ'লো?—"

কর্ত্তাকে কোন বিষয়ে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবার তাদৃশ ক্ষমতা রামঠাকুরের নাই। কাজেই তিনি কালাচাঁদ-সম্বন্ধিনী কোন কথা কর্ত্তাকে জিজ্ঞাসা করিতে সক্ষম হইলেন না।



## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

রামঠাকুর কি করেন,—উঠিয়া যাইতেই বাধ্য হইলেন। তথাচ তিনি উঠিতে একটু বিলম্ব করিতে লাগিলেন।—ইচ্ছা,—যদি এইটুকু সময়ের মধ্যে কর্ত্তা তাঁহার সহিত আরও দুই একটী কথা কহেন। কর্ত্তা কিন্তু নীরবই হইয়া রহিলেন,—আর একটীও বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিলেন না। তখন অগত্যা রামঠাকুর উঠিলেন,—দাঁড়াইলেন। এমনি ধীরে ধীরে আলস্যের সহিত দাঁড়াইলেন, যেন, দাঁড়াইতেও দুই মিনিট সময় লাগিল। তার পর, পদবিক্ষেপ। এই প্রথম পদক্ষেপেও বুঝি এক মিনিট সময় অতিবাহিত হইল। অনন্তর, মুখ ফিরাইয়া পশ্চাৎদিক্ সন্দর্শন। "শুন, ঠাকুর-মোশাই, শুন, বলি"—কর্ত্তা তাঁহাকে এই বলিয়া ডাকিবার উপক্রম করিতেছেন কি না, বুঝি ইহা দেখাই তাঁহার পশ্চাতে মুখ ফিরাইবার উদ্দেশ্য।

তদনন্তর এককালে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ পদ-বিক্ষেপ। অতঃপর উঁকিঝুঁকি মারিয়া চারিদিকে দৃষ্টিপাত। দেখিতে দেখিতে রামঠাকুর উঠানে গিয়া পড়িলেন।

রামঠাকুর অবশেষে দেখিতে পাইলেন, কাঁধে চাদর ফেলিয়া দ্রুতপদে একটা লোক আসিতেছে।

রামঠাকুরকে কোন কথা কহিতে হইল না; সে লোকটা ঈষৎ দৌড়িয়া আসিয়া দড়াম্ করিয়া তাঁহার পদপ্রান্তে পড়িয়া, এই ভাবে কাতর কণ্ঠে, বলিল, "আপনারা আমায় রক্ষা করুন, আমি ধনে প্রাণে মরিলাম।"

রামঠাকুর। কেহে! ভোলানাথ নাকি? হাঁ—হাঁ, সব শুনেচি! একটু আস্তে কথা কও। কর্ত্তার বড় অম্বলের অসুখ করিয়াছে। বোধ হয়, তাঁর একটু নিদ্রা এসে থাক্‌বে।

ভোলানাথ। আজ্ঞে, আমি কত্তা-মোশায়েরই শরণ নিতে এসেচি। তিনিই দেশের রাজা,—

রামঠাকুরের চরণে ভোলানাথের পতন।



আমরা তাঁর সন্তান তুল্যি। তিনি না রাখলে, আমাদিগকে আর কে রাখ্‌বে?

রামঠাকুর। ঠিক,—ঠিক!

ভোলানাথ। আম্মি গরীব মানুষ; কোথা কি পাবো? কর্ত্তা মোশায়ের জন্যে এই আটটী টাকা নজর এনেচি। এই ক্ষুদ-কুঁড়ো কটী পান খেতে নিয়ে আমাকে রক্ষা কত্তে হবে।

এই বলিয়া ভোলানাথ ট্যাক্ হইতে টাকা খুলিয়া লইয়া হাতে রাখিল।

কর্ত্তা এতক্ষণ নয়নদ্বয় মুদ্রিত করিয়া নীরবে নিদ্রিত ছিলেন। টাকার শব্দ শুনিয়া জাগিলেন। চক্ষু চাহিয়া বলিলেন, "ভোলা নাকিরে!"

ভোলানাথ। আজ্ঞে, কর্ত্তা-মোশাই, আমাকে এ-যাত্রা রক্ষা কত্তে হবে।

এই বলিয়া ভোলানাথ কর্ত্তার নিকট পৌছিল।

কর্ত্তা। তোর কি হয়েচে?

ভোলানাথ। সে কথা আর কি বল্‌বো?

এই বলিয়া ভোলানাথের ক্রন্দন।

কর্ত্তা। বল্‌না কি হয়েচে? কেবল কাঁদ্‌লে কি হবে?

ভোলানাথ। আজ্ঞে, কাল রাত্রে কখন্‌ আমার দোকানে চুরি হয়েচে, তার আমি বাষ্প কিছুই জানি না। একখুলি রসগোল্লা চোরে খেয়েছে, একহাঁড়ী ক্ষীর খেয়েচে, আর বাক্সভেঙ্গে নগদ ৯৲ টাকা নিয়েচে।

কর্ত্তা। তোর বাক্সে কত টাকা ছিল?

ভোলানাথ। একষট্টি টাকা সাড়ে বার আনা ছিল।

কর্ত্তা। এ কি রকম কথা হ'লো? ৬১৸১০ টাকার মধ্যে চোর লইল ৯৲,—বাকী টাকা রাখিয়া গেল কেন?

ভোলানাথ। এই জন্যই ত আজ মারের চোটে আমার পিঠের চাম্‌ড়া উঠে গেছে! চোরে ৯৲ টাকা নিলে,—১০৲ টাকা নিলে না, কি ১৫৲ টাকা নিলে না, কি সব টাকাই নিলে না,—তার আমি কি কর্‌বো? চোরের মনের মৎলব আমি

কি ক'রে ব'ল্‌বো? কর্ত্তা-মোশাই! আপনি তো দেশের রাজা,—আপনিই এর্ বিচার করুন।

কর্ত্তা। আচ্ছা, তোর্ মার্ খেয়ে পিঠের চাম্‌ড়া গেল কেন?—তোকে মেলে কে?

ভোলানাথ। আজ্ঞে, এই, দারোগা-মোশাই মেলেন। তিনি ব'ল্লেন,—বল্ এখনি,—কে চুরি করেচে? না ব'ল্লে, এখনি তোকে কড়ীকাঠে টাঙ্গিয়ে তোর্ এক হাত জিব বা'র্ ক'রে ফেল্‌বো।

কর্ত্তা। তার পর কি হ'লো?

ভোলানাথ। আজ্ঞে, আমি তাঁকে বুঝিয়ে ব'ল্লাম,—'চোর কে,—তাই যদি আমি জান্‌বো, তবে আমি থানায় খবর দিতে আস্‌বো কেন? জান্‌লে,—একবারে চোরের টুঁটী ধরে এনে, তাকে জেলখানায় সাঁদ ক'রে দিতাম।' এই কথা শুনে, দারোগা-মোশাই আরও রাগ ক'রে বল্লেন, "ভোলা, তুই বেটা পাকা বদমাইস্,—সোজা কথায় বল্‌বি ত বল্, নইলে তোর্ পিঠে ২৫ জুতা লাগাবো।" এই কথা শুনে আমি ভয়ে কাঁপ্‌তে লাগ্‌লাম,—

যোড়হাতে দারোগা-মোশাইকে ব'ল্লাম, 'দোহাই খোদাবন্দ! আমায় রক্ষা করুন,—আমি এর ভাল মন্দ কিছুই জানি না।'

কর্ত্তা। তার পর—

ভোলানাথ। দারোগা-মোশাই আরও রাগ ক'রে খুব চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে বল্‌তে লাগ্‌লেন, "ভোলা! তুই ব্যাটা, ছেলে-ভুলুস্ কা'কে? নৌকা-ভাড়া ক'রে চোর এসে বাক্স-ভেঙ্গে ৯৲ টাকা নিয়ে গেল, আর ৫২৮/১০ টাকা তো-ব্যাটার জন্যে রেখে গেল—নয়?—ভোলা! তুই ন্যাকা বুঝুস্ কা'কে? নিশ্চয় তুই নিজে চুরি করেচিস্—নয়,—চোর তোর ঘরেই আছে?—চোরে চুরি কত্তে এলে, পাহারাওয়ালাদের কাছ থেকে সে কি আর ফিরে যেতে পাত্তো? এটা চুরি নয়,—যেন একটা রঙ-তামাসা পড়ে গেছে,—মার্ শালাকে!"

ভোলানাথ এইবার আওয়াজ একটু গম্ভীর করিল। ধীর-স্বরে সাধুভাষায় সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল,—"দেওয়ানজী-মোশাই! আপনি

ধর্ম্মাবতার। ঐ উপরে ভগবান্, নীচে আপনি। আপনার কাছে আমি মিথ্যে কথা বল্‌বো না। দারোগা-মোশাই, একজন চৌকীদার দিয়ে, জুতো মেরে আমার পিঠ ছিড়ে দিয়েচেন! পিঠ ফেটে রক্ত পড়্‌তে লাগ্‌লো। তখন আমাকে রোদে বসিয়ে রাখ্‌লেন। আমি কি করি,—বেলা যখন তিতীয় পহর, তখন পাঁচটী টাকা দারোগা-মোশাইকে পান-খেতে দিয়ে তবে বাড়ী আস্‌তে পাই। দারোগা-মোশাই ব'লে দিয়েচেন, 'চোরের সন্ধান তোকে ক'রে দিতেই হবে!—যদি আজ একান্ত চোর না পা'স্, তবে কাল তোকে চোরকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আস্‌তেই হবে!' এ বিপদে আর কার কাছে যাবো?—তাই আপনার কাছে এসেচি,—আপনি ছিমধোসূদন,—আমাকে রক্ষা করুন।"

এই বলিয়া ভোলানাথ কর্ত্তার পদপ্রান্তে তাহার মস্তক ন্যস্ত করিল। কর্ত্তা বলিলেন, "ভোলা! ওঠ্, ওঠ—ভয় কি?"

ভোলানাথ আটটী টাকা কর্ত্তার বিছানায় রাখিয়া দিল।

কর্ত্তা বলিলেন, "ও—কি—ও ?—"

ভোলানাথ। আজ্ঞে, এই পান-খেতে যৎকিঞ্চিৎ নিয়ে এসেচি—

কর্ত্তা। টাকা তুই ফিরে নিয়ে যা,—টাকায় আমার কাজ কি ? হেঁরে ভোলা ! তোকে কি আর আমায় টাকা দিতে হয় ?—

ভোলানাথ। (যোড়-হাতে) আজ্ঞে, আপোনার ছিচরণ মনে করে এই ক্ষুদ-কুঁড়ো-কটী এনেচি,—এ আপনাকে নিতেই হবে—

কর্ত্তা। ওরে ভোলা ! তুই আগে খালাস হ',—তারপর আমাকে না হয়,—দুসের সন্দেস দিস্,—টাকা এখন ফিরে নিয়ে যা—

ভোলানাথ। আজ্ঞে, হুজুর ! ছোট ধামি ক'রে আজ আড়াইসের সন্দেস আপনার জন্যে আন্‌ছিলেম,—বাঁ-কাঁধে ধামিটী বসানো ছিল, সন্ধ্যে তখন হয়ে গেচে,—ঠিক বারোন্দোয়ারির কাছে,

একটা লোক পেছুপেছু এসে ধামিটী তুলে নিয়েই দৌড় মার্‌লে! আমার মুখ দিয়ে আর কোন কথা বেরুল না,—আমি অম্‌নি 'থ' হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলেম্।

কর্ত্তা। বলিস্ কিরে? সত্য না কি?—

ভোলানাথ। দেওয়ানজী-মোশাই! এ চূণের ঘরে আমি মিথ্যে কথা বল্‌বো না,—আমি লজ্জায় ও ভয়ে এতক্ষণ এ কথা বলি নাই। দারোগা-মোশাই যদি শোনেন, তা'হলে বোল্‌বেন,—তুই এ চোরটাকেও ধ'রে নিয়ে আয়্।

কর্ত্তা। সন্দেসের ধামি তুলে নেবার পর, তুই কি কোন কথা কইলি না?—

ভোলানাথ। আজ্ঞে, একটু পরে, আমি চেঁচিয়ে উঠ্‌লেম,—'চোর! চোর! ঐ সন্দেস নিয়ে যায়, —সন্দেস নিয়ে যায়।' সে চোরটা, ঠিক যেন যমদূতের মত। হি-হি ক'রে একটা বিতিকিচ্ছি হেসে, বাঘের মত লাফ দিতে দিতে, পাশের গলির ভিতর ঢুকে গেল।

কর্ত্তা। আশ্চর্য্য কাণ্ড বটে। সন্ধ্যাবেলা সদর-রাস্তায় ডাকাতি!! লোকের রাস্তা-চলা ভার হলো দেখ্‌চি।

ভোলানাথ। লোকের আর কি হচ্চে? আমারই উপর শনির দিষ্টি পড়েচে,—কাল রাত্রে আমারই ঘরে চুরি হলো, আজ রাত্রে আমার হাতথেকে সন্দেসের ধামি তুলে নিয়ে গেল। এই দেখুন্‌না, দেওয়ানজী-মোশাই!—হুগলী সহরের মধ্যে আর কার কি হয়েচে?

রামঠাকুর এতক্ষণ নীরব ছিলেন। তিনি পুলকে পূর্ণ হইয়া, একান্তমনে, এই গুরুগল্প শুনিতেছিলেন। কিন্তু তিনি আর থাকিতে পারিলেন না,—বলিয়া উঠিলেন, আচ্ছা, কর্ত্তা-মোশাই! একটা মজা দেখেচেন,—সন্দেসই কেবল চুরি হচ্চে!! টাকাকড়ি গেল,—সোণা-দানা গেল,—চুরি হচ্চে কেবল ক্ষীর, সন্দেস, আর রসগোল্লা! যেন রঙ্গরসের তরঙ্গ-বয়ে চলেচে। এটা চুরি নয়,—ঠিক যেন শালা-ভগিনীপতির তামাসা আরম্ভ

হয়েচে!—ভোলানাথ! তুমি ঠিক্ ব'লো, এর ভিতর গুপ্ত রহস্য আছে কি না? কর্ত্তার কাছে সে সব কথা বল্‌তে দোষ নাই!—আর এখানেই বা অন্য কে আছে?

এইরূপ কথা কহিতে পাইয়া, রামঠাকুরের অন্তরে আর আনন্দ-রস ধরে না,—যেন উপ্‌চিয়া উঠিবার উপক্রম হইল। যিনি পলকার্দ্ধ-কালের জন্য বসিবার তিলার্দ্ধ মাত্রও স্থান প্রাপ্ত হন নাই, এক্ষণে তিনিই এককাঠা-প্রমাণ স্থান-জুড়িয়া বসিয়া অনন্ত সময় প্রাপ্ত হইলেন;—তাঁহার আনন্দ হইবে না ত কি? যিনি হৃত-সর্ব্বস্ব, অবমানিত হইয়া বিতাড়িত হইতেছিলেন, তিনিই এখন রাজ-রাজেশ্বর হইয়া সর্ব্বসুখভোগ করিতে লাগিলেন;—তাঁহার আনন্দ হইবে না ত কি?

ভোলানাথ, রামঠাকুরের কথায় যোড়-হাতে উত্তর দিল,—"আজ্ঞে, আমি গরীব-মানুষ;—আমার শালাও নাই, ভগ্‌গিন-পো'তও নাই! ঠাকুর-মোশাই! আমি কিছুই জানি না!—

আমি আপ্‌নাদের শরণ নিয়েচি, আমাকে রক্ষা করুন!”

রামঠাকুর। তুমি আমার কাছে মিথ্যা ব’লো না!—আমি সব জানি। তার আর লজ্জা কি?—খুলে বল,—কোন ভয় নেই!

ভোলানাথ। (ম্লানমুখে) ঠাকুর-মোশাই! আমি সত্যিই বল্‌চি—আমি ভাল মন্দ কিছুই জানি না।—আমি বড় গরীব!

ভোলানাথের চক্ষু দিয়া টস্‌-টস্‌ জল পড়িতে লাগিল। ভোলানাথের ভাবনা হইল, এ-যাত্রা বুঝি আর উদ্ধার নাই! আমি বুঝি ধনে প্রাণে মজিলাম! ও-বেলা দারোগা আমায় আধ-মারা করেচেন! এ-বেলা, রামঠাকুরও ঠিক সেই সুরে কথা আরম্ভ করেচেন। এখানেও কি আমাকে শেষে মারখেতে হবে?

ব্যাপার কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারিয়া, কর্ত্তা বলিলেন, “ভোলা! তুই আজ ঘর যা! তোর কোন ভয় নাই। আমার বড় অসুখ করেচে—”

ভোলানাথ। আজ্ঞে, আমি তবে চল্‌লাম! কিন্তু এ গরীবকে ভুল্‌বেন না! আমি বড় গরীব! আমার কেউ নাই!

ভোলানাথ উঠিবার উপক্রম করিল। কর্ত্তা কহিলেন, "টাকা রেখে যাচ্চ যে!"

ভোলানাথ দন্ত বাহির করিয়া কাতরস্বরে কহিল,—"আজ্ঞে—আজ্ঞে!—উটী গরীবকে মাপ কর্‌তে হবে! টাকা আমি এ রাজ-কাছারি থেকে নিয়ে যেতে পার্‌বো না—"

কর্ত্তা। ওরে পাগল! তুই আগে খালাস হ'; তা, দেখে আমার আহ্লাদ হোক্। তার পর বিশ পঁচিশ টাকা খরচ ক'রে ৺ মদনমোহনের এক-দিন মোচ্ছব দেওয়া যাবে।

ভোলানাথ। আজ্ঞে! তবে ঠাকুরের মোচ্ছবের জন্য এখন ৮৲ টাকা রৈল। কাল সকালে আর ১২৲ টাকা আন্‌বো। তা,—এসবই আপনার কাছে গচ্ছিত থাকবে।

কর্ত্তা 'আর' কোন কথা কহিলেন না।

ভোলানাথ স্বগৃহে প্রস্থান করিল। রামঠাকুর ক্ষুব্ধ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, "তাই'ত—ভোলাবেটাও পালালো! এখন করি কি? উপায় কি?"

বাস্তবিকই রামঠাকুরের বিশেষ কষ্ট হইয়াছিল। দীনদরিদ্রের হস্তে হঠাৎ একটী সাত-রাজার ধন মাণিক আসিল; কিন্তু অর্দ্ধদণ্ডপরে সে মাণিকটী উড়িয়া পলাইল। রামঠাকুরের অবস্থা ঠিক তদ্রূপ। ইহাতে তাঁহার কষ্ট না হইবে কেন?

কর্ত্তা কহিলেন, "ঠাকুর-মোশাই! তবে তুমি যাও।—চাকরদিগে সে কথাটা বলে যেয়ো—"

রামঠাকুরের একটু যেন অভিমান হইল। তিনি আর বাক্যব্যয় না করিয়া শীঘ্র প্রস্থান করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ-ঠাকুরদাদার উপর শ্রীরাধা-রামঠাকুরের যেন দুর্জ্জয় মান উপস্থিত হইল। বৃন্দাবন-বিলাসিনী শ্রীমতী-ঠাকুর-মোশাই এতক্ষণ বাঁকা বংশীধর শ্রীযুক্ত হরিতারণ দত্তকে একমুহূর্ত্ত না দেখিলে বাঁচিতেছিলেন না,—কিন্তু যাই অভিমান উপ-

জিল, অমনি কৃষ্ণপ্রেম ত্যাগ করিয়া দ্রুতপদে পলায়ন করিলেন।

একটা চাকর কর্ত্তাকে দেখিতে আসিল। কর্ত্তা বলিলেন, "প্রদীপটা নিবাইয়া দিয়া কপাট বন্ধ করিয়া যাও।"

কার্য্য, কথানুযায়ী সম্পন্ন হইল।



## তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কেহ যেন মনে না করেন, কর্ত্তার প্রকৃতই আজ অম্বলে বুকজ্বালা করিতেছে। কর্ত্তা বিকারী-রোগীর ন্যায় আড়ষ্ট হইয়া শুইয়া আছেন বটে, কিন্তু ইহা জ্বর-বিকার নহে। পণ্ডিতগণ ইহাকে মানস-বিকার কহিয়া থাকেন। বৈদ্যশাস্ত্রের মতে এ রোগের প্রকৃতি বড়ই ভয়ঙ্করী। জ্বর-বিকারের ঔষধ আছে, কিন্তু এ-বিকারের ঔষধ নাই।

মানস-বিকারে রোগী শীঘ্র প্রাণে মরে না বটে, কিন্তু অষ্টপ্রহর যন্ত্রণায় অস্থির হয়। কিছুতেই সুখ নাই, স্বস্তি নাই, সব শূন্যাকার। কাহারও সহিত কথা কহিতে বা কাহারও কথা শুনিতে, ভাল লাগে না। প্রিয়জন বিরক্তিভাজন হয়। অঙ্গে চন্দন লেপিলে, গাত্রদাহ উপস্থিত হয়। ক্ষুধা-মান্দ্য হয়। পিপাসা বৃদ্ধি হয়। কণ্ঠ শুষ্ক হয়। বুক ধড়্ধড়্ করে। রাত্রে অনিদ্রা ঘটে। মাথা ঘুরিতে থাকে। মন ত্রাস-যুক্ত হয়। ইচ্ছা

হয়, মাটীতে মুখ গুঁজিয়া, চোখ বুজিয়া, চুপ করিয়া কেবল পড়িয়া থাকি, আর ভাবি। কিন্তু তাহাতেও সুখ নাই। প্রাণ কেমন আইঢাই-ছট্‌ফট্‌ করে। তখন মনে হয়, বুঝি গড়াগড়ি দিলেই ভাল থাকিব।

এইরূপ যন্ত্রণায় কাল কাটিতে থাকে। সহজে মৃত্যু হয় না। যেন তুষানলে অঙ্গ অল্পে অল্পে ধীকি-ধীকি পুড়িতে থাকে।

শ্রীযুক্ত রায় হরিতারণ দত্ত বাহাদুর—দেওয়ান-মহাশয়ের মানস-বিকার অদ্য কতমাত্রায় উঠিয়াছে, তাহা সু-সূক্ষ্মরূপে সু-পরীক্ষা করিয়া দেখা নাই-ই হউক, মোদ্দা তিনি এ-পাশ ও-পাশ ছট্‌ফট্‌ করিতেছেন।

এতই যদি তাঁর কষ্ট, তবে তিনি ভোলা-ময়রার সহিত কথা কহিলেন কেন? সুহৃদপ্রবর রাম-ঠাকুরকেও যিনি কাছে বসিতে দিলেন না, তিনি ভোলা-ময়রার সঙ্গে অর্দ্ধদণ্ডের অধিক কাল বাক্যালাপ করিলেন কেন?

রামচন্দ্রের সীতা, 'প্রাণেভ্যোপি গরীয়সী'। দেওয়ানজীর টাকা—প্রাণেভ্যোপি গরীয়সী। বালক-বয়স হইতেই তিনি পয়সা ভাল বাসিতেন। আম-রুল শাকের রস দিয়া মাজিয়া-ঘষিয়া, ময়লা-পয়সাকে তিনি চক্‌চকে করিতেন। ঝক্‌ঝকে রগ্‌রগে টাকা ভিন্ন, অপরিষ্কার টাকা তিনি কাহারও নিকট হইতে লইতেন না। কোথাও টাকার ঝুন্‌ঝুন্‌ শব্দ হইলে সেই দিকে কাণ পাতিয়া থাকিতেন;—প্রেমিকের নিকট অপ্সরা-কন্যার নূপুর-নিক্কণের ন্যায়, সে ধ্বনি তাঁহার নিকট সুমধুর, সুন্দর, সুখদ বোধ হইত।

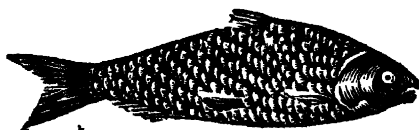
ভোলাময়রা প্রথম যখন রামঠাকুরের সহিত কথাবার্ত্তা কয়, কাতর হইয়া 'রক্ষা কর, রক্ষা কর' —ইত্যাকার শব্দ করে, কর্ত্তা তখন চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বোধ হয় নিদ্রিতই ছিলেন,—বোধ হয় নিদ্রাবস্থাতে বড়ই বিরক্ত হইতেছিলেন। কিন্তু টাকার শব্দে এবং টাকার কথায় তাঁহার নিদ্রা ভাঙ্গিল, নয়নদ্বয় উন্মীলিত হইল। তখন ভোলা-

নাথের সকল কথাই, তাহার কর্ণে সুধা বর্ষণ করিতে লাগিল। ভোলানাথের মূর্ত্তি তাঁহার চক্ষে রতিপতি কামের ন্যায় কমনীয় বোধ হইতে লাগিল। এত যে যন্ত্রণা, এরূপ যে সহস্র বিছার দংশন,—কিছু ক্ষণের জন্য কর্ত্তা বোধ হয় সমস্তই বিস্মৃত হইলেন। একটী হউক, আধটী হউক, লক্ষ হউক, কোটী হউক,—তাহাতে কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি নাই,—টাকা-জিনিসটাই তাঁহার পক্ষে সর্ব্ব-ব্যাধি-হর, সর্ব্ব-সুখাকর, এবং প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর সামগ্রী।

ভোলাময়রা চলিয়া গেলে কাজেই কর্ত্তা আবার এপাশ ওপাশ ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলেন।

ব্যাধির কারণ কি?—কিসে হঠাৎ এরূপ নিদারুণ মানস-বিকার উপস্থিত হইল।

ব্যাধির কারণ,—কালাচাঁদ।



## চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কর্ত্তা ভাবিতেছেন, "করি কি? উপায় কি? মনে মনে যাহা যাহা ঠিক করিয়া রাখিলাম, সবই কি তাহার বিপরীত হইল? ভাবি এক, হয় অন্য। কেন এমন হয়? এই সুবর্ণ কলসপূর্ণ বিশুদ্ধ দুগ্ধে কেন এক বিন্দু গোমূত্র পতিত হইতে দিব? পূর্ণিমার শশধরে কলঙ্ক-কালী কেন থাকিতে দিব? এই সোণার সংসারে এই দুরন্ত কালসাপকে কেন বাস করিতে দিব? আজ পঁচিশবৎসর কাল'ত এই চেষ্টাই স্বতঃপরতঃ করিয়া আসিতেছি, কিন্তু মনোরথ পূর্ণ হইতেছে কৈ? তবে কি সত্যসত্যই বাসনা ফলবতী হইবে না? তবে কি এই বিভীষণ বিষধরই আমাদিগকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে?

"তাও কি কখন হয়? আমি জীবিত থাকিতে, —এই হরিতারণ দত্তের দেহে এক ফোঁটা রক্ত থাকিতে,—তাহা কখনই ঘটিতে দিব না। এই

হরিতারণের প্রতাপে হুগলী সহরটা কাঁপিয়া উঠে,—ও-ছিনে-জোঁকটা'ত কোন্ ছার? আমি হুগলীতে একশত খুন করিয়া হজম করিতে পারি!—আমার কে কি করিবে? আমার ভয় কা'কে? আমি মনে করিলে আজই কালেক্‌টরি লুটাইতে পারি,—অথচ আমার বিরুদ্ধে একটীও সাক্ষী মিলে না! আমি মনে করিলে, এই দণ্ডে কালাচাঁদকে কাটিয়া টুক্‌রা-টুক্‌রা করিয়া, তিল-তিল করিয়া, গঙ্গাজলে ভাসাইয়া দিতে পারি—অথচ, আমার কেহই কিছুই করিতে পারে না। কেলে-ছোঁড়াটাকে আমার ভয় কি? ওটা'ত শিশু,—বালক,—গলা টিপিলে দুধ বার হয়,—তেঁতুল-তলা দিয়ে গেলে ওর গলায় দই বসে,—ওকে আমার ভয়ই বা কি?—ভাবনাই বা কি? ওর আছে কি যে, ওর জন্য আমাকে চিন্তিত হ'তে হবে? কেলে-ভূতোটার বিষয় নাই, জমী নাই, টাকা নাই, বাড়ী নাই, ভীটা নাই, উনুন নাই,—আজ-খায়, এমন সংস্থান নাই;—কিছুই নাই,—তবে ও-ছোঁড়াটা আমার সঙ্গে সমান

টক্কর দিবে কিসে? জেল-খাটা, ঘানি-টানা, কয়েদ-খালাসি, বদমাইস ফাঁসুড়ে, চোর—ওর আবার হুগলী-সহরে সহায়-সম্পত্তি কে হবে? কার্ হিম্মতে, কার্ হেমাকতে, ও-গাঁটকাটা-টা আমার সঙ্গে মোকদ্দমা লড়্বে? এমন কে আছে,—কার্ ঘাড়ে এমন দুটা মাথা আছে যে, সে ব্যক্তি কালা-চাঁদকে পশ্চাতে করিয়া বিবাদার্থ আমার সম্মুখীন হইতে সক্ষম হইবে? অথবা এমনই বা কে আছে যে, সে ব্যক্তি কালাচাঁদকে সম্মুখে রাখিয়া, পশ্চাৎ হইতে আমার সহিত বিবাদ করিতে সাহসী হইবে? সে কি জানে না, আমি নবাব-বাবুকে জেল খাটাইয়াছি,—প্রাণকৃষ্ণ হালদারকে দ্বীপান্তর পাঠাইয়াছি,—নির্দ্দোষ হরচন্দ্রকে ফাঁসি-কাঠে ঝুলাই-য়াছি?—সে কি জানে না, আমি রাণী বিন্দু-বাসিনীকে পথের ভিখারিণী করিয়াছি,—জমীদার জয়কালী মুখুয্যের ভিটায় ঘু-ঘু চরাইয়াছি,—মুচ্ছুদ্দি যাদবদত্তের মাথা প্রকাশ্য রাজপথে দ্বিখণ্ডিত করাই-য়াছি? এত জানিয়া-শুনিয়া, কে আমার সঙ্গে

সম্মুখ-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবে? তবে কালাচাঁদকে আমার ভয় কি? ও-ছোঁড়া আমার কি করিতে পারে? ও দুগ্ধপোষ্য বালকটা আমার কাছে কোথায় লাগে? আজই ত আমি ওকে মিছামিছি চোর বলিয়া হাতে হাতকড়ি দেওয়াইতে পারি!—ছয়মাস কারাগারে রাখাইতে পারি! দারোগা করিম সেখত আমার গোলাম,—গোলামের গোলাম!—তাকে যা বলিব, তাই সে করিবে! দারোগা, দু-বেলা বাসায় এসে যোড়হাত ক'রে দূরে দাঁড়াইয়া থাকে—সে, আমার কথায় কি না করিতে পারে? খবর দিলে, দারোগা আজই রাত্রে কেলেটাকে ধ'রে, বেঁধে নিয়ে যেতে পারে! ওদিকে ডেপুটী বকাউল্লা,—সে'ত পরম-বন্ধু। এক-বার তাঁকে চোখের ইঙ্গিত করলে, কেলেটার এক মুহূর্ত্তেই ছয়মাস জেল হয়ে যাবে! আমি পারি না কি? তবে কালাচাঁদকে ভয় কি?

ভয় কিছুই নাই! তবু মন কেমন ধুক্-ধুক্ করে! কেন এমন হয়? কেন এক একবার

বুকের ভিতর গুর্-গুর্ করিয়া উঠে! যাহা ভাবি, যাহা স্থির করি,—কেন তার উল্টা উৎপত্তি হয়? যাহাকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করিব,—এরূপ সঙ্কল্প ছিল, সে, কেমন করিয়া এরূপ বৃহৎ বটবৃক্ষের ন্যায় বাড়িয়া উঠিল? যাহার বিলোপ-সাধন জন্য, আজ প্রায় পঁচিশ বৎসর কাল স্বতঃপরতঃ চেষ্টা করিয়াছি, সে-ই এখন বড় হইয়া, প্রকাণ্ড মূর্ত্তি ধরিয়া, আমাকে মাছ-দই-সন্দেস ভেট দেয়, সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে, ভক্তিভরে দাদা বলিয়া ডাকে! তবে কি এই হরিতারণ দত্তের ক্ষমতার হ্রাস হইয়াছে?—শক্তির লাঘব হইয়াছে? তেজস্বিতার খর্ব্ব হইয়াছে? হরিতারণ দত্তের ঈষৎ দৃষ্টি নিক্ষেপে, সামান্য অঙ্গুলি-হেলনে দিক্ সমভূম হয়, কিন্তু আমার এই পঁচিশ বৎসরের তীব্র-কুটিল-কটাক্ষে, বিষম বাহ্বাস্ফোটেও—এই পিতৃমাতৃহীন নেংটী-ইন্দুর কালাচাঁদ, বিশাল শাল-দ্রুমবৎ বিপরীতরূপে বর্দ্ধিতায়তন হইয়া উঠিল! ওঃ!—কেন এমন হয়?

ওঃ—ওঃ! কি নিদারুণ বিভীষিকা! প্রথম হইতে

আজ পর্য্যন্ত সকল কথা ভাবিতে গেলে, দেহে আর প্রাণ থাকে না। কালাচাঁদের আপন ঠাকুরদাদা কাটা পড়িল, কালাচাঁদের বাপও জ্বররোগে মরিল,—আমি ভাবিলাম, আপদ গেল, কণ্টক দূর হইল,—নহিলে জ্ঞাতিশত্রুদ্বারা চিরদিন হাড়ে-নাড়ে জ্বলিতাম! বেশ নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া আছি, এমন সময় হঠাৎ একদিন শুনিলাম, কালাচাঁদের মা পাঁচ মাস অন্তঃসত্ত্বা। শুনিয়াই মাথাটা কেমন ঘুরিয়া উঠিল। প্রথম ভাবিলাম, এ-কথা কখন সম্ভব হইতে পারে না। কালাচাঁদের পিতার তিন মাস হইল মৃত্যু হইয়াছে;—সুতরাং তাহার স্ত্রীর গর্ভ হইবে কিরূপে? ক্রমশ শুনিলাম, গর্ভ প্রকৃতই বটে! মনটা বড়ই খারাপ হইল! ভাবিলাম, স্ত্রীলোকটাকে ভ্রষ্টা বলিয়া তাড়াইয়া দিই না কেন? মনে হইল, এ কাজে তত সুবিধা হইবে না;—বরং গোলযোগ ঘটিলেও ঘটিতে পারে। বিশেষ গিন্নী (আমার স্ত্রী) উহাকে সতী-লক্ষ্মী বলিয়া থাকেন। তার পর ঠিক হইল,—গর্ভস্রাব

করাইয়া দিলে ক্ষতি কি? চেষ্টাও হইল,—হতভাগী ঔষধও খাইল,—কিন্তু কিছুই ফল হইল না। গর্ভ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। প্রকৃতই আমার ভয় হইল। আমি তখন কৌশলে যোগাড়যন্ত্র করিয়া হতভাগীকে বাপের বাড়ী পাঠাইয়া দিলাম। ভাবিলাম, বর্ষাকাল, শ্রাবণমাস, নদ-নদী খাল-বিল পূর্ণ,—পথসমূহ কর্দ্দমক্লিষ্ট এবং পিচ্ছল,—এ-সময় ঝড়বৃষ্টি-বজ্রাঘাতেরইবা অভাব কি? ডুলি করিয়া গেলেও, গর্ভবতী স্ত্রীলোকের এ-সময় নিশ্চয় প্রাণ-সঙ্কট হইবে! একটী খুব খারাপ দিন দেখাইয়া, অশ্লেষা, দিক্‌শূল, পাপযোগ দেখিয়া, বারবেলায় হতভাগীকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিলাম। কিন্তু ইহাতেও কিছুই হইল না। অবশেষে মনকে দৃঢ় করিলাম,—বেটা হবে, কি মেয়ে হবে,—তার ঠিক নাই!—আমি এখন এত মিছা ভাবিয়া মরি কেন? বিশেষ, জন্মিয়াই অনেক শিশু প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে। আরও এক কথা,—গর্ভবতী স্ত্রীলোককে নদীপার হইতে নাই;—হতভাগী নয়মাস গর্ভে

সাতটা নদী খাল পার হইয়াছে। অতএব, পুত্রই হউক, আর কন্যাই হউক,—ছেলেটা কিছুতেই বাঁচিবে না,—কিছুতেই তিনদিন পার হইবে না।

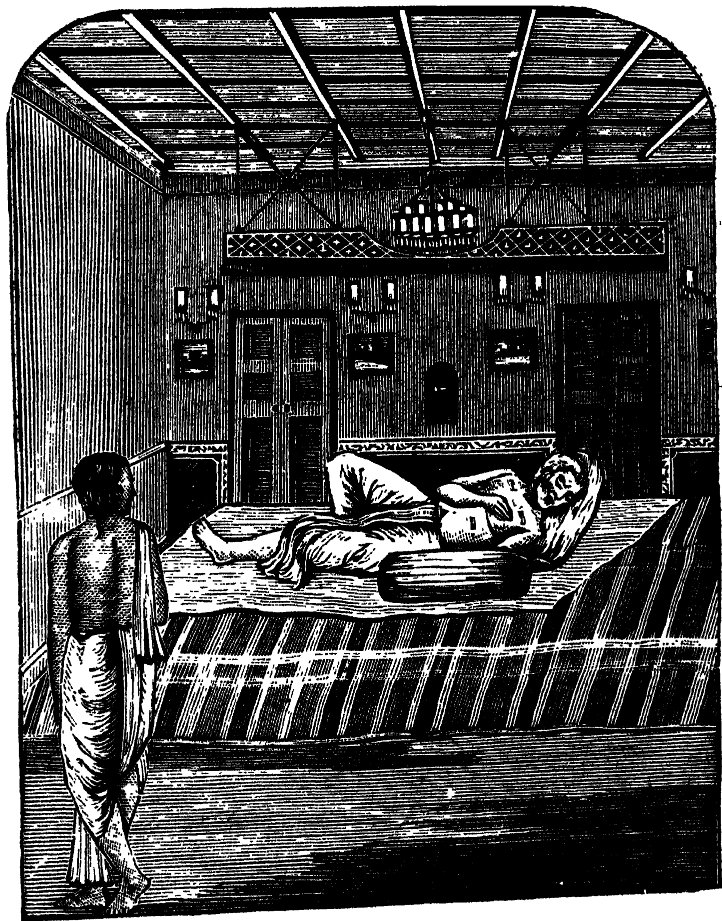
এইরূপ আশ্বাসে বসিয়া আছি, এমন সময় একদিন সংবাদ পাইলাম, হতভাগীর একটী পুত্র-সন্তান হইয়াছে। বুকটা অমনি ধসিয়া গেল। কি করি—উপায়ত নাই!—তিনদিন কাহারও সহিত কথা কহিতে পারিলাম না। জন্মক্ষণ জানিয়া পাঁজি খুলিয়া দেখিলাম,—শনিবার অমাবস্যায় ছেলেটা ভূমিষ্ঠ হইয়াছে। মনে অল্প আহ্লাদ হইল। অমাবস্যার ক্ষণে জন্মিয়াছে,—তাহাতে আবার শনি-বার পাইয়াছে,—সুতরাং এ ছেলে কিছুতেই বাঁচিবে না। একজন আচার্য্যকে ডাকাইলাম। কথা-প্রসঙ্গে কৌশলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, অমাবস্যার রাত্রি, শনিবারে কোন ছেলে জন্মিলে, সে ছেলেটা বাঁচে কিনা? আচার্য্য পুঁথি খুলিয়া, শ্লোক আওড়াইয়া,—বলিলেন, 'যখন ভাদ্রমাস, শনি-বার, অমাবস্যা এবং রাত্রিকাল,—মঙ্গলের দশা,

রাক্ষসগণ,—তখন সে-ছেলে কিছুতেই বাঁচিবে না। এই দেওয়ালে লিখে রাখুন,—একবৎসর মধ্যে সে-ছেলের মরণ নিশ্চয়।' মনটা তবু কতক আশ্বস্ত হইল!

এক বৎসর উত্তীর্ণ হইল, তবু কালাচাঁদ মরিল না। চর পাঠাইয়া সংবাদ লইলাম,—সে আসিয়া বলিল, ছেলেটা কালো কিট্‌কিটে হইয়াছে,—ঠিক্ যেন ধান্‌সিজে-হাঁড়ির তলা। সেটা মামার বাড়ীতে ভাল খেতে-মাখ্‌তে পায় না। লোকের ছাঁচ-তলায়, আঁস্তাকুড়ে বেড়িয়ে বেড়ায়। কাহাকেও কিছু খাইতে দেখিলে, সে তাহার মুখটী-পানে চাহিয়া থাকে। তার মামারা গরীব,—কোথা কি পাবে? শুনিলাম, দুধের বদলে কেলেটাকে ফেন খেতে দেয়! কেলেটার চেহারা দেখিলে মনে হয় ঠিক্ যেন, সেওড়া-গাছের ভূত।

এ কথা শুনিয়া তবু মনটা একটু ঠাণ্ডা হইল। ভাবিলাম, ছোঁড়াটা মামার বাড়ী না খেতে পেয়েই মরিয়া যাইবে। পাঁচ সাত বৎসর এই ভাবেই

রামঠাকুরের ঠাকুরদাদা—দর্শন।



কাটিল,—আমিও তাহার মরণ নিশ্চয় করিয়া নিশ্চিন্ত রহিলাম।

কিন্তু দুঃখ এই, অদৃষ্টের ফের-ঘোর এমনি যে, কালাচাঁদ মরিল না। পরম্পরায় শুনিলাম, কালাচাঁদ বেশ মোটাসোটা হইয়াছে,—বর্দ্ধমানে রাজার স্কুলে পড়িতেছে,—এবং দিব্যসুখে আছে। একথা শুনিয়াইত আমার আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু তখন রাগ করিয়া লাভ কি? ভাবিলাম, একবার কালাচাঁদকে বর্দ্ধমান থেকে আনাই না কেন?—দেখি না কেন,—কেমন হইয়াছে! লোকের কথা সত্য কি মিথ্যা, একবার স্বচক্ষে দেখিয়া সে বিষয় পরীক্ষা করিয়া লই না কেন? বর্দ্ধমানে তার মামাকে চিঠি লিখিয়া কালাচাঁদকে আনাইলাম,—তাহার মূর্ত্তি যাহা দেখিলাম, তাহা বড় আশাপ্রদ নহে,—ঠিক্ যেন গুলি-বাঘ! বড় বড় চঞ্চল চোখ দুটা যেন চর্‌কি ঘুরিতেছে! নাকে-মুখে-চোখে যেন কথার ফোয়ারা উঠিতেছে! খায় ঠিক্ রাক্ষসের মত। সেই ছেলে-বয়সেই একদমে

ছয়গণ্ডা লুচি খেয়ে ফেলিল। পাড়ার ছেলে-গুলাকেত মেরে-ধরে, কাম্ড়ে-কুম্ড়ে পাড়াছাড়া করিল। বিসর্জ্জনের পূর্ব্বে, ঠিক্ যেন ডাকাত-পড়া-গোছ প'ড়ে, মা-দুর্গার মুকুটখানি ছিঁড়িয়া লইয়া পলাইল। অবশেষে কালাচাঁদ কিনা, বাছা সুরে-শের গালে এক চড় মারিল। বাছা সুরেশ অমনি ঘুরিয়া পড়িয়া মূর্চ্ছিত হইল। আমার তখন ইচ্ছা হইল, কেলেটাকে দু-আধখানা করে কেটে মাটীর নীচে পুঁতে ফেলি! কিন্তু চারিদিক্ দেখিয়া, পাঁচ সাত ভাবিয়া'ত কাজ করিতে হয়! আমি মনে করিলাম, কালাচাঁদকে যদি এখন আমি কিছু বলি, তবে গ্রামের সকল-লোক আমাকে দোষ দিবে। বলিবে,—ও-ছেলেটীর মা-বাপ নাই বলে কি, ওর বুড়ো ঠাকুরদাদার ওকে অমন করে মারা উচিত হয়েছে? এইরূপ আমি সাত-পাঁচ নানা-খানা ভাবিয়া, কালাচাঁদকে তার পর দিনই মামার বাড়ী পাঠাইয়া দিলাম। এখন মনে হইতেছে—সে কাজটা আমারই চুক হইয়াছিল,—শীকার হাতে

পাইয়াছিলাম,—ছাড়িলাম কেন? দু-দশদিন পরে তখনই একটা এস্পার ওস্পার করিলেই ভাল হইত!—কালাচাঁদের মামাকে না হয় একটা চিঠি লিখিতাম,—“হঠাৎ সর্পদংশনে কালাচাঁদের মৃত্যু ঘটিয়াছে। সকলি ৺মরজি! বাছার জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া আমি অন্ধ হইয়াছি।”—কিন্তু তখন সে বুদ্ধি আমার ঘটে আসিল কৈ? আর আমিই বা তখন কেমন করিয়া বুঝিব যে, কালাচাঁদ ক্রমশ এমন দারুণ দিগ্বিজয়ী হইয়া উঠিবে? সে সময় একদায়ে কিন্তু গুরু রক্ষা করিয়াছিলেন। গিন্নী তখন কাশী গিয়াছিলেন। আজিকার যে রকম ভাবগতিক দেখিলাম, তাহাতে বোধ হয়, গিন্নী যদি সে সময় বাটীতে থাকিতেন, তাহা হইলে কালা-চাঁদকে লইয়া কাঁধে করিয়া নাচিতেন,—হয়ত বলিতেন, কালাচাঁদ এইখানেই থাক্‌বে, আর তার মামার বাড়ী যাওয়া হবে না। আমার পূর্ব্ব-জন্মের অনেক পুণ্যবল ছিল, তাই গিন্নী তখন বাটীতে থাকেন নাই। সে যাহা হউক, এখন

গতকর্ম্মের অনুশোচনা করা বৃথা। উপস্থিত কিসে রক্ষা হয়, তাহা ভাবাই ভাল।'

আচ্ছা,—তেমনটা কেন হইল?—সবইত ঠিক্ হইয়াছিল, চারে মাছ আসিয়াছিল,—টোপ গিলিয়াছিল,—তবে এমন ফস্‌কাইল কেন? কালাচাঁদের মামাকে ৭০১৲ টাকা নগদ গণিয়া দিলাম,—হৃষ্টচিত্তে সে টাকা লইল। একরাত্রি বাটীর ভিতর টাকা রাখিল। নগদ কর্‌করে টাকার উপর অবশ্যই তাহার মায়া জন্মিল,—সে বোকা প্রাতে হঠাৎ টাকাগুলা ফেরত দিল কেন? টাকা সিন্দুকজাত হইবার পর সে টাকা কি কেহ ফেরত দিতে পারে? বিশেষত, কালাচাঁদের ঘর-ভিটা পুকুর-বাগান বিক্রয় হইয়া গেলে, তার মামার কি ক্ষতি ছিল? ক্ষতি ত কিছুই দেখি না,—কিন্তু তথাচ মামা টাকা ফেরত দিল কেন? আমি যে কৌশল-জাল পাতিয়াছিলাম, তাহা কি বুঝিতে পারিয়া, মামা আমাকে ফিরাইয়া দিল? সে তাহা কেমন করিয়া বুঝিবে? তাহাকে আমার সম্পত্তির

কার্য্য-নির্ব্বাহক নিযুক্ত করিব বলিয়াছিলাম,—এক-শত টাকা মাসিক বেতনেরও কথা আভাস দিয়াছিলাম,—কৌশলে খস্ড়া-উইলনামাও দেখাইয়াছিলাম,—দেখিয়া-শুনিয়া, সকল কথাইত সে বিশ্বাস করিয়াছিল বলিয়া বোধ হয়! বিশ্বাস যদি না করিবে, তবে সে টাকা লইবে কেন? রাত্রে কি তার বুদ্ধি বাড়িল? রাত্রিকালে শুইয়া-শুইয়া, ভাবিয়া-ভাবিয়া, সে, কি বুঝিতে পারিল যে, আমার সবটাই ফাঁকি,—ষোলকড়াই কাণা? বর্দ্ধমানে কোন বন্ধুর বাটীতে আমি সেই দরোয়ানটীকে লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম; দ্বারবানকে লুক্কায়িত করিবার কথা রাত্রে কি কোনরূপে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছিল? প্রকাশ পাইবারত কোন সম্ভাবনা দেখি না। আর প্রকাশ পাইলেই বা আমার মনোগত অভিসন্ধি কিছুতেইত প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা ছিল না। কালাচাঁদের ঘরভিটা এবং উইল,—দুইটা এক-সঙ্গে রেজষ্টরি করিব,—ইহাই মামাকে প্রস্তাব করা আমার স্থির ছিল। যদি ঘরভিটা কোন গতিকে

রেজষ্টরি না ঘটে, তাহা হইলে তখনই পলাইবার উপায় বিধান জন্য খানসামা দ্বারা দ্বারবানকে ডাকাইয়া বলাইব,—“আপনি শীঘ্র বাটী চলুন,—সুরেশের ব্যারাম”—ইহাও স্থির ছিল! কিন্তু এই মানসিক গূঢ় সঙ্কল্পের বিষয় প্রকাশ হইবার কোনও উপায় ছিল কি? দ্বারবানত অবিশ্বাসী নহে! খানসামাত প্রভুভক্ত;—তবে কালাচাঁদের মামা কেমন করিয়া টের পাইবে, আমার সকলি ভুয়া-বাজী!—উইল-রেজষ্টরী মিথ্যা—ফাঁকি দিয়া কালা-চাঁদের ঘরভিটা লওয়াই কেবল সত্য!!

তবে কি করুণাময়ী, মামাকে ভাঙ্গাইল? সে নচ্ছার ছুঁচোবেটী ভাঙ্গচালি দিবার কে? কালা-চাঁদের ভিটা আমি টাকা দিয়া কিনিব,—তাতে বাধা দিবার জন্য তো-বেটীর মাথাব্যথা পড়ে কেন? কালাচাঁদ তোর কে হয়? তোর কি? সে-দিন অদৃষ্টে কতই না কর্ম্মভোগ ছিল! সেই পাড়া-মজানি বেশ্যাটাকে জানেলার কাছে আনিয়া দুটা মিষ্ট কথায় বুঝাইবার জন্য কতইনা আমাকে

টাকার ঝন্‌ঝনানি শব্দ করিতে হইয়াছিল? শুনিয়াছিলাম, ও-বেটী কালাচাঁদ-গত প্রাণ হইয়াছিল,—তাই তাহারও তোষামোদ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম! কিন্তু কি আপ্‌শোষ! মাছ গাঁথিয়া খেলাইবার সময় ডোর ছিঁড়িয়া গেল! ও-বেটী যেমন আমার মনে সে-দিন কষ্ট দিয়াছিল, তেমনি সে, শেষে নিজে কষ্ট পাইল! দিনকতক পরে উপপতিটা মরিল,—কালাচাঁদ পলাইল, শেষে নিজে না খেতে পেয়ে, ঘরে মরে, তিনদিন বাসিমড়া হয়ে, ঘরের ভিতর পচিল। আমাকে কষ্ট দিয়ে কেহই সুখে থাকৃতে পারে না! যে আমাকে কষ্ট দিবে,—একটা না-একটা তার বিভ্রাট ঘটিবেই।

সত্য সত্যই কি করুণার জন্য সেই মহা-উদ্দেশ্য সফল হইল না?—তাই কি?—কেমন করিয়া নিশ্চয় বলিব?

অথবা বুঝি আমার দুরদৃষ্ট এবং কালাচাঁদের শুভাদৃষ্ট-নিবন্ধনই এ দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকিবে!! তেমন কৌশলময় সূক্ষ্ম পাকা ওস্তাদি জালে মাছ

পড়িয়া ছিঁড়িয়া পলাইল,—তখন অবশ্যই কালাচাঁদের ভাগ্যবল বলিতে হইবে!

আচ্ছা,—সব কথাই ছাড়িয়া দিলাম। কালাচাঁদের অদৃষ্ট না হয় খুব ভাল বলিয়াই মানিয়া লইলাম, তথাচ তাহারত তিনবৎসর জেল হইল,—ঘানিগাছে ঘুরপাক দিতে হইল। কালাচাঁদকে কারাগারে পাঠাইবার প্রধান উদ্যোগকারী কে? আমি গোপনে তদ্বির না করিলে, কালাচাঁদ নিশ্চয়ই খালাস পাইত। সে যেরূপ কৌশল-জাল পাতিয়া জজের মন ভুলাইয়াছিল, তাহাতে জুরিগণও একবাক্যে 'কালাচাঁদ নির্দ্দোষ' এই কথা বলিত। সৌভাগ্যক্রমে জুরি আমার বশে ছিল,—তাই যা'হোক তিনবৎসর মিয়াদ হইল,—নচেৎ জজকে হস্তগত করিতে পারিলে, নিশ্চয় তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হইত। অভিযোগ অতীব গুরুতর হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

কেলে-ছোঁড়াটা জেলে গেল,—আমি ভাবিলাম, ছোঁড়া এইবার নিশ্চয় মারা পড়িবে। জেলের

ঘানি ঘুরাইতে ঘুরাইতে বাছার বত্রিশ-নাড়ী পাক পাইবে। শেষে চিঁ-চিঁ ডাক ছাড়িয়া বাছাধনকে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে; ইহাই আমার ধ্রুব ধারণা ছিল। এমন কি, আমি একবৎসর পরে নাএব-দারোগাকে পর্য্যন্তে বলিয়া রাখিয়াছিলাম যে, "কালাচাঁদের যদি কোন ভালমন্দ ঘটে, তবে তৎ-ক্ষণাৎ যেন আমি সংবাদ পাই।" নাএব-দারোগা বড়ই বোকা। সে সপ্তাহে সপ্তাহে আসিয়া সংবাদ দিত, "আপনার কালাচাঁদ বেশ আছেন,—কোন কষ্ট নাই।" আরে আহাম্মক! আমি কি কালাচাঁদের শুভ-সংবাদ খুঁজিতেছি? আমি যে, কালাচাঁদের মৃত্যুসংবাদ পাইবার কেবল কামনা করিতেছি!! যাহা হোক, সেই দারুণ গাধা দারোগাটাকে দেখিলেই আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিত! কিন্তু কি করি? "কালাচাঁদ আছেন ভাল"—তাহার মুখে এ কথা শুনিয়া আমাকে অগত্যা প্রতি সপ্তাহেই একবার কাষ্ঠ হাসি হাসিতে হইত!

উঃ! হিসাবের এত তফাৎ হয় কেন? কারাগারে কালাচাঁদের নিশ্চয়-মৃত্যু ভাবিয়া ঠিক এই সময়েই আমি তাহার ভিটাটুকু দখল করিয়া লইয়াছিলাম। সেখানে এখন প্রকাণ্ড ত্রিতল ইমারত! কালাচাঁদ এখন যদি তাহার ঘরভিটা চায়,—তবে তাহা কেমন করিয়া দিব?—গলাধাক্কা দিয়া দূর করিয়া তাড়াইয়া দিব,—বলিব, "কোথা তোর ভিটে, তা কে জানে?" যদি বেশী বাড়াবাড়ী করে,—বলিব, 'তামাদি হইয়াছে,—আর নালিস চলে না।' শেষে ত কালাচাঁদকে অবশ্যই ঐ কথা বলিব,—কিন্তু আমার এরূপ হিসাব ভুল হইল কেন? ভিটাটুকু এতদিন ফেলিয়া রাখিলাম,—আর চারিদিক না দেখিয়া কারাবাসকালে কেনই বা লইলাম?

কালাচাঁদ কারাগার হইতে বাহির হইল,—শুনিলাম, খুব হৃষ্টপুষ্ট যুবাপুরুষ হইয়া আসিয়াছে। জেলখানা,—যমের দক্ষিণদ্বার স্বরূপ। কেলে-ছোঁড়াটা কিনা সেখান থেকে ফিরিয়া আসিল!—

শুধু ফিরিয়া আসিল,—মোটা হইয়া ফিরিল! লোকমুখে এসব কথা শুনিয়াইত আমার চক্ষুস্থির।

ক্রমশ পরম্পরায় আরও শুনিলাম, কালাচাঁদ জেলখানা হইতে অনেক টাকা রোজগার করিয়া আনিয়াছে। সহসা সে কথা বিশ্বাস হইল না। তারপর এমন কথাও কর্ণগোচর হইল,—কালাচাঁদ দানধ্যান আরম্ভ করিয়াছে। গরীব দুঃখীকে দেখিলে সিকি আধুলি দেয়, কাপড় কিনিয়া দেয়। এসব কথা শুনিয়া আমার আর রাত্রে ঘুম হয় না। কেবলই তখন মনে হইতে লাগিল, "কেলেটা কল্লে কি!" পতে নাপ্‌তেটারই বা কি আক্কেল?—কি রকম হেমাকৎ? এ হুগলী সহরে কালাচাঁদকে বাসা দিবার জন্য তোকে কে সেধেছিল? ইচ্ছা হয়, পতেটাকে জুতিয়ে আটাপেটা করি। তা, জুতো খেলেওত পতের লজ্জা নেই। ঐ পতেটাই কালাচাঁদকে সঙ্গে করে আমার বাসায় এসেছিলো। আমি তখন কালাচাঁদের চেহারা

দেখিয়াই চটিয়া গেলাম! তুই কেলে ছোঁড়া।—তোর মা নেই, বাপ নেই,—লোকের পাত কুড়িয়ে খেয়ে, তুই মানুষ,—তুই এমন মোটা-সোটা 'গাড়ুর-গুপ্‌সো' হ'তে গেলি কেন? যেমন মানুষ, তেম্‌নি থাক্‌! তোকে সেদিন আমার সঙ্গে দেখা করিতে এখানে কে আসিতে বলিয়াছিল? তুই আমার চোখের সাম্‌নে আস্‌বার কে? বেরো হত-ভাগা, বেরো আমার বাড়ী থেকে!! সে-দিন এমনি রাগই হয়েছিল। দেখিয়াই যাকে বিরক্তি বোধ হয়, তার সঙ্গে আর কথা কহিব কি? কেলেটার সঙ্গে সে-দিন বিশেষ কোন বাক্যালাপও করিলাম না,—দুই-এক কথা কহিয়া মুখ বাঁকাইয়া বসিয়া রহিলাম।

বাক্যালাপ করিলাম না বটে, কিন্তু মনটা সেই দিন হইতেই দমিয়া গেল। প্রথম চিন্তা হইল,—পতে নাপ্‌তেটাকে এ-দেশ থেকে তাড়াইবার উপায় কি? বৃক্ষে পাখী বাসা করিয়াছে,—বৃক্ষটীর মূলচ্ছেদ করিলেই পাখীটী পলাইবে! পতেটার ঠ্যাং খোঁড়া

করিয়া দিলে হয় না? পতেটা ডুলি করিয়া দেশে গিয়া ভুগুক,—আর কালাচাঁদও একদিক্ দিয়া পলাইয়া যাক্! না,—প'তের বাড়ীতে ডাকাইতি করিয়া তাহার সর্ব্বস্ব লুটিয়া আনিব? অথবা তাহার ঘর জ্বালাইয়া দিব? গৃহদগ্ধ করাই সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধা! প'তের দুখানি ঘরই পুড়িয়া ছাই হইবে,—কালাচাঁদও স্থানাভাবে অন্যদেশে যাইতে বাধ্য হইবে।

এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া, গৃহদগ্ধের উদ্যোগ আদি করিতেছি, এমন সময় শুনিলাম,—কালাচাঁদের পয়সা কমিয়াছে, মুদীর দোকানে ধার হইয়াছে, পতিতেরও সহিত তাহার মাঝে মাঝে একটু আধটু ঝগড়া-বচসা হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কৌশলে পতিতকে ডাকাইলাম। মিষ্ট কথায় নাপিতকে ভুলাইলাম। পতিতকে বাটীর ক্ষৌরকার নিযুক্ত করিলাম। চৈত্রমাসে চড়কের দিন পতিতকে দুইটী টাকা সন্দেস খাইতে দিলাম। পতিত আমার গোলাম হইল। নাকবেঁধা পশুর মত পতিতকে তখন যা বলি, তাই সে করে।

কৌশলে পতিতের নিকট প্রস্তাব করিলাম,—“তোমার বাসা হইতে কালাচাঁদকে শীঘ্র তাড়াইয়া দূর করিতে হইবে।” তাহাকে বুঝাইয়া বলিলাম, “কালাচাঁদ চোর, ডাকাইত, ফাঁস্থড়ে। কালাচাঁদ লোকের গলায় ছুরি দিতে পারে। হয় ত তোমাকে একদিন খুন ক’রে, তোমার বাক্স ভেঙ্গে কালাচাঁদ চলে যেতে পারে! দেখ্‌চো না উহার চেহারা? ঠিক যেন যমদূত! ও লোকটা কত গৃহস্থের যে সর্ব্বনাশ করেছে, সে কথা তোমাকে কি আর বল্‌বো! পাকা ডাকাত না হ’লে, কি আর ও জেল খাটে?”

পতিত আমার কথার উত্তর দিল, “আজ্ঞে, আপ্‌নি যা ব’লচেন,—সবই ঠিক কথা। আমি এত দিন ঠাওরাইতে পারি নাই। এখন আমাকে যা আজ্ঞা কর্‌বেন, তাই কর্‌বো!—পতিতত আপনা-ছাড়া নয়।”

আমি। কালাচাঁদের এখন চলে কিসে?

পতিত। মাথামুণ্ড চল্‌বে আর কিসে?

দু-পাঁচ টাকা জেল থেকে চুরি করে এনেছিলো, তাই দিন কতক একে ॥০ আনা, ওকে ১৲ টাকা দিয়ে বাবুগিরি করা হলো। আমি তখন তাকে ঢের নিষেধ কর্‌লাম,—তা, তখন টাকার গরমে সে, আমার কথা শুন্‌বে কেন? পতিতের কথা বাসী হ'লেই মিষ্টি লাগে! পতিত যা বলে-ছিলো, শেষে তাই এসে ঘট্‌লো! আমি মর্‌বো কবে, তা'ই বল্‌তে পারি না,—নচেৎ আপনার ছিচরণ আশীর্ব্বাদে পতিত কি না জানে? আর-বছর ছিষ্টিধর ঘোষকে বলে এলেম, তোমার বিষয় থাক্‌বে না,—আর এ বছর সেই বিষয় অষ্টমে চড়্‌লো!

আমি। এখন কালাচাঁদের তবে কি হচ্চে?

পতিত। এই হরে মুদীর উঠ্‌নোর দেনা আঠার টাকা হয়েছে,—পর্‌শু আমি তাকে টীপে দিয়ে এলাম, নগদ পয়সা ভিন্ন তুমি পাই-পয়সার জিনিস কালাচাঁদকে দিও না। শেষে যে তুমি পতিতকে দূষবে, তা কখন হ'তে পারে না।

পতিত কারু কখন সিকি পয়সা ধার করে না। পতিতই বরং লোককে ধার দেয়।

আমি। দোকানদার কি কালকুটেটারে উঠ্‌নো আর যোগাইল?

পতিত। আজ্ঞে, না,—উঠ্‌নো আসিল না দেখিয়া, কালাচাঁদ এদিক-ওদিক চারিদিক চাইতে লাগ্‌লো—চাল নাই, ডাল নাই, নুন নাই, তেল নাই, হাঁড়ীটেও ফাটা,—তা, চারিদিক-পানে চাইলে ত হাঁড়ী-কাঠ-নুন-তেল-চাল-ডাল আইসে না!—আমি কালাচাঁদের গতিক দেখিয়া সে স্থান হইতে সরিয়া পড়িলাম! আমার ভয় হইল, পাছে কালাচাঁদ আমার নিকট হইতে পয়সা ধার চায়। কর্ত্তা-মোশাই! আপনিই বলুন, আমি কালাচাঁদকে কত আর ধার দিব? দিন নাই, রাত নাই, সময় নাই, অসময় নাই,—সদাই তার পেটের ভাতের জন্য পয়সা চাওয়া। আমি একলা পতিত কত দিক্ সাম্‌লাবো বলুন? প্রত্যহ আমাকে ৺ লক্ষ্মী-নারায়ণের জন্য একটী পয়সা রাখ্‌তে হয়,—ভাল

বামুন দেখিয়া প্রত্যহ আমি একটী করিয়া পয়সা দান করি,—কাণা-খোঁড়াকে দিতে প্রত্যহ গড়ে দুইটী করিয়া পয়সা যায়,—তা, আমি গরীব-মানুষ, আর কোথা কি পাবো?—কালাচাঁদকে খাওয়াতে নিত্যি নিত্যি পয়সা কোথা পাবো?

আমি। তবে কি গত পরশ্ব কালাচাঁদ খাইতে পায় নাই?

পতিত। কর্ত্তা-মোশাই! কালাচাঁদের কথা আমি কিছু বুঝ্‌তে পারি না। সন্ধ্যার পর বাসায় ফিরে এসে শুন্‌লাম,—কালাচাঁদ পথে তিনটী পয়সা কুড়াইয়া পাইয়াছে। তাহাতেই মালসা কিনেচে, চাল্ কিনেচে,—কার্ বাগান থেকে চুরি করে কাঠ ভেঙ্গে এনেচে,—এই সব যোগাড় করে ভাত ফুটিয়ে গণ্ডে-পিণ্ডে খেয়েচে। সে খাওয়ার চোট্ কি মোশাই! তিনটী পয়সার মধ্যে দুইটী পয়সা,—ঐ খাওয়ার খরচ,—আর এক পয়সায় অম্বুরী তামাক কিনেচে। আমি বাসায় ঢুক্‌তে না ঢুক্‌তে, কালাচাঁদ হেসে হেসে আমাকে

ডাক্‌লে, "এসো এসো বন্ধু এসো!—একবার অম্বুরী তামাকটা খেয়ে যাও!" আমি এ-কথা শুনে ভয়ে আর বাঁচি না। ভাব্‌লাম,—বিষ খাইয়ে আমাকে মার্‌বে নাকি? কি করি, ঘরে যখন কালসাপ পুষেচি, তখন চারা কি আছে? কর্ত্তা-মোশাই! আমাকে আর যা বলুন, সব কর্‌তে পারি,—বাঘের মুখে আমি ঢুক্‌তে পারি, কিন্তু অমন গোঁয়ার-গোবিন্দ লোকের কাছে আমি ঘেস্‌তে পারি না। কি জানি, পাছে, যদি সে একটা চড়িয়ে দেয়, তা'হলে ত একবারেই গেছি! তার আঙ্গুল নয় ত ঠিক যেন আছোলা বাকারি! তখন ছিমধুসূদনের নাম স্মোরণ করিতে করিতে আমি কালাচাঁদের কাছে যেয়ে উপস্থিত হ'লাম। আমাকে দেখেই তার অমনি খিল খিল হাসি আরম্ভ হলো।

আমি। আচ্ছা। সে কথা যা'ক্। হরে মুদীকে এখনি তুমি আমার নাম করে ডেকে নিয়ে এসো। আজই ছোট আদালতে কালাচাঁদের নামে

নালিষ দায়ের করে দাও। নালিষের নাম শুন্‌লেই কেলেটা ভয়ে পালিয়ে যাবে। আর তুমিও গিয়ে বল্‌বে,—“কালাচাঁদ! আমার বাড়ী থেকে তুমি এখনি চলিয়া যাও!”—

হায়! এইরূপ কত উদ্যোগ-সংযোগ করিলাম, কত কৌশলে কেমন পাকা ফাঁদ পাতিলাম,—কিন্তু আজ সবই ব্যর্থ হইয়া গেল! গত কল্য হরে মুদীকে দিয়া ছোট আদালতে কালাচাঁদের নামে নালিষ করাইলাম, পতিতকে দিয়া তাহার বাসা হইতে তাড়াইলাম,—কিন্তু অহো! আজ কিনা সেই কালাচাঁদ মাছ হাতে করিয়া, দই-সন্দেস-তরকারি ভেট লইয়া আসিয়া, আমাকে দাদা বলিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল!!

আমি যতই তার বুকে পাথর চাপান্‌ দিতে চাই, ততই সে ফুলিয়া উঠে। যতই তাহাকে হ্রস্ব করিবার যত্ন করি, ততই সে দীর্ঘ হইয়া দাঁড়ায়! আমি যতই তাহার মৃত্যু কামনা করি, ততই সে যেন অমর বর পাইয়া, ধেই-ধেই রবে

আমার সম্মুখে বিকট নৃত্য করিতে থাকে। জানি না, ভবিষ্যতে আমার অদৃষ্টে কি লেখা আছে! আমি বুঝি মজিলাম! ডুবিলাম! মরিলাম!



## পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

---

অদ্য প্রাতে যখন মাছ হাতে করিয়া কালাচাঁদ আমাকে "অ, দাদা-মোশাই!" বলিয়া ডাকিল, তখনি তার মূর্ত্তি দেখিয়া আমার মাথা ঘুরিয়া গেল। ভাবিলাম, একি?—একি?—যেন এক বিষম বিভীষিকা দেখিয়া উঠিলাম! একি ভূত, প্রেত, যক্ষ, না যমদূত? কল্য যাহার একটী মাত্রও পয়সা সংস্থান ছিল না, কল্য যাহাকে অভুক্ত অবস্থায় বিতাড়িত করিয়াছি, কল্য যাহার ছিন্ন মলিন বসন ভিন্ন সম্বল ছিল না,—সে আজ কেমন করিয়া নববস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক, হাসি-হাসি মুখে, মাছ-দই-সন্দেস ভেট লইয়া আমাকে দাদা বলিয়া ডাকে? এ ব্যাপার দেখিয়াইত দেহে আর আমার প্রাণ রহিল না! প্রথম মনে হইল. এই লোকটা কি কোন বহুরূপী?—কালাচাঁদের মূর্ত্তি ধরিয়া আমাকে ভয় দেখাইতে আসিয়াছে

কি? তখনি আবার মনে হইল,—ইহা কিছুই নহে,—আমি বুঝি কেবল আতঙ্ক-যুক্ত স্বপ্ন দেখিতেছি! শেষে দেখিতে দেখিতে স্থির বুঝিলাম, ইহা বহুরূপীও নহে, স্বপ্নও নহে,—ইহা সত্য-সত্যই কালাচাঁদ! তখন যদি আমার সম্মুখে বজ্রাঘাত হইত, অথবা মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িত, তাহা হইলে আমি তত আশ্চর্য্যান্বিত বা কাতর-যুক্ত হইতাম না।

কিন্তু কি করি? উপায়ত কিছুই নাই!—চারিদিক চাহিয়া, আকাশ-পাতাল ভাবিয়া কিছুই ঠিক করিতে পারিলাম না। আমার ভাবনা হইল, কালাচাঁদ বুঝি ভিটার ভাগ চাহিতে আসিয়াছে! বুঝি আমার ত্রিতল দালানের ইঁট এক একখানি করিয়া, খুলিয়া ফেলিয়া দিয়া, কালাচাঁদ দড়ি ধরিয়া ভিটার ভাগ লইতে উদ্যোগী হইয়াছে।

আমার মনে হইল, কালাচাঁদের পশ্চাতে অলক্ষ্যে শত শত লোক আছে। কালাচাঁদ একা নহে,—যেন সৈন্যদল-পরিবেষ্টিত সেনাপতি।

এখন আমার ধ্রুব ধারণা জন্মিয়াছে, কালাচাঁদ কোন লোককে কল্য রাত্রে সহায়-সম্পত্তি স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকিবে। আজ তাই তাহার উপদেশ মত, সৌহার্দ্দভাবে বিষয়ের অংশ লইতে কালাচাঁদ আসিয়াছে। সে লোক অবশ্যই বলিয়াছে, যদি বন্ধুত্বে কার্য্যশেষ না হয়, অন্তিমে নালিষ করাইয়া বিষয় দখল দেওয়াইয়া দিব। তাই সে ব্যক্তি মাছ-দই-সন্দেস দিয়া, প্রথমত কালাচাঁদকে আমার কাছে পাঠাইয়াছে!

বিষয় কি?—সুতরাং কালাচাঁদ তার অংশ লইবেই বা কি? যদি দুষ্ট লোকের দুষ্ট পরামর্শ শুনিয়া কালাচাঁদ বলে,—মৎকৃত এই অতুল বিষয়, জমীদারী সমস্তই পৈতৃক ধনে খরিদ,—তখন উপায়!! কালাচাঁদ যদি আদালতে বলে, "ঠাকুরদাদা দেওয়ানী কাজ করেন, ৫০৲ টাকা মাত্র মাহিনা পান,—তিনি স্বোপার্জ্জিত অর্থে কেমন করিয়া এই লক্ষ টাকা মুনফার বিষয় খরিদ করিবেন,"—তাহা হইলে আমি তাহার কি

উত্তর দিব? কালাচাঁদ আদালতে আরও বলিতে পারে, "আমরা একান্ন-ভুক্ত পরিবার,—কস্মিনকালে পৃথকান্ন হই নাই,—যদি পৃথকান্ন পৃথকবাটী হইতাম, তাহা হইলে আমার নিজস্ব ঘর ভিটাই বা কোথায় গেল?" বিশেষ, পৈতৃক পুকুর বাগান জমী—সমস্তই ত উহার ঠাকুরদাদা (আমার জ্যেষ্ঠ) রামতারণদত্তের নামে খরিদ,—মোকদ্দমা-সূত্রে সে দলিল দুইবার আদালতে দাখিল হইয়া তাহা পাকা হইয়া আছে! সেই পুকুর বাগান-জমী-ভিটা সমস্তই আমি দখল করিতেছি। বর্ত্তমান সমস্ত জমীদারীই আমার নামে খরিদ,—(কেবল কোম্পানীর কাগজ গুলি গিন্নীর নামে আছে)। কালাচাঁদ আপত্তি তুলিবে, "যখন আমার নিজ ঠাকুরদাদার নামীয় সম্পত্তির উনি অর্দ্ধেক দখলিকার, তখন উহাঁর নামীয় সম্পত্তির আমি অর্দ্ধেক দখলিকার হইব না কেন?"

কালাচাঁদ বোধ হয় আদালতে আরও বলিবে,—বাল্যকালে আমার পিতৃ-মাতৃ-বিয়োগ

হয়,—এতদিন নাবালক ছিলাম;—এক্ষণে সাবালক হইয়া এই নালিষ উপস্থিত করিয়াছি।

এইরূপ ভাবিয়াই আমি প্রাতে কালাচাঁদকে তত আদর করিলাম। মনে ঠিক করিলাম, কালাচাঁদকে এখন বশ করাই আমার পক্ষে সর্ব্বপ্রকারে শ্রেয়ঃকল্প। কালাচাঁদ ছেলে-মানুষ,—দুটা মিষ্ট-কথায় ভুলাইয়া, গায়ে হাত বুলাইয়া, বাছাধনকে বশে আনিব। কালাচাঁদের কাঁচা বয়স্,—হাতে নগদ কিছু টাকা ফেলিয়া দিব,—তাহাতেই সে ভোর্ হইয়া থাকিবে! মোদ্দা কালাচাঁদকে আর ছাড়া হইবে না।

পাঁচ চাল আঁচিয়াই প্রাতে ব'ড়ে টিপিয়াছিলাম। কালাচাঁদ ভাল-সামগ্রী উদর পূরিয়া খাইতে পায় না,—তাই তাহাকে আজ দ্বিপ্রহরে মহা-মহোৎসবে ভোজন করাইলাম। এঁ-এঁ,—কালাচাঁদ বশে থাকিবে না কি?—শিকলি কাটিয়া পলাইবে কি?—কিছুতেই কি সে পোষ মানিবে না?—কিছুতেই কি তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিব না?

যদি একান্তই বংশে না থাকে, তখন উপায়?—না থাকিলে—ভাবনাই বা কি আছে?—অবশেষে আমি 'মরিয়া' হইয়া, ঢাল খাঁড়া ধরিব! বালক-কালাচাঁদ কতক্ষণ আমার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে সক্ষম হইবে?—ঐ এক-রত্তি ছেলে, আমার কি করিবে?—ফুঁ দিয়া উড়াইয়া দিব! ভয় কি?

তবে কিনা,—এরূপ ভাবে একটা নালিষ-ফসাদ হইলে, দেখিতে শুনিতে বড়ই মন্দ হইয়া দাঁড়াইবে। বিশেষ, আমার অনেক শত্রু আছে। এই জ্ঞাতি-বিরোধ দেখিয়া শত্রুদের আনন্দ বাড়িবে। তা বাড়ে, বাড়ুক। তা'তেও হরিতারণ দত্ত ভয় খান না!!

কিন্তু ভিটা, পুকুর, বাগান—কালাচাঁদের ন্যায্য প্রাপ্য। এগার বিঘা জমীও তাহার প্রাপ্য। তা, এগার বিঘা কেন, একশত বিঘা জমী লইয়া, সে ক্ষান্ত হউক,—আমি তাহাতে রাজী আছি। একশত বিঘাই বা বলি কেন, সে পাঁচশত বিঘা জমী লউক, নগদ পাঁচশত টাকা লউক,—আর

আমাকে একটা একরার্-নামা লিখিয়া দিউক্ যে, কি বাস্তুভিটা, কি বাগান, কি পুষ্করিণী, কি অন্য কোন সম্পত্তি—কিছুতেই আর কালাচাঁদ দত্তের স্বত্ব নাই”;—এ প্রস্তাবে আমি সবিশেষ সম্মত আছি।

কালাচাঁদ যদি বলে, আমার টাকা চাই না, জমী চাই না,—চাই কেবল বাস্তুভিটা।—তাহা হইলেই মুস্কিল বাধিবে। ন্যায্য প্রাপ্য না দিলে, লোকেও ত দোষ দিতে পারে!

আচ্ছা, জাল-দলিল তৈয়ারি করিলে হয় না কি? দলিলে এই ভাবে লেখা থাকিবে, কালাচাঁদ দত্তের পিতা মৃত্যুর পূর্ব্বে পরিবার-বর্গের ভরণ-পোষণের জন্য আমাকে ভিটা, বাটী, পুকুর, বাগান সমস্তই বিক্রয় করিয়া গিয়াছে!

তাহাই বা কেমন করিয়া হয়? কালাচাঁদের মামা পুকুরে মাছ ধরাইত, চালে খড় দিয়া ঘর ছাওয়াইত, বাগানের আম পাড়াইয়া লইয়া যাইত;—এ সকল কথা ত অনেকেই জানে।

তবে কেমন করিয়া কালাচাঁদের পিতা-কর্ত্তৃক তদীয় বিষয়-বিক্রয় সাব্যস্ত করিব?

যাউক ও কথা। ঝগড়া-গণ্ডগোল করা অপেক্ষা প্রথমত কালাচাঁদের সঙ্গে ভাব করাই ভাল! প্রাণপণে সে চেষ্টা করাই এক্ষণে যুক্তি-সঙ্গত! আমি লক্ষ লোক ভুলাইলাম, আর কালাচাঁদকে কি ভুলাইতে পারিব না? অবশ্যই সে কার্য্যে সক্ষম হইব।

কিন্তু এক গোল দেখিতেছি। গিন্নী যেরূপ কালাচাঁদকে স্নেহ করিতেছেন, তাহাতে কালাচাঁদকে কিছুতেই এ-বাড়ীতে রাখা সু-পরামর্শ নহে। আমি গিন্নীর জ্বালায়, জ্বলিয়া-পুড়িয়া মরিলাম! গিন্নী তাহাকে এত ভাল বাসিবেন জানিলে, কে আজ কালাচাঁদকে বাড়ী ঢুকাইত। পূর্ব্বে-পূর্ব্বে গিন্নী মধ্যে মধ্যে বলিতেন বটে, "কালাচাঁদ কোথা?—তার কিছু খবর জান কি?" আমি এ-সব কথা কৌশলে উড়াইয়া দিতাম। অধিক কি, কালাচাঁদ যখন হুগলী-জেলে ছিল,—তখন একদিনের তরেও

সে-কথা গিন্নীকে বলি নাই। এখন বুঝিতেছি, সে সব কথা না বলিয়া ভালই করিয়াছিলাম। গিন্নী যে, কালাচাঁদকে দেখিয়া এরূপ হায়-হায় করিবেন, স্নেহ-রসে গলিয়া চোখের জল ফেলিবেন, তাহা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই! ওঃ—আজ কি কুকর্ম্মই করিয়াছি?—কেন আজ কালাচাঁদকে ঘরে ঢুকিতে বলিলাম, কেন তার সঙ্গে একত্র আহার করিলাম, কেনইবা গিন্নীর সহিত তাহার সাক্ষাতের সুবিধা করিয়া দিলাম? গিন্নী যখন কালাচাঁদকে বাড়ীর ভিতর অদ্য দুপুর-বেলা শুয়াইয়াছেন, তখন গিন্নী যে বলিবেন, কালাচাঁদ এ বাড়ীতে খাবে--মাখ্‌বে-থাক্‌বে—সে'ত একরকম নিশ্চয় ধরা কথা! এরূপ প্রস্তাব গিন্নী করিলে, আমি কি বলিয়া তাহাকে নিষেধ করিব? গিন্নী যদি লুকাইয়া-লুকাইয়া কালাচাঁদকে টাকা-কড়ী দেন, তাহারই উপায় আমি কি করিব? মহাবিপদ্ ঘটিল—দেখিতেছি!

কালাচাঁদকে বশে রাখিতে হইবে, খুব ভাল-

বাসিতে হইবে, ভরণপোষণ করিতে হইবে,—অথচ কালাচাঁদকে বাটীতে থাকিতে দেওয়া হইবে না,—তাহারই বা সংযুক্তি কি?

এখন কথা হইতেছে, গিন্নী যদি জেদ্‌ করিয়া বলেন, কালাচাঁদ এই বাটীতেই থাকিবে;—বালক-কালাচাঁদও যদি জেদ্‌ ধরে, "হাঁ আমি এইখানেই থাকিব;"—তখন উপায় কি? কুল-কিনারা ত কিছুই দেখি না!

এখন আমি করি কি? যে দিকে চাই, সেই দিকেই অন্ধকার দেখি। যে পথে চলিতে যাই, সেই পথেই বাধা বিঘ্ন সমুপস্থিত হয়। যে ডাল ধরি, সেই ডালই ভাঙ্গিয়া পড়ে। আজ আমার কাছে জাহ্নবী-জল কক্কুর-মূত্র হয়। পদ্মপত্র বিছুটিতে পরিণত হয়। সুধা, বিষ হয়। আমি করি কি? কোন্ পথ দেখি? কোন্ দিক্ রাখি? কোন্ পাশ বাঁধি? উঃ, গেলাম! আমি কোথায় যাই! কার কাছে যাই! কিসের কথা বলি! আমার কে আছে? আমার কি

আছে ? আমার কে নাই ? আমার কি নাই ?—ইহা'ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।

উঃ, আমার বুক বড়ই ধড়াস্-ধড়াস্ করিতেছে, মাথা বন্‌বন্ ঘুরিতেছে, দেহ থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে! আমার মনে দেখা দিতেছে, বুঝি ঐ মহাপাপ কালাচাঁদ কর্ত্তৃক আমার বিষয়-সর্ব্বস্ব বিনষ্ট হইল! বুঝি কালাচাঁদ আমার জিহ্বা টানিয়া ধরিয়া, আমার প্রাণ-বধার্থ উদ্যত হইয়াছে। আমি কোথাই যাই ? কোথাই গেলে রক্ষা পাই ?

বৃদ্ধ হরিতারণ দত্ত, সে রাত্রে প্রকৃতই এইরূপ ছট্‌ফট্ আই-ঢাই করিতে লাগিলেন। কখন্ যে কি কথা ভাবেন, তাহার কিছুই ঠিক থাকে না! তিনি কোনরূপ সু-মীমাংসায় উপনীত হইতে পারেন না! তিনি যখন যে মন্ত্রণাটী স্থির করেন, তখনই তাহার শত শত দোষ দেখিতে পান।

বৈশাখের সেই কালরাত্রে আদৌ ঠাকুরদাদার চক্ষে ঘুম আসিল না। তাঁহার দেহ যেন তুষানলে

দগ্ধ হইতে লাগিল। তাঁহার হৃৎপিণ্ডটা হামান-দিস্তায় কে যেন থেঁতো করিতে লাগিল। তাঁহার চোখে কে যেন অসংখ্য ক্ষুরধার ছুঁচ বিঁধিতে লাগিল।

ঠাকুরদাদা যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া “ত্রাহি মধুসূদন, ত্রাহি মধুসূদন,”—ডাক ছাড়িতে লাগিলেন।



## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

কবি কহিয়াছেন,—

কর্ম্মফলে কপালে কেবল সুখ-দুখ।
কেহ লক্ষপতি কেহ নাছের ভিক্ষুক॥
স্কন্ধে করি বয় কেহ, কেহ চাপে স্কন্ধে।
যত দেখ ফলাফল সেই কর্ম্ম-বন্ধে॥

ঠাকুরদাদা এ অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইয়া,—কষ্ট পাইতেছেন,—কেবল সেই আপনার কৃত-কর্ম্মের ফলে। কালাচাঁদ এই রাজাবিশেষ ঠাকুর-দাদার নাতী হইয়াও, স্বয়ং ধীশক্তিসম্পন্ন, প্রশস্ত-মনা হইয়াও, কষ্ট পাইতেছেন,—কেবল সেই আপনার কৃতকর্ম্মের ফলে।

কালাচাঁদ, ঠাকুরদাদার কাছে ভিটার ভাগ লইতেও আইসেন নাই, বিষয়ের অংশ লইতেও আইসেন নাই,—আসিয়াছেন, আপন খেয়ালে, আপন উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য। কালাচাঁদ এখনও

জানেন কিনা সন্দেহ যে,—তাঁহার ভিটায় ঠাকুরদাদা এক ত্রিতল অট্টালিকা বিনির্ম্মিত করিয়াছেন;—স্বগ্রামে তাঁহার পুকুর বাগান ভিটা আছে কিনা, হয় ত এখন তাঁহার মনেই নাই! মনে থাকিলেও, সে দিকে এক্ষণে তাঁহার কিঞ্চিন্মাত্র দৃক্‌পাতও নাই! সে ভিটায় বসবাসের স্বত্ব ঠাকুরদাদারই হউক, অথবা শৃগাল-কুক্কুর-সর্পেরই হউক,—সে সম্বন্ধে কালাচাঁদের কিছুই ভ্রূক্ষেপ নাই। তিনি আসিয়াছেন, আপন মনে, অন্য কারণে,—ঠাকুরদাদার সহিত সাক্ষাৎ করিতে।

কোথায় কিছুই নাই,—মেঘ নাই, বিদ্যুৎ নাই, বজ্রাঘাত নাই,—অথচ ঠাকুরদাদা যন্ত্রণায় অস্থির! সর্ব্বদিক্ সুপ্রসন্ন, ধূলা-রহিত বায়ু মন্দ মন্দ বহিতেছে, নীলাকাশের কোল দিয়া বক-কুল উড়িয়া যাইতেছে,—অথচ ঠাকুরদাদা কাতর,—মর্ম্মপীড়াগ্রস্ত, যেন মৃত্যু-শয্যায় শায়িত। কেন এমন হয়?—সেই কেবল কর্ম্মফল।

কালাচাঁদ যে, আজ প্রায় তিন দিন খাইতে

পাইলেন না, তাহাও কর্ম্মফল। ভূরি-ভোজনের মহামহোৎসবে, একশত আট রকম ভোগের সুবন্দোবস্তে, কালাচাঁদের উদরের এক কোণের এক-ষোড়শাংশও যে পূর্ণ হইল না,—ইহাও সেই কর্ম্মফল।

কালাচাঁদ ঠাকুরদাদার নিকট কেন আসিলেন? কেন হঠাৎ তাঁহার এরূপ মতিগতি ফিরিল? কালাচাঁদ আজ ছয় মাস কাল হুগলীতে আছেন;—একটী-দিন ব্যতীত, তিনি ঠাকুরদাদার হুগলীস্থ বাসাবাটীর উঠান মাড়ান্ নাই; এবং সেই একটী দিনেও তিনি ঠাকুরদাদার উপর মহা-বিরক্ত হইয়া সে বাসা পরিত্যাগ করিয়া গমন করেন। যদি এমনটাই হইল, তবে আজ আবার এরূপ বিপরীত ভাব ঘটিল কেন?

আজ শুধু আগমন নয়,—মাছ-দই-সন্দেস লইয়া আগমন,—হাসি-হাসি মুখে, ভাবে গদ্গদ হইয়া আগমন,—প্রেম-প্রীতি-ভরে যেন মাটীতে লুটাইতে লুটাইতে আগমন! কেন এমন হয়?

পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি,—কালাচাঁদ-চরিত্র আঁকা বড় কঠিন,—বুঝা ততোধিক কঠিন! যদি এ কালাচাঁদ-কীর্ত্তি-কলাপের কোন কথা কেহ হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম না হন, তাহা হইলে জানিবেন, হয় আমার লিখিবার দোষ, না হয় তাঁহার বুঝিবার দোষ। অধিকাংশ বাঙ্গালী-পাঠকই অন্তঃসার-শূন্য,—উপর দেখিয়াই উন্মত্ত,—বাহ্য-চাকৃচিক্যে বিমোহিত। লিখিবার দোষটুকু যে, বুঝিয়া, সারিয়া লইবেন,—সে আশাও কম।

সেই আশা কম বলিয়াই, প্রতিপদে কৈফিয়ত দিতে হয়। বাজে কৈফিয়তে বিজ্ঞ পাঠকের বড়ই বিরক্তি জন্মে। বিজ্ঞ, বড়জোর হাজার-করা একজন। নয়শত নিরানব্বই জন লেখাপড়া শিখিয়া মা-সরস্বতীর বরপুত্র। এই বরপুত্রগণকে উপেক্ষা করিয়া, পশ্চাতে ফেলিয়া যাওয়া কি উচিত? কাজেই কৈফিয়ত দিতে হয়!

কালাচাঁদ চরিত্র বিচিত্র। সাদা, লাল, কালো—সবরকম রঙই আছে। সরু-মোটা, তিক্ত-মধুর,

নরম-গরম—সকলপ্রকার ঢঙই আছে। কালাচাঁদ কখন স্বর্গে কখন মর্ত্তে, কখন পাতালে—এ চরিত্র কি আঁকা যায়?



## সপ্তম পরিচ্ছেদ।

মহাক্ষুধায় প্রপীড়িত কালাচাঁদ গতকল্য নিশীথে গঙ্গার ঘাটে বসিয়া, ভাবিয়া ভাবিয়া, আপনমনে স্থির করেন,—"চুরি করায় কোনও দোষ নাই।" পূর্ব্বে পূর্ব্বে যখন চুরি করিতেন, তখন তাঁহার ধারণা ছিল, যে,—তিনি একটা মন্দ কাজ করিতেছেন। ক্রমশ চৌর্য্যকর্ম্ম অভ্যস্ত হওয়ায়, মন্দ-কাজ-করার আঘাত তাঁহার হৃদয়ে বড় একটা লাগিত না। তবে স্থূলত এই বিশ্বাস ছিল, চুরি করা অপকর্ম্মের মধ্যে গণ্য। তৎপরে গ্রহ-বৈগুণ্যে তাঁহার কারাবাস হয়। তিন বৎসর কাল কারা-কূপে বাস করার পর, তিনি যখন খালাস পাইলেন, তখন পৃথিবীকে যেন নূতন দেখিলেন। আলোকমালায় বিভূষিত, স্বচ্ছন্দ-বিহারী পক্ষীকুলদ্বারা ধ্বনিত, সুখস্পর্শ সমীরণ সেবনে সদা প্রফুল্লিত—ধরাধামের এইরূপ অপূর্ব্ব রঙ্গ-ভঙ্গ দেখিয়া কালাচাঁদের হৃদয়ে কেমন এক অভিনব

উল্লাসের উদয় হইল। কারাগারেও কালাচাঁদ একরকম সুখে রাজত্ব করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু সে সুখ রাজার সুখ, ব্যবসাদারের সুখ,—নিকৃষ্ট লৌকিক সুখ। কিন্তু মুক্তির পর যে সুখোদয় হইল, তাহা যেন ঋষির সুখ,—নির্ব্বাণমুক্ত পুরুষের সুখ। কালাচাঁদ সদানন্দ পুরুষ হইলেন। অন্ধব্যক্তি বহুদিন পরে, বহুকষ্টে চক্ষুরত্ন-লাভ করিয়াছে, আর কি রক্ষা আছে? কালাচাঁদের কি আহ্লাদের সীমা আছে?

ক্রমশ কালাচাঁদ ভাবিতে লাগিলেন,—"কেন মিছে চুরি করিয়া মরি!!"—এইবার কিন্তু সুখে দুঃখ আসিল। ভাবনাই দোষ। ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার হৃদয়ের সেই পরম উল্লাস,—সেই নির্ব্বাণ-মুক্ত পুরুষের ন্যায় সুখ কমিল! সুখ কমুক,—তিনি কিন্তু চুরিবৃত্তি ছাড়িয়া দিলেন; লোকের দুঃখ-দুরীকরণার্থ তাঁহার সঞ্চিত অর্থ ব্যয় করিতে লাগিলেন,—স্ত্রীমণ্ডলী তাঁহার কাছে জননীর ন্যায় পূজনীয়া হইলেন।

কালাচাঁদের দেহে ভাবনা-কীট প্রবেশ করিল। কি ভাবনা,—তাহা কালাচাঁদও ভাল বুঝিতে পারেন না। মোদ্দা,—তিনি কেবল ভাবেন!—নীরবে, নিস্পন্দে কখন হয় ত এক প্রহর কাল এক স্থানে বসিয়া থাকেন! অন্নে রুচি কমিল। দেহও যেন কিঞ্চিৎ দুর্ব্বল হইল।

কালাচাঁদের ভাবনার আদি-অন্ত-মধ্য নাই—আরম্ভ-শেষ-সীমা নাই,—মাত্রা-ওজন-পরিমাণ নাই,—আছে কেবল, ভাবনা আর ভাবনা! ভাবনার অনন্ত সমুদ্র;—যে দিকে চাই, সেই দিকেই ভাবনা! মধ্যে মধ্যে আবর্ত্ত-বুদ্‌বুদ-তরঙ্গ-ফেন-সঙ্কুল।

কালাচাঁদ কখন ভাবেন,—"আচ্ছা, আমি পতিতপাবনের আশ্রয়ে থাকি কেন? পতিত'ত পাকা গাঁটকাটা, তাহার সহবাসে থাকিলে ত আমারও দেহমন কলুষিত হইতে পারে! কিন্তু পতিতকে ত্যাগ করিই বা কেমন করিয়া? পতিত আমার প্রথম আশ্রয়দাতা। আশ্রয়দাতাকে উপেক্ষা করা ত কখনই উচিত নহে! করি কি?"

কালাচাঁদ আরও ভাবেন, "পতিত যে আমাকে সহজে ছাড়িবে, এমন ত বোধ হয় না। পতিত আমার নিকট হইতে পয়সা পায়, খাবার সামগ্রী পায়, মিষ্ট কথা পায়। এমন কল্পতরুকে সহজে কে ত্যাগ করিবে? আমার যদি কখন পয়সা কমে, তথাচ পতিত আমাকে ত্যাগ করিতে পারিবে না। কারণ পতিত জানে, আমার ক্ষমতা অসীম। আজ যদি পয়সা না থাকে, দুদিন পরে আবার অনেক পয়সা হইতে পারে।"

"আর আমার পয়সাই বা কমিতে গেল কেন? সৎপথে থাকিলে 'অর্দ্ধেক-রাত্রে অন্ন হয়'। আমি ত এখন আর কোন মন্দকর্ম্ম, অসৎকর্ম্ম, পাপকর্ম্ম করিতেছি না যে, আমি অন্নাভাবে বা অর্থাভাবে কষ্ট পাইব? সাধু ব্যক্তি সদাই সুখী,—আমার অসুখ হইবে কেন?"

"পতিতপাবন শঠ, প্রবঞ্চক, চোর হউক,—আমাকে বুঝি সে যথেষ্ট ভক্তি করে, শ্রদ্ধা করে। সে-দিন আমার জ্বর হইল, পতিত আমার কত

সেবা-শুশ্রূষা করিল। প্রকৃতই পতিতের আমার প্রতি যেন বড়ই মমতা জন্মিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। চোর-ডাকাতদেরও-ত স্ত্রীপুত্র পিতা-মাতার প্রতি স্নেহ-ভক্তি আছে,—এস্থলে, পতিতের আমার প্রতি ভক্তি-ভালবাসা না থাকিবে কেন?"

"অতএব যে-দিক্ দিয়া, যে-ভাবেই দেখি, পতিতের হাত হইতে কোন দিকেই পরিত্রাণ দেখিতে পাই না। অথচ পতিতের গৃহে, পতিতের সহিত একত্র বসবাস করা কিছুতেই কর্ত্তব্য নহে! করি কি?"

"আচ্ছা, পতিতের গৃহে থাকিতেই বা দোষ কি? পতিত মন্দ হয়, হউক; আমি মন্দ না হইলেই ত হইল। সত্য বটে, মিথ্যাকথা পতিতের অঙ্গের ভূষণ। কিন্তু তা' হউক;—আমি মিথ্যাকথা না কহিলেই ত হইল। নিজে খাঁটি থাকিলে, অপরে কে কি করিতে পারে? আমার কি এরূপ শক্তি নাই যে, আত্ম-সমর্থনপূর্ব্বক আমি এ সংসারে অবস্থান করি? শক্তি আছে বৈ কি?

আর, শক্তি থাকিলে সবই সম্ভব। শক্তি ছিল বলিয়াই, মহাদেব কণ্ঠে মহাবিষ রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। আর, আমি কি এমনই অক্ষম যে, আমি এই ক্ষুদ্র পতিতের সংস্রবে থাকিতে সক্ষম হইব না?”

কালাচাঁদের চিন্তাস্রোত এই ভাবেই প্রবাহিত। তিনি কখন্ কোন্ কথা ভাবেন, তাহার কিছুই নির্ণয় নাই। “কুলবধূর প্রতি কটাক্ষপাতে দোষ কি? কেবল চোখের দেখা একবার দেখিয়া লইব বই'ত নয়,—ইহাতে কোন পক্ষেরইত ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই। পুরুষের নয়ন-কর্ত্তৃক একদৃষ্টে নিরীক্ষিত হইলে, রমণীর কোমল অঙ্গ ক্ষয় প্রাপ্ত হয় কি? দৃষ্টি কি মহাদ্রাবক? না,—ব্রহ্মাস্ত্র? ও-সব কিছুই নয়। কেবল দেখা। দেখায় আসে-যায় কি? গোলাপফুল, মল্লিকাফুল, চাঁপাফুল,—একদৃষ্টে চাহিয়া দেখিলে ত কেহ দোষ দেয় না। সুন্দরী-রমণী সংসার-অরণ্যের প্রস্ফুটিত পদ্ম-পুষ্পের তুল্য;—ক্ষণভঙ্গুর মানব-দেহ ধারণ করিয়া, স্বভাবের সে

শোভা সন্দর্শন-পূর্ব্বক নয়ন সার্থক না করিব কেন? শরদাকাশে বৎসরান্তে দুইটী দিন মাত্র সুধাকর পূর্ণচন্দ্র উদিত হন, কিন্তু এই ধরাধামে কত সুধামুখীর মুখচন্দ্র বারমাস ভূমে গড়াগড়ি যায়। আকাশের চন্দ্রটীকে দেখিলে কোন দোষ নাই,—কিন্তু এই পৃথিবীর চন্দ্রের পানে চাহিলেই যত গোলযোগ!

ভাল হউক মন্দ হউক, দোষ হউক গুণ হউক,—আমি সতী সুন্দরী রমণীর মুখ-চন্দ্রের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিব। চাহিয়া, চাহিয়া, বিধাতার সৃষ্টি-নৈপুণ্য দেখিব। মনে মন্দভাব না থাকিলেই হইল।

দেখিব ত মনে করি,—কিন্তু কেমন বাধ-বাধ ঠেকে! কেমন যেন চক্ষুলজ্জা হয়। রমণীর সঙ্গে যদি চারি-চক্ষে চাওয়া-চায়ি হইয়া যায়, তাহা হইলে ত গিয়াছি! স্ত্রীলোকটী মনে করিবে কি? সে যদি ভাবে, আমি কামভাবে তাহার পানে তাকাইয়া আছি, তাহা হইলে ত এ কাজ বড় সুবিধাজনক

নহে। তখন সেই কুলবালা লজ্জায় কতই না ম্রিয়মাণ হইবে! হয় ত ভয়ে থরহরি কাঁপিবে! আর, আমাকে মনে করিবে, এ একটা দুষ্ট, পাপিষ্ঠ, লম্পট পশু! আর এক কথা,—যদি সেই কুলবালাটী কুচরিত্রাই হয়,—তাহা হইলেই ত সে-ও এক মহামুস্কিল কাণ্ড। সে আমাকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল, আমিও তাহাকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলাম! তখন ত ঘোর বিপদ্ ঘটিয়া উঠিবে! অগত্যা আমি তাহার রূপমাধুরী দেখিতে ক্ষান্ত হইলাম; কিন্তু সে যদি আর ক্ষান্ত না হয়,—আমাকে দেখিতেই থাকে,—আর বলে, 'আমি কেবল স্বভাবের শোভামাত্র দেখিতেছি;—সুতরাং তাহাতে আমার লজ্জা ত নাই-ই, কিন্তু তোমার হঠাৎ এমন শুধু-শুধু লজ্জা হয় কেন? অতএব হে নবীনপুরুষ-বর! তুমি চক্ষু তুলিয়া, আয়ত-লোচনে আমার প্রতি চাহিয়া থাক।'—তখন উপায়?

এ যে বড় বিষম দায় দেখিতেছি। সুন্দরী—

যুবতী—জিনিসটাই খারাপ্! ওর ভাল-মন্দ ভেদ নাই, বাস্তু-উট্‌কো বিচার নাই, নরম-গরম তারতম্য নাই,—ঐ বস্তুটাই বদ্ !—দপ্‌দপে আগুণের খাপ্‌রা! দূর হইতে মনে হয়, বুঝি ঐ আমার সাতরাজার ধন একটী নীলকান্তমণি জ্বলিতেছে!—কিন্তু কাছে গেলেই পুড়িয়া ছাই হইতে হয়! এই কথাই ঠিক্! অন্যের দেখিয়াছি, নিজে ভুক্তভোগীও বটি,—একবার ঝোঁক ধরিলে ত আর রক্ষা নাই! তখন বাষ্পীয় কলেও, সে বেগ টানিয়া রাখিতে প্পারে না!

আরও একটা কথা শুনিয়াছি,—ঘ্রাণে অর্দ্ধ-ভোজন। যদি স্পর্শনে পূর্ণ পাপ হয়, তবে দর্শনে অর্দ্ধ পাপ না হইবে কেন?

আরও কথা আছে। ক্রমশ দেখিতে দেখিতে যদি লোভ জন্মিয়া যায়!—তখন উপায়? প্রথমে না হয় স্বভাবের শোভা বলিয়াই দেখিতে আরম্ভ করিলাম, কিন্তু শেষে যদি গোল বাধে?—তখন রক্ষা করিবে কে? মন যদি মদমত্ত মাতঙ্গের ন্যায়

হুংহিত ধ্বনি করিয়া উঠে, তবে তখন তাহাকে থামাইবে কে? মনকে বিশ্বাস কি? মনটী ঠিক্ কালসাপ। দেহ-গৃহে বাস। দেখিতে বেশ ভাল-মানুষটীর মত। কিন্তু সুবিধা পাইলেই কুট্ করিয়া কামড়!—অমনি বিষে জর্জ্জরিত দেহ!

আচ্ছা,—সুন্দরীর রূপমাধুরী নাই বা দেখিলাম!—তাহা হইলে ত সকল গোলই চুকিয়া যায়! মেয়েমানুষের মুখ না দেখিলে যে, হাঁড়ী-চড়া বন্ধ হয়—এমন ত কিছু নয়? বলিতে পার, স্বভাবের সুন্দর শোভা সন্দর্শনে বঞ্চিত হইলাম। স্বভাবের ঐ শোভাটী না দেখিলে কি তোমার সংসার অচল হয়? আরও ত অন্যরকম শত শত, সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ শোভা রহিয়াছে,—তাহাই কেন দেখ না? নীলাকাশ দেখ না? অনন্ত কাল, বসিয়া বসিয়া, চাহিয়া চাহিয়া নীলাকাশ দেখ না? আকাশ পছন্দ না হয়,—সবুজ ময়দান দেখ। বেশ লহ-লহ ঘাস-পূর্ণ মনোহর মাঠ দেখ। ঘাসে রুচি না হয়,—সেন্টহেলেনা-দ্বীপে বসিয়া, অনন্ত-

বিস্তৃত, তরঙ্গভঙ্গময়, সমুদ্র সন্দর্শন কর। স্বভাবের শোভা দেখিতেই যদি এত সাধ, তবে হিমালয়ে যাও—ধবল-গিরিতে বাস কর। সাহারায় যাও,—মরুভূমে ভ্রমণ কর। কেবল মেয়েমানুষের সেই মুখটী না দেখিলে কি তোমার স্বভাবের শোভা দেখা হয় না? ছি!!

রমণী জননীর ন্যায় পূজনীয়া। কুলবধূ—দেবী—স্বর্গের সামগ্রী। দুর্ব্বল মানব সেই দেবীর মুখকমল দেখিবার অধিকারী নহে,—উপযুক্ত নহে। এই কথাই ঠিক্। কুলকামিনী সম্মুখে সমুপস্থিত হইলে, আমি কেবল তাঁহার চরণযুগল নিরীক্ষণ করিয়াই নয়ন সার্থক করিব।”

কালাচাঁদের রমণী-সম্বন্ধিনী ভাবনা এইরূপই। সম্যক্‌রূপে এ ব্যাপার বর্ণন করিতে সক্ষম হইলাম কি না—জানি না! কেন না, এরূপ ভাবনার কূল-কিনারা নাই! কখন এই,—কূলের কাছে, কখন ঐ,—মাঝ-দরিয়ায়! কখন তরণীর কোলে নিশ্চিন্ত মনে সুখ-শয্যায় শয়ান, কখন গভীর

আবর্ত্তে পড়িয়া নিরন্তর ঘূর্ণমান! কিছুই ঠিক নাই,—কেমন করিয়া এ কাহিনী কীর্ত্তন করিব?

কালাচাঁদ যে, একটী-দিন-মাত্র একবেলা বসিয়া স্ত্রীলোক-ঘটিত বিষয় ঐরূপ ভাবিয়াছিলেন, তাহা নহে। দিন নাই, রাত নাই, যখন খেয়াল চাপিত, তখনই ঐ কথা তোলাপাড়া করিতেন। হয় ত একই কথা একশ-বার প্রস্তাব, আলোচনা এবং মীমাংসা করিতেন। কিছুরই নির্দ্দিষ্ট নিয়ম ছিল না।

কারাগার হইতে কালাচাঁদ কয়েক-শত টাকা আনিয়াছিলেন। কিন্তু পতিত-পাবনের বাসায় অবস্থানকালে তিনি অর্থের উপর নির্ম্মম হইলেন। তিনি মনে মনে ঠিক করেন, টাকা ত খোলাং-কুঁচি,—টাকাতে আছে কি? একটা সাদা চাক্তি বৈত নয়? এই টাকার জন্য মানুষ মারামারি করে, রক্তপাত করে,—এই টাকার জন্য বন্ধু-বিচ্ছেদ হয়, পিতাপুত্রে বিবাদ হয়, মনুষ্যত্ব নষ্ট হয়। টাকাটা বড় বদ্ জিনিস—উহা ঘরে রাখিতে

নাই। অতএব কর বিদায়—টাকা। সম্মুখে সুপাত্র দেখিলেই—দাও টাকা। বস্ত্রহীনের বস্ত্র কিনিয়া দাও; ক্ষুধার্ত্তের ক্ষুধা-শান্তি কর; পিপাসার্ত্তকে শীতল জল দাও।

কালাচাঁদ দানের উপযুক্ত পাত্র বুঝিয়া দান-কার্য্য আরম্ভ করিলেন। কাহাকেও চারি-আনা, কাহাকেও আট-আনা, কাহাকেও একখানা কাপড়, কাহাকেও দুইসের চাউল,—কালাচাঁদ সাধ্যমত দিতে লাগিলেন। কালাচাঁদকে ঠকাইতে লাগিল,—কেবল বন্ধু-পতিতপাবন পরামাণিক। যাহার কোন অভাব নাই, পতিতপাবন তাহাকে ছেঁড়া কাপড় পরাইয়া, দুঃখী সাজাইয়া, কালাচাঁদের নিকট আনিত; কালাচাঁদ সেই দুঃখীকে যাহা দিতেন, পরামাণিক তাহার অৰ্দ্ধেক ভাগ তাহার নিকট হইতে লইত। কালাচাঁদ এ সব বুঝিয়াও, তাহা উপেক্ষা করিতেন। যে মাছটীর মূল্য পাঁচ আনার অধিক নহে, পতিত সেই মাছটী বাজার হইতে হাতে করিয়া আনিয়া বলিত, "বন্ধু! তোমার জন্য

৫১৭॥ বার আনা সাড়ে তিন পয়সা দিয়া এই মাছটী এনেচি!—এর কি আমি দাম নিতে পারি?—তুমি খেয়ো।” বলা বাহুল্য, কালাচাঁদ সে মাছের কথিত মূল্যত দিতেনই, অধিকন্তু সে মাছের বার আনা অংশ উপহার স্বরূপ বিনামূল্যে বন্ধু-পতিতপাবনকে অর্পণ করিতেন।



## অষ্টম পরিচ্ছেদ।

অনন্ত গুণাকর পরামাণিকের আর একটী অন্তরের সাধ ছিল। সে আশা ফলবতী করণার্থ সেই নাপিত-কুল-ধুরন্ধর বহুবিধ বিশেষ চেষ্টা পাইয়াছিল। কিন্তু কিছুতেই সেই প্রাণের সাধ পূর্ণ হয় নাই।

সেটি কি? এমন কিছু বিশেষ বিষয় নয়, যাহার জন্য ঔৎসুক্যের আবশ্যক! এই,—কিঞ্চিৎ মদ এবং বেশ্যা। এই, কি জান্‌লেন্‌,—কালাচাঁদ একটু আমোদ-প্রমোদ করেন, সুখে-স্বচ্ছন্দে হেসে-খেলে বেড়ান—বন্ধু-পতিতের ইহাই ইচ্ছা। কালাচাঁদের এই উঠ্‌তি বয়স্‌,—একটু-আধটু নেশা না করিলে মনের স্ফূর্ত্তি হবে কেন? আর, কালাচাঁদের এই ঘোরতর যৌবনে রমণী ব্যতীত শয্যাগৃহ সজ্জিত হয় কি?—পরমবন্ধু পতিতপাবনের অন্তরে অহর্নিশি এ সকল কথাই উদিত হইত।

এ দিকে যোটকতাকার্য্যে পতিতপাবন কথঞ্চিৎ পারদর্শী ছিলেন। তাঁহার নানাস্থানে যাতায়াত ছিল, নানা নর-নারীর সহিত আলাপ ছিল।

কালাচাঁদ এক দিন পতিতের ঘরে একাকী বসিয়া আছেন, এমন সময় একটী মেয়েমানুষ আসিয়া দাঁড়াইল। বয়স্ তার বছর বাইশ। আধ্-ঘোম্‌টা দেওয়া। পরণে রাঙ্গাপেড়ে শাড়ী। হাতে বেলওয়ারি চুড়ি। কপালে একটী টিপ্। মেয়েটী আসিয়া দাঁড়াইতে না-দাঁড়াইতে, পতিত দৌড়িয়া আসিয়া কালাচাঁদকে বলিল,—"বন্ধু! এই ঝীটিকে অনেক কষ্টপেয়ে খুঁজে খুঁজে এনেচি। বড় ভাল মেয়ে এটী। অতি-ঈ সৎ। মুখে কথাটী নেই। যখন যা বল্‌বে, তখনি তাই কর্‌বে! ঘর ঝাঁট দেওয়া, বাসন মাজা, বিছানা করা, পান সাজা—সকল কাজই এঁর দ্বারা হবে। জাতিতে সৎগোপ। বন্ধু! প্রত্যহ উনুন ধরিয়ে রেঁধে খেতে তোমার কষ্ট হয়,—তা, ইনি থাক্‌লে, সে সব কিছু দেখতে হবে না! আর, তোমার

ঘুম থেকে উঠে রাত্রে দু-তিনবার তামাক খাওয়া আছে; তা, এঁকে বল্‌লে,—ইনি এই ঘরের দাওয়ায় রাত্রে শুয়ে থাক্‌তে পারেন,—আর উঠে উঠে তোমাকে তামাক-টামাক সেজে দিবেন। এঁকে কিছু বেশী মাইনে দিয়ে, রাত-দিনের ঝী ক'রে রাখ্‌লে, বন্ধু! তোমার আর কোন ক্লেশ হবে না।"

স্ত্রীলোকটীকে সম্মুখে রাখিয়া পতিত এই ভাবেই বক্তৃতা করিতে লাগিল। কালাচাঁদ সেই ঝীটির ত্রিভঙ্গ ঠাট্ দেখিয়াই অবাক্! সহসা তাঁহার মুখ হইতে বাক্যস্ফুরণ হইল না। তখন সাবেক বৃদ্ধা ঝীর গুণকীর্ত্তন ব্যাপারে, পতিতের বক্তৃতা-স্রোত প্রবাহিত হইতে থাকিল,—"হরের মা-বেটী বুড়ী, বজ্জাত,—কাণে শুন্‌তে পায় না, চোখে দেখ্‌তে পায় না,—সে, বাসন মাজ্‌লে থালে এঁটো সক্‌ড়ি থাকে। সে, বেলায় আসে, সন্ধ্যে হ'লেই চলে যায়,—বাজারের পয়সা চুরি করে। বন্ধু! তাকে আর কাজ নেই,—তার বদলে এঁকে রাখ। এ মেয়েটী আমাদের জানা-শুনা লোক,

বিশ্বাসী। স্বভাব-চরিত্তির ঠাণ্ডা। মুখে কথাটী নেই। এমনি এঁর মেজাজ যে, কোন কাজ ক'র্‌বো না, বা কত্তে পার্‌বো না—এমন কথাটী এঁর মুখ দিয়ে কখন বেরুবে না। আর কি জান, বন্ধু! তোমারও ত সুখ-অসুখ আছে। তা, সুখে-অসুখে ইনি তোমার বেশ যত্ন-সেবা কর্‌তে পার্‌বেন।"

স্ত্রীলোকটীর চেহারা দেখিয়া এবং পতিতের কথা শুনিয়া ক্রমশ কালাচাঁদের চক্ষুস্থির! পতিত অবিরত মিথ্যা কথা কয়, ঠকাইয়া পয়সা লয়, চোরাই মাল কিনে,—এ সকল কালাচাঁদের সহ্য হইয়াছিল। কিন্তু এই বঙ্কিম-ভাবাপন্না, চারুচন্দ্রবদনা, কুটিলায়ত-নয়না স্ত্রীমূর্ত্তিকে দাসীরূপে রক্ষা করিবার প্রস্তাবে তিনি মহাবিরক্ত হইয়া উঠিলেন। এটী কি গৃহদাসী, না স্বর্গের উর্ব্বশী? ইহাকে যেরূপ সু-পরিষ্কার, সু-পরিচ্ছন্ন, রঙ্গরাগে পরিপূর্ণ দেখিতেছি, তাহাতে এ আমার বাসন মাজিবে কি!—ইহারই যে, বাসন মাজিতে আমার ইচ্ছা হয়! দণ্ডবৎ! কাজ নাই আমার এমন ঝীয়ে!

কালাচাঁদ এরূপ ভাবিলেন বটে, কিন্তু পতিতকে যে হঠাৎ চটাইয়া দিবেন, বা ঝগড়া করিবেন,—এরূপ তাঁহার ইচ্ছা ছিল না। কি কথা বলিবেন, কি উত্তর দিবেন,—কোন্ কথা বলিলে, সবদিক্ বজায় থাকে,—কালাচাঁদ বিব্রত হইয়া ইহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন।

পতিত, কালাচাঁদের এপর্য্যন্ত কোন উত্তর না পাইয়া আবার বলিল,—"কি বলো, বন্ধু!—তবে কালথেকেই এই মেয়েটী কাজকর্ম্ম করুক—"

কালাচাঁদের মুখে তথাচ কোন কথা নাই। কালাচাঁদ ভাবিতেছেন, "কি বিপদ্! এ যে মহামুস্কিল কাণ্ড বাধালে দেখ্‌চি—"

কালাচাঁদকে আর অধিকক্ষণ ভাবিতে হইল না। সাবেক ঝী,—সেই হরের মা—সেই বুড়ী, ঘরের ভিতর আসিয়া পড়িল। বলিল, "কুসুমীকে আর, কাল থেকে আস্‌তে বলা কেন? ও এসেচে,—আজ থেকেই কাজ করুক!—আমি এমন চাক্‌রি কত্তে চাই না! গতর থাক্‌লে ঢের চাক্‌রি হবে।

ভগমান জীব দিয়েচেন, আহার দেবেন! কুসুমী তোমাদের এখানে থাকুক্, দিনে-রেতের কাজ কর্‌বে!—”

পতিত নীরব। পতিত ভাবে নাই যে, হরের মা এখনি আসিয়া পড়িবে। পতিতের এখন চিন্তা,—“হরের মা যদি সব কথা শুনে থাকে, তা হ’লে একটা হুলস্থুল বাধাবে। আমি তাকে, চোখে দেখ্‌তে পায় না, কাণে শুন্‌তে পায় না,—অবিশ্বাসী-চোর বলেচি;—এ-সব কথা যদি হরের মা শুনে থাকে, তবে সে এখনি একটা কুরুক্ষেত্তর ক’র্‌বে।” বলা বাহুল্য, হরির মাতার শুভাগমনে পতিত নিতান্ত অপ্রতিভ এবং একান্ত বাক্‌শক্তি-হীন হইল।

হরির মা। অগো গেরস্থরা! তোমরা জিনিস-পত্তর বুঝে নাও,—আমি চল্লেম! নাও না গো,—দেরি কচ্চো কেন?

কালাচাঁদ মনে মনে বড়ই আনন্দিত হইলেন। মনে মনে বলিলেন,—এ সঙ্কটে, এ ঘোর বিপদে

শ্রীমধুসূদনই আমাকে রক্ষা করিয়াছেন। হরির মা! এ জন্মে আমি তোর ধার শুধিতে পারিব না। তুই আজ আমাকে বড় বাঁচিয়েচিস্! তুই ভয় করিস্ না! দুকথা বলে নে! আমি তোকে একখানা পাটের কাপড় কিনে দিব।

এতাবৎকাল পর্য্যন্ত হরির মা কোন উত্তর না পাইয়া, অঙ্গের বসন কতকটা উন্মোচন করিয়া, আঁচল ঝাড়া দিতে আরম্ভ করিল। মুখে বলিতে লাগিল, "এই নাও,—তোমরা দেখে নাও—আমি কোন জিনিসপত্তর নিয়ে যাচ্চি কি না?—এই দেখো, এই দেখো—"

ক্রমশ অঙ্গবস্ত্র ঈষৎ অধিক মাত্রায় অঙ্গ-মুক্ত হইতে থাকিল!

পতিত ভাবিল, এ যে ঘোরতর বিপদ্ দেখিতেছি। মাগী ক্রমশ উলঙ্গ হইবে না কি? তখন আর নীরব থাকিতে না পারিয়া, পতিত অগত্যা হরির মাকে একটু মিষ্ট কথায়, আমৃতা-আমৃতা করিয়া বলিল,—"হরির মা! তুমি অমন কর্‌চো

কেন? তোমাকে ত এখন কেউ কিছু বলে নাই! তুমিও থাকো না কেন?"

হরির মা। আমার আর কি থাকা-থাকির বয়স্ আছে? আমার হাতে চুড়ি নেই, দাঁতে মিসি নেই, ঠোঁটে আল্‌তা নেই,—আমার দ্বারা বাসন-মাজা, ঘর ঝাঁট দেওয়া চল্‌বে কেন? আমার যদি মিহি শাড়ী থাক্‌তো, পেটো-পাড়া চুল থাক্‌তো,—বেঁকে বেঁকে কোমর ঘুরিয়ে চলা থাক্‌তো,—তা, হ'লে আজ আমি সোহাগের ঝী হতেম! আমাদের তিন-কাল গিয়ে এক-কালে ঠেকেচে, কাজেই আমরা কাণা, কালা, চোর হয়েচি,—কাজের বা'র হয়েচি। থাকুক্ কুসুমী,—ওর এখন চোখ ভাল, সব দেখ্‌তে পাবে; কাণ ভাল, সব শুন্‌তে পাবে;—ওর এখন হাতের রস আছে, বাসন মাজ্‌বে ভাল; ওর এখন পেটে বুদ্ধি আছে, হাটবাজার কর্‌বে ভাল;—অলো! কুসুমী! আয়্‌লো!—এখন তোর ঘর, তোর দোয়ার হ'লো,—জিনিস-পত্তর সব দেখে-শুনে বুঝে নিবি আয়!

নবাগতা ঝী-রূপিণী মহিলাটীর নাম—কুসুম-কামিনী। হরির মায়ের হঠাৎ এরূপ আগমনে এবং এরূপ বাক্‌বিতণ্ডায় সে-ও কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ এবং বিব্রত হইল। কিন্তু হরির মায়ের এখন ঝগড়ার মুখ,—হঠাৎ কোন কথা কহিলে মিছা গণ্ডগোল বাধিয়া যাইবে,—এই ভাবিয়া কুসুম এতক্ষণ নীরব ছিল। কিন্তু হরির মা ক্রমশ যখন কুসুমের উপরই সকল কথা ঝোঁক দিয়া বলিতে আরম্ভ করিল, তখন আর সে নীরব থাকিতে পারিল না। ধীর অথচ কঠোরস্বরে বলিল,—"হেঁগা, তুমি আমাকে নিয়ে অমন কর্‌চো কেন? তুমি যা ব'ল্‌বে, ওঁদিগে বল—"

হরির মা। তোকে আবার কে কি বল্লে যে,—তোর অম্‌নি ঠ্যাকার হ'লো! সোয়াগে যে, গলে পড়েচিস্ লো!—গরবে যে আর গা ধরে না!—

কুসুম তখন সুর একটু রুক্ষ করিল। উচ্চ-কণ্ঠে বলিল, "তুমি আবার আমার আজ সোয়াগটা

কিসে দেখ্‌লে গ্যা? তুমি যাকে তাকে, যা-না-তাই বল!—কেন বল দেখি?

হরির মা তখন একটা বিকট মুখভঙ্গি করিয়া বলিয়া উঠিল,—"অ্যাঁ—কুসুমিলো!

তুই অত করিস্‌ না—অত করিস্‌ না।
সজ্‌নে খাড়ার মত যেন ঝুলে পড়িস্‌ না॥

পাড়া-মজানি! পাড়া-ঢলানি! সাতপাড়া মজিয়ে আবার এখানে মজাতে এসেচিস্‌! তোকে কে না জানে লো! তোর সকল কথা বল্‌তে গেলে প্রাচিত্তির কত্তে হয়।"

কুসুমকামিনী তখন 'দশ-বাই-চণ্ডী' হইলেন। নিজমূর্ত্তি ধরিয়া বাহু নাড়িয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"তোকেই বা না জানে কে লো? ডাইনি! রাক্কুসি! তোর মেয়ের খপর্‌ রাখিস্‌—সে এখন কোন্‌ মুলুকে আছে? আগে তোর ঘরের খপর্‌ রাখ্‌গে লো,—তার পর পরের খপর্‌ রাখিস্‌—"

হরির মা তখন গাছ-কোমর বাঁধিয়া, চক্ষু দুইটী

কপালে তুলিয়া, দন্তে দন্ত ঘর্ষণপূর্ব্বক কিড়্-কিড়্-কিড়্-কিড়্ শব্দ করিয়া, আঁউ-আঁউ রবে, কাল-ভৈরবীর ন্যায় তিড়ীং তিড়ীং নৃত্য করিতে লাগিল। রণভূমি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল।

পতিতপাবন 'হতভম্ব'। মুখে কথা নাই, চক্ষের পলক নাই, নাসিকারও বুঝি নিশ্বাস নাই।

কালাচাঁদের অন্তরে কেবল আনন্দ-স্রোত প্রবাহিত। দেহ পুলকে পূর্ণ। তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"নারোদ! নারোদ!"

সমর-প্রাঙ্গণে মুহূর্ত্ত-কাল "তাথেই তাথেই" নৃত্য করিয়া হরির মা বাক্য-বাণ বর্ষণ আরম্ভ করিল,—"অলো হোল্‌সা-মুখী! কটাচুলি! উট্‌কপালী! চেরন্‌-দাঁতী। তোকে আমি ডরাবো না লো—আমি ডরাবো না। যারা তোর সোমত্ত বয়স্‌ দেখে ভয় খায় লো, তাদের কাছে তুই বাক্‌চাতুরী করিস্‌। সে দিন দত্ত-বাড়ী মার-খেয়ে তোর যে পিঠের চাম্‌ড়া উঠে গেছলো-লো!—

চূণে-হলুদ দিয়ে আরাম কল্লে কে-লো? এই, কথায় বলে,—

তিতাক তিতাক তিতাক লো!
তিন-কুড়ি-তিন তোর সোয়ামী লো!!

তাই হয়েচে তোর! তুই আবার কোন্ মুখে কথা ক'স্? ঝেঁটিয়ে তোর বিষ ঝেড়ে দিবো জানিস্!

কুসুমকামিনী তখন ব্যাপার বড় গুরুতর বুঝিয়া, কালাচাঁদকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিল,—"দেখুন, মোশাই! আপনাদের সমুখেই বুড়ী কত অকথা-কুকথা বল্‌চে। আপনারা ওকে থাম্‌তে বলুন,—নহিলে আমার সঙ্গে ওর ভাল হবে না—এখনি একটা কাণ্ড বেধে যাবে।"

হরির মা মুখ ভেঙাইয়া, দাঁত বাহির করিয়া, তালে তালে নাচিতে নাচিতে কুসুমের দিকে অগ্রসর হইয়া,—বলিতে লাগিল, "অলো! মার্‌বি নাকি লো!—তোর গায়ে আজকাল বেশী বল্ বেঁধেচে লো,—বল্ বেঁধেচে!—তোর দলে লোক

ঢের লো,—লোক ঢের হয়েচে!—মার্-না লো,—মার্‌না,—কাঠের সখীর মত অমন দাঁড়িয়ে রইলি কেন? অলো! মেরে হাতের সুখ করে-নে লো—হাতের সুখ করে-নে!—এমন দিন তোর আর থাক্‌বে-না লো—থাক্‌বে না!”

হরির মা এই কথা বলিতে বলিতে ক্রমশ কুসুমকামিনীর নিকটবর্ত্তিনী হইল। কুসুম, বেগতিক বুঝিয়া তুই-চারি পা পশ্চাৎ হটিয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

তখন হরির মায়ের বিক্রম আরও বাড়িল। মুখখানিকে অধিকতর বিকৃত করিয়া খাঁটি বাজখাঁই সুরে আরম্ভ করিল,—“যাস্ কোথা লো—ময়না! পিঠ যে পেতে দিয়েচি লো,—তুই যদি আজ আমাকে না মারিস্, তবে তুই ভেয়ের মাথা খাস্।”

এই বলিয়া হরির মা, কুসুমের গায়ে, পিঠ ঠেকাইয়া দিল।

ইত্যবসরে, পতিতপাবন, বিষম বিভ্রাট উপস্থিত

দুই দাসীর দ্বন্দ্ব।



দেখিয়া, হাঁ—হাঁ রবে দৌড়িয়া গিয়া, তাহাদের উভয়ের সংমিলিত অঙ্গ বিচ্ছিন্ন করিয়া, মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইলেন। তখন কুসুম বলিতেছেন,—"ঠাকুদ্দা! তুমি সরে যাও, পথ ছেড়ে দাও,—ও কেমন হরের মা—বেটা-খাগী!—ওকে আমি একবার বুঝ্‌বো। ওর মুখ দিয়ে রক্ত বার না ক'রে আজ জলগ্রহণ কর্‌বো না!"

এ দিকে হরির মা পতিতকে বলিতেছেন,—"তুমি সুমুখে দাঁড়ালে কেন? সরো বল্‌চি—ও নচ্ছারনী—ভাই-খাগী-আমাকে একবার মারুক্‌,—ওর গতরে তেজ কত,—মগজে ঘী কত,—আমি একবার দেখ্‌বো!—আরে মোর তুমি-রে! যা-নয়-তাই—ঘুঘু দেখেছেন, ফাঁদ দেখেন নি!"

প্রকৃতই এবার রণভূমের শোভা শতগুণে বৃদ্ধি পাইল। দক্ষিণে কুসুমকামিনী, বামে হরির জননী,—মধ্যভাগে শ্রীপতিতপাবন। একদিকে শেয়া-কুল, অন্যদিকে বাব্‌লা,—মধ্যস্থলে খেজুর। এক-দিকে কুক্কুরী, অন্যদিকে শৃগালী,—মধ্যস্থলে বলীবর্দ্দ।

রণভূমির শোভা যতই বৃদ্ধি পায়, পতিতের অবস্থা ততই শোচনীয় দৃষ্ট হয়। রণ-রঙ্গিণী দুইটী মাতঙ্গিনী, পতিত-পেয়ারাবৃক্ষের দুইদিক হইতে দুইটী বাহু-শাখা লইয়া আকর্ষণ, বিকর্ষণ, সম্প্র-কর্ষণ করিতেছেন! আর, ঐ মাতঙ্গিনীদ্বয় যেন বৃংহিতধ্বনি করিয়া মুখে এই কথা বলিতেছেন, "একবার পথ ছাড়িয়া দাও, একবার পথ ছাড়িয়া দাও,—রণভূমে অদ্য রুধিরের নদী বহাইব।" পতিত-পেয়ারাবৃক্ষ দুইটী বাহু-শাখা লইয়া উভয়কেই আটক করিয়া থামাইতেছেন, "ক্রোধ সম্বরণ কর, ক্রোধ সম্বরণ কর,—রক্ষা কর, রক্ষা কর।"

ক্রমে বাহু-শাখাদ্বয় দেহ-স্কন্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার উপক্রম হইল। ঘোররণে মাতঙ্গিনীদ্বয়ের বসনভূষণও শিথিল হইতে আরম্ভ হইল। রণ-সংঘর্ষণে কুসুমকামিনীর দক্ষিণ-হস্ত-স্থিত চুড়ি কতক ভাঙ্গিয়া ভূতলে পতিত হইল। অর্দ্ধ-ভগ্নভাবে কতক চুড়ি হস্তে সংলগ্ন রহিল। সেই অর্দ্ধভগ্ন চুড়ির আঘাতে পতিতের কপাল দিয়া

রুধির-ধারা নির্গত হইতে লাগিল। এইরূপে এই মহাসমরে ক্রমশ পতিতের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইতে থাকিল। পরামাণিকের প্রাণ ওষ্ঠে আসিল।

কালাচাঁদ এখনও ধীরভাবে বসিয়া আছেন। সম্মুখে যে এরূপ প্রলয়-ঝড় বহিয়া যাইতেছে, তৎপ্রতি তাঁহার যেন দৃক্‌পাত নাই। বোধ হয় তিনি এখনও মনে মনে মহানন্দ উপভোগ করিতেছেন। কিন্তু ইহা কি আমোদ-কৌতুকের সময়? তিনটা লোক খুনোখুনি করিতেছে, ইহা দেখিয়া কে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে? কালাচাঁদের এখন মজা দেখাটা—উচিত হইয়াছে কি?

উচিত হউক, আর অনুচিতই হউক—কালাচাঁদ যোদ্দা মজাই দেখিতে লাগিলেন। ওদিকে সমর-রঙ্গ-ভঙ্গ ক্রমশই চরমমাত্রায় উঠিতে চলিল। কুসুমের কবরী খসিল, চুল এলাইয়া পড়িল, টীপ্ মুছিয়া গেল,—অধিক আর কি বলিব,—অঙ্গের বন্ধনও বিধ্বস্ত হইল!

এদিকে হরির মাতা, বক্ষঃস্থল অনাবৃত করিয়া সজোরে স্বয়ং তদুপরি চপেটাঘাত করিতে লাগিলেন। সেই চটাচট্, পটাপট্, সটাসট্ শব্দে পল্লী প্রকম্পিত হইল। আর তিনি তদুপলক্ষে মুখে বুলি ধরিলেন,—"অলো কুসমী-লো!—মার্-না—মার্-না—মার্না-লো!—তুই যদি না মারিস্, তুই ভেয়ের মাথা কড়মড়িয়ে চিবিয়ে খাস্ লো!" হরির মাতার তখন গলা ভাঙ্গিয়াছে,—কণ্ঠস্বর স্পষ্টরূপে উচ্চারিত হইতেছে না।

আর সে-দিকে,—অর্থাৎ পতিতপাবনের দিকে, যাহা ঘটিল, তাহা আর বলিবার উপযুক্ত নহে। সে এক বিতিকিচ্ছি বীভৎস ব্যাপার! কর্ণে অঙ্গুলি দিতে হয়, চক্ষু মুদ্রিত করিতে হয়, নাসারন্ধ্র রুদ্ধ করিতে হয়। সমর-সংঘর্ষণে শ্রীল শ্রীযুক্ত পতিতপাবন পরামাণিক মহাশয়ের কোমরের কাপড় খুলিয়া ভূমিতে পড়িয়া গেল। সেই সঙ্গে পতিতও ভূমিতে পড়িয়া লুটাইতে লাগিলেন। কুসুমকামিনী অমনি বেগে সে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত

হইলেন। হরির মাতাও কুসুমের সম্মুখীন হইবার আশায় সে গৃহ পরিত্যাগের উদ্‌যোগ করিলেন।

তখন কালাচাঁদ দৌড়িয়া গিয়া হরির মাকে আটকাইলেন; আর তাহাকে ঘরের বাহির হইতে দিলেন না। মুরুব্বি-আনা-ভাবে বুড়ীকে ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন—"যাঃ বুড়ী বেটী! ঐ ঘরের ভিতর ব'স্‌গে যা! আর ঝগড়া করে না!"

বৃদ্ধাকে ঠেলিয়া দিয়া, কালাচাঁদ বাহির হইয়া ঘরে শিকল দিয়া রাখিলেন। সম্মুখে কুসুমকে দেখিয়া তিনি মধুর-গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—"কেন মা! আর, বিবাদ কর? দেখ্‌চো ত ঐ বুড়ী ভারি দুষ্ট!—তুমি ঘরে যাও।"

কুসুম তখন কাঁদ-কাঁদ-সুরে বলিল, "আপনি মোশাই! ভদ্র লোক। এর বিচার করুন,—আমার কোন দোষ আছে কি না?"

কালাচাঁদ কহিলেন,—"না।"

কুসুম তখন হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল,—বলিল, "ঐ বুড়ী কি না দশজনের

সাক্ষাতে আমার ভাই-কেটে গাল দেয়! নাপিত-ঠাকুদ্দা আমাকে কি না ডেকে এনে এই অপমান কল্লেন?”

কালাচাঁদ। মা! তুমি আর কেঁদো না—ঘরে যাও।

কুসুমকামিনী তখন সর্ব্বরকমে পরম আপ্যায়িত হইয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে, গালি দিতে দিতে, গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল।

বলা বাহুল্য, হরির মাতাই ঝী-রূপে কালা-চাঁদের গৃহে রহিল। পতিতপাবন অবশ্যই কিঞ্চিৎ দুঃখিত হইল; তবে মুখ ফুটিয়া কালাচাঁদকে কোন কথা বলিতে পারিল না।



## নবম পরিচ্ছেদ।

প্রথম চেষ্টা বিফল হইল। তার পর দ্বিতীয় চেষ্টা। কালাচাঁদের গঙ্গাস্নান যাইবার পথে, কয়েক ঘর বেশ্যার বাস ছিল। পতিতের শিক্ষামত বারাঙ্গনাগণ কালাচাঁদকে দেখিয়া মুচকি হাসিত, ইশারা-ইঙ্গিত করিত, কখন বা স্পষ্টত বলিত, "আসুন্ না মোশাই!—এক ছিলিম তামাক খেয়ে যাবেন!" কালাচাঁদ ঈষৎ হাসিয়াই সে কথা উড়াইয়া দিতেন।

একবার পতিতের ষড়যন্ত্রে বার জন বিলাসিনী গঙ্গার ঘাটে কালাচাঁদকে ঘেরাও করিয়াছিল। কালাচাঁদ বিব্রত হইয়া বলিলেন, "আমাকে পথ ছাড়িয়া দাও।" প্রধানা বেশ্যা উত্তর দিল,— "যদি কথা রাখো, তবে পথ ছাড়িব।"

কালাচাঁদ। আমার সঙ্গে তোমাদের আবার কি কথা?

প্রধানা। কোন গূঢ় কথা না থাকিলে কি আর আমরা তোমার শরণ নিতে এসেচি?

কালাচাঁদ মনে মনে ভাবিলেন, "বাবা! বেশ্যা-গুলা বলে কি?—আমার আবার শরণ নিতে চায়!"

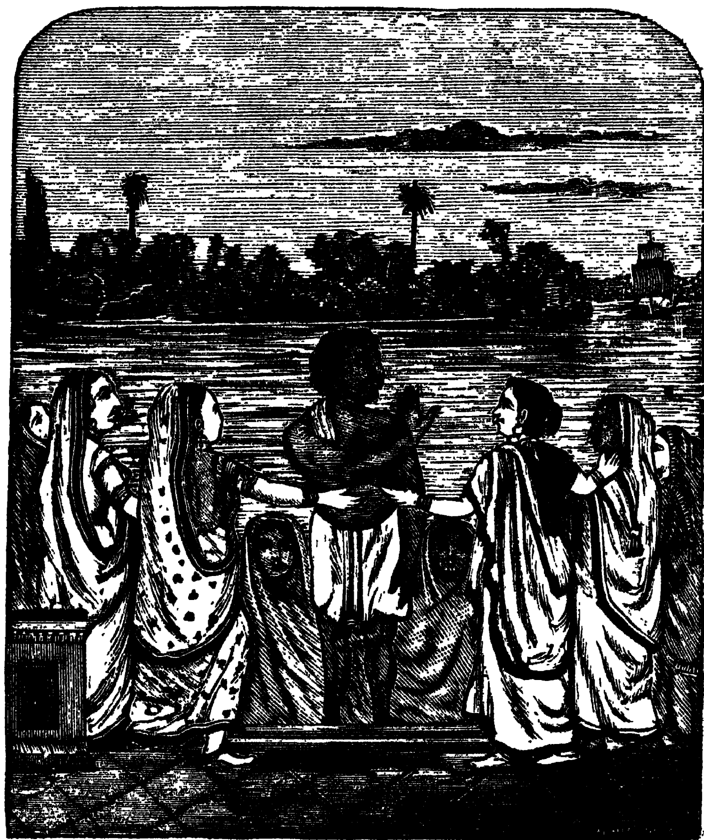
প্রধানা। কথাটী রাখ্‌বে ব'লো—তা' হলে বলি। নহিলে বেণাবনে মুক্তা ছড়িয়ে লাভ কি?

কালাচাঁদ। কি কথাটাই আগে বল না কেন? রাখারাখির কথা পরে হবে।

প্রধানা। (হাসিয়া) তা হবে না,—আমাদের এক একটী কথার দামই লাখ টাকা। কথাটী শুনে নিয়ে শেষে তুমি ফাঁকি দিয়ে চলে যাও—আর, আমরা ফ্যাল-ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে থাকি আর কি? বাঃ বাঃ মজা বেশ! আগে তুমি গঙ্গা-সাক্ষাতে প্রতিজ্ঞা করিয়া স্বীকার কর যে, নিশ্চয় আমাদের কথা রক্ষা করিবে,—তবে ত আমরা সে কথা বলিব!

কালাচাঁদ। আমি এত সাত-সতের কাণ্ড

বার-নারী বেষ্টিত কালাচাঁদ।



করিতে, প্রতিজ্ঞা করিতে, গঙ্গাজলি করিতে পারিব না। তোমাদের ইচ্ছা না হয়,—সে কথা আমাকে বলিয়া কাজ নাই। তার পর, তোমরাও ঘরে যাও, আমিও ঘরে যাই। স্নান ক'রে ভিজে কাপড়ে এমনভাবে কতক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিব?

প্রধানা। কাপড় তোমার ভিজেই হউক, শুক্‌নাই হউক,—পথ আমরা কিছুতেই ছাড়িতেছি না। আমরা এই তোমাকে ঘেরিয়া রহিলাম,—তোমার শক্তি থাকে, আমাদিগকে ভেদ করিয়া যাও।

কালাচাঁদ মনে করিলেন, "এ পর্য্যন্ত এমন বিপদে ত কখনও পড়ি নাই। এমন অঘটন ঘটনাও ত কখন দেখি নাই। হুগলীটা বড়ই বিশ্রী সহর। এখানে মেয়ে মানুষে পুরুষের মাথায় চড়ে বেড়ায়!—এই মেয়েগুলাকে ঠেলিয়া-ঠুলিয়া ভেদ করিয়াই বা যাই কিরূপে? যদি একটা মেয়েকে ধাক্কা মারিয়া ফেলিয়া দিয়া যাইতে চাই,—আর যদি বাকী এগারটী মেয়ে

আমার ঘাড়ে পড়িয়া আমাকে আটকাইবার চেষ্টা করে,—তখন ত একটা বিপরীত-ব্যাপার ঘটিয়া উঠিবে। মেয়েগুলার সঙ্গে ধরাধরি, হুটাপাটি, পাছড়া-পাছড়ি, বাধিয়া যাইবে। হয় ত আমার দারুণ আঘাতে কোন মেয়েটার হাত ভাঙ্গিবে, নাক দিয়া মুখ দিয়া, রক্ত পড়িবে, কাহারও বা চুল এলাইয়া ছিন্নভিন্ন হইবে,—এমন কি, কেহ বা বিবস্ত্রাও হইতে পারে। এখন, এই বেশ্যাগুলার নিকট হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায় কি?—আচ্ছা, ইহাদের সেই গূঢ় কথাটাই কি,—তাহা শুনা যাক্ না কেন?—তার পর যা হয় হ'বে। প্রথমত একটা কৌশল করা যাক্।"

এই ভাবিয়া কালাচাঁদ বলিলেন, "আচ্ছা, আমি তোমাদের কথা রাখিব,—প্রতিজ্ঞা করিতেছি। কিন্তু তোমাদিগকেও আমার নিকট এক সত্য করিতে হইবে—"

প্রধানা। আমরা সকলেই রাজী আছি। তোমার কথা শুন্‌বো,—এ কোন্ বড় কথা? তুমি

হ'লে আজ আমাদের ইষ্টদেবতা!—তুমি যা বলিবে, তাই করিব।

কালাচাঁদ। এইবার তবে তোমাদের সেই গূঢ় কথা বল।

প্রধানা। অদ্য রাস-পূর্ণিমা। আমরা একটী কৃষ্ণের অনুসন্ধান করিতেছিলাম। তোমাকে সেই পদে বরণ করিলাম। অদ্য রাসলীলায় তোমাকে শ্রীকৃষ্ণ সাজিতে হইবে।

কালাচাঁদের শরীর দিয়া ঘাম ঝরিতে লাগিল। বাজারের বেশ্যাগুলা বলে কি? ইহাদের এত সাহস বাড়িল কিসে? আমার সঙ্গে আলাপ নাই, চাক্ষুষ কথাবার্ত্তা নাই, পরিচয় নাই, ইহারা পথে যাইতে আমাকে দেখে এই মাত্র—তথাচ ইহাদের এত আস্পর্দ্ধা হইল কিরূপে? অবশ্যই ইহারা কাহারও নিকট হইতে সাহস পাইয়া, আমাকে এরূপ-ভাবে বেষ্টন করিয়াছে। বোধ হয়, বন্ধু পতিতপাবনেরই এই কাজ। যাহাই হউক,—উদ্ধারের এখন উপায় কি? ইহারা যদি বারজন স্ত্রীলোক না হইয়া,

বারজন মল্ল-বেশধারী অস্ত্রশস্ত্রে ভূষিত দস্যু হইত,—তাহা হইলে আমি এত ভয় করিতাম না।—এত কেন, ইহার সিকির সিকি ভয়ও করিতাম না। এখন মেয়ে-মানুষের গায়ে হাত তুলিব কেমন করিয়া?—শুধু হাত তোলা নয়,—প্রকৃত-প্রস্তাবে মল্ল-যুদ্ধ আরম্ভ করিতে হইবে। তাহাই বা কেমন করিয়া করি? বিষম লেঠা দেখিতেছি। যা'হোক,—এখন কথা কাটাকাটিই খানিক চলুক,—ভবিষ্যতে অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহাই ঘটিবে।

তখন কালাচাঁদ ধীরভাবে বেশ্যাগণকে বলিবেন, "আমি আমার প্রতিজ্ঞামত নিশ্চয়ই কৃষ্ণ সাজিতেছি। কিন্তু তোমরা এখন তোমাদের সত্য রক্ষা কর।"

প্রধানা। প্রভুর যা আজ্ঞা হয়, এ দাসীগণ এখনি তাই করিতে সম্মত।

কালাচাঁদ। আমার কথা এই,—'তোমরা পথ ছাড়িয়া দাও, আমি ঘর যাইব।'

তখন বেশ্যামণ্ডলী হইতে একটা কল-কল-

হল-হল ধ্বনি উত্থিত হইল। কিন্তু প্রধানা নায়িকা, সকলকে থামাইয়া কালাচাঁদের উদ্দেশে যোড়হাতে বলিল, "তুমি কি ফাঁকি দিয়ে পালাবে হে শ্যাম?—তুমি কি চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে যাবে হে?—তা'ত হবে না!—পলাতে ত দিব না! আমরা প্রেমডোরে বেঁধে তোমায়, হৃদি-কারাগারে রাখ্‌ব বার মাস।"

এ কথা শুনিয়া কালাচাঁদের পায়ের নখের মুড়ি হইতে মাথার চুলের ডগ পর্য্যন্ত একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিল। তিনি একটা বিভীষণ হুঙ্কার ছাড়িয়া ঊর্দ্ধে যেন দশহাত লাফাইয়া উঠিলেন।

তার পর কি ঘটনা ঘটিল, তাহার প্রকৃত ইতিহাস নাই। পতিত বলেন,—"কালাচাঁদ কয়েক জন বেশ্যা দেখিয়া, ভয়ে, গঙ্গাজলে ঝাঁপ দিয়া পড়েন,—শেষে সাঁতার কাটিয়া, গঙ্গা পার হইয়া গরিফায় গিয়া আশ্রয় লন।" কালাচাঁদ বলেন, "আমি লাফাইয়া বীর-পুরুষের ন্যায় চলিয়া

আসি,—বেশ্যারা আমার গামছা-খানি ধরে,—তা, গামছা-খানি তাহাদের হাতেই থাকিয়া যায়।” সে যাহা হউক—এ প্রসঙ্গ লইয়া বিস্তর মতভেদ আছে।

পতিতপাবনের সব আশাই অন্তর্হিত হইল। কালাচাঁদ, কামিনীর মোহিনী মায়ায় ভুলিলেন না, কাম-ফাঁদে পড়িলেন না। পতিতের দুঃখের অবধি রহিল না।•



## দশম পরিচ্ছেদ।

কারাবাসের পূর্ব্বে, কালাচাঁদ মদ, ভাঙ্গ, গাঁজা, আফিং, চরস, চণ্ডু, সিদ্ধি, তামাক—সব কয়টা নেশাই যথানিয়মে করিয়াছিলেন। তবে সুবিধার মধ্যে এই ছিল,—তিনি কোন নেশারই অধীন হইয়া পড়েন নাই। যখন যে মাদক-দ্রব্যটা সম্মুখে পাইতেন, তখন তাহাই সেবন করিতেন। দশদিন কোন নেশা করিতে পারিলেন না,—তাহাতেও ভ্রূক্ষেপ নাই। তামাকটা কিন্তু প্রায় অষ্ট-প্রহরই আবশ্যক হইত।

কারাগারেও কালাচাঁদের কিছু-কিছু নেশার কার্য্য চলিয়াছিল। কারামুক্তির পর কালাচাঁদ সব নেশাই এককালে ছাড়িয়া দিলেন;—কেবল কয়েক দিনমাত্র গাঁজা এক-আধ-ছিলিম খাইতেন। শেষে তাহাও তিনি পরিত্যাগ করিলেন। রহিল কেবল, গুড়ুক-তামাক,—সেটা যেন সঙ্গের সাথী।

কালাচাঁদের গাঁজা-ত্যাগের কথা শুনিয়া, পতিত-

পাবনের ডাক-ছাড়িয়া কান্না পাইল। শতপুত্রের শোক পতিত ভুলিতে পারে,—কিন্তু কালাচাঁদের গাঁজাত্যাগের কথা ভুলিবার নহে। হে গাঁজে! তুমি ত্বরিতানন্দ! তোমার মহিমায় মুহূর্ত্তমধ্যে কর-তলে স্বর্গ পাই। তুমি আছ বলিয়াই, এ-সংসার, মরুভূমি হইয়াও, ফুল্লকমলদলপূর্ণ কেলীকুঞ্জবন। তোমার সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় পাইয়া, পথশ্রান্ত পথিক সর্ব্বকষ্ট ভুলিয়া যায়। তোমার সাহায্যে, ব্যোমযান-ব্যতীত, আকাশপথে উড়িতে পারি। তোমারই সাহায্যে, বাষ্পীয়-শকট-ব্যতীতও, অল্পসময় মধ্যে সমগ্র ভারতবর্ষ-ভ্রমণে সর্ব্বতোভাবে সক্ষম! তুমি যখন দেহে বাস কর, তখন ক্ষুধা থাকে না, তৃষ্ণা থাকে না, বাসনা থাকে না;—শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-পুরুষের ন্যায়, আত্মারাম হইয়া কেবল এক অক্ষয়, অদ্বিতীয়, অনির্ব্বচনীয় পরমানন্দ উপভোগ করি। তখন কেবল মনে হয়,—

আমি কার, কে আমার
কারে ভাবিরে আপন।

এ-হেন গঞ্জিকা-বিহ্নে পরামাণিকের কান্নাই ত আসিতে পারে। কান্না ত সামান্য কথা,—নিদারুণ-যন্ত্রণায় পতিতের দেহ যে, চৌষট্টি-খণ্ডে বিভক্ত হয় নাই,—ইহাই আশ্চর্য্য। পতিত, প্রকৃত বীর-পুরুষ বলিয়াই, এ দুরন্ত দৈব-বেগ সহ্য করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন; অন্য কোন সামান্য মানব হইলে, সেই দিনই তাহার অপমৃত্যু ঘটিত।

অভিমান ভরে পতিত গোটা একদিন-কাল কালাচাঁদের সহিত কথা কহে নাই। কিন্তু কালা-চাঁদ যে, পরামাণিকের প্রাণের বন্ধু;—কথা না কহিয়া কতক্ষণ তিষ্ঠিবে?

পরদিন প্রাতে তামাক খাইতে খাইতে পতিত খুব গম্ভীর স্বরে কালাচাঁদকে বলিল;—“বন্ধু! তুমি কাজটা ভাল কর নাই! বড়ই কু-কাজ হইয়াছে।”

কালাচাঁদ ব্যাপার তত তলাইয়া বুঝেন নাই—একটু চম্‌কাইয়া উঠিলেন; বলিলেন,—“এঁ,—আমি এমন কি খারাপ কাজ করিয়াছি?—কিছুই ত মনে হয় না!!”

পতিত। আমি একা নই,—পাড়ার সকলেই বলিতেছে,—অতি মন্দ কাজ হইয়াছে। আমার নিজের জন্য বলি নাই;—বন্ধু! তোমার ভবিষ্যৎ ভাবিয়াই বলিতেছি।

কালাচাঁদ। বলই-না শুনি,—মন্দ কাজটা কি?

পতিত। এই, এখানকার জল একরকম,—সেখানকার জল একরকম;—এখানকার খাওয়া একরকম, সেখানকার খাওয়া একরকম! তা, সহ্য হবে কেন? শেষে একটা ঘোরতর কাণ্ড উপস্থিত হবে দেখ্‌চি!

কালাচাঁদ। অত ভূমিকায় কাজ কি?—খুলেই বল না,—কি হয়েচে?

পতিত। তোমাকে আর সে সব কথা বলেই বা কি হবে?—তুমি কি বুঝালে, বুঝ যে,—বুঝাব? তখন এক দিন-কাল ছিল,—পতিত যা বল্‌তো, তাই হ'তো। এখন পতিত্‌কে মানে কে? পতিতের কথা শুনে কে? বন্ধু! তোমারই

ভালোর জন্য বলি। এতে আমার কিছু স্বার্থ নাই!

কালাচাঁদ। আঃ,—কি তোমার কথা আছে, সোজা-সুজি বল্‌বে ত বল!—নহিলে আমি এখনি উঠে চল্লেম। ধান্‌ভান্‌তে আমি এত শিবের গীত শুন্‌তে পারি না।

পতিত। তা, পতিতের কথা এখন শিবের গীত হবে বৈ কি? পতিতকে এখন বেঙেও লাথী মেরে যায়! কিন্তু পতিত যা বলে, তাই ফলে। পতিত বলেছিল, বাঁড়ুয্যেদের নারকেল গাছে বাজ্ পড়্‌বে, তা, এক মাস সইলো না, গাছে বাজ্ পড়্‌লো!

কালাচাঁদ মনে মনে হাসিলেন। বাহ্যিক গম্ভীর-ভাব দেখাইয়া, মিষ্ট বাক্যে কহিলেন,—"বন্ধু! তুমি রাগ কর কেন? আমি তোমার কোন্ কথা শুনি নাই?—তুমি কোন একটা কথা বলিলে, তাহা কি আমি না শুনিতে পারি?"

পতিতের মন একটু প্রসন্ন হইল। বলিল,—

"তোমাকে আমি পর ভাবি না। বন্ধু! তোমার উপর কেমন যে একটা ঝোঁক্ পড়েচে, তা, তোমার 'ভালাই' আমাকে আট-পহরই ভাব্তে হয়। এই হুগলী-সহরটী এক পক্ষে বেশ ভাল হ'লেও, অন্য পক্ষে বড় খারাপ। বন্ধু! দেখ্চো না, এখানে অধিকাংশ লোকেরই পায়ে গোদ, গলায় গর্গণ্ড, হাতে ফুলো! কেন এমন হয়?—এখানকার জলে একটা দোষ আছে।"

কালাচাঁদ। জলে দোষ থাক্লে ত, আমার এতদিন গোদ, গর্গণ্ড—সবই হ'তো। বন্ধু! তুমি জানো ত,—দু-ঘণ্টার কম আমার স্নান হয় না—অন্তত এক শ ডুবের কম আমার তৃপ্তি হয় না,—ডুব-সাঁতার-কেটে অন্তত একবার মাঝ-গঙ্গায় না গেলে আমার পূর্ণ-স্নান হয় না,—এ সবই ত তুমি জানো;—তবে কেন তুমি বল্চো,—এখানকার জলে দোষ আছে? জলে যদি কোন দোষ থাক্তো, তা হলে আমি আর এতদিন বাঁচতাম না।

পতিতপাবন এইবার তত্ত্বজ্ঞ পুরুষের ন্যায়

ওস্তাদিধরণে খুব খানিক হাসিয়া বলিল,—"বন্ধু! তুমি এতদিন ভাল ছিলে বটে, কিন্তু এখন তুমি আপনার পায়ে আপনি কুড়ুল মারিয়াছ।"

কালাচাঁদ। (হাসিয়া) আমার ঘরে কুড়ুলই নাই,—তা, আবার পায়ে চোটাব কেমন করে?

পতিত। বন্ধু! আমি তোমাকে তামাসা কর্‌চি না,—

কালাচাঁদ। তা, আমি কি দোষটা করেচি,—চোক-কাণ বুজে তাই বলেই ফেল না কেন?

পতিত। আচ্ছা, একটা কথা আগে তুমি বল;—এ দুদিন তোমার খিদে হচ্চে কেমন? প্রাতে চোঁয়া ঢৈ-ঢেঁকুর মারে কি না? সন্ধ্যার পর হাই উঠে কিনা? শরীরটা কেমন ঝিম্‌-ঝিম্‌ করে কিনা?

কালাচাঁদ এইবার পতিতের মনোগত অভিপ্রায় বুঝিয়া, মনে-মনে অনন্ত-হাসি হাসিয়া, উদর পূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। খানিক হাসি, উদর উপ্‌ছাইয়া, মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

কালাচাঁদ উত্তর দিলেন, "এ দুদিন ক্ষুধা কম

হওয়া দূরে যাউক, বরং বৃদ্ধিই রাখিয়াছে। বেলা দুইপ্রহরে ভাত খাইলাম,—আবার দুইটা না-বাজিতে-বাজিতেই ক্ষুধার আরম্ভ। শেষ-রাত্রে উঠিয়া আবার ক্ষুধা। "হাই"—কখন্ উঠে তা'ত কিছুই জানি না।—

পতিত। পিদিম্‌টা নিবিবার পূর্ব্বে একবার খুব জ্বলে উঠে বটে!—ওটা খিদে নয়—দিষ্টি-খিদে!—আর দু-চার দিন বাদে, বন্ধু! তুমি আমার কথা জান্‌তে পার্‌বে!

কালাচাঁদ। দু-চার দিন পরে আমার কি রোগ হবে,—তা, আমি এখন থেকে কেমন ক'রে জান্‌বো—

পতিত। জান্‌তে হয়!—সংসারে থাক্‌তে হ'লেই, জান্‌তে হয়;—

কালাচাঁদ। আমি ত কিছু জান্‌তে-টান্‌তে পার্‌চি না,—তুমি কিছু জেনে থাক,—বলে দাও।

পতিত। বলাবলিই আর কি আছে?—তুমি ত কারু কথা শুন্‌বে না—বলেই বা কি ফল আছে?

তবে তোমার কষ্ট দেখ্‌তে পারি না—তাই বল্‌তে হয়।

দুঃখমিশ্রিত ক্রোধভরে পতিতপাবনের অবস্থান।

কালাচাঁদ। বন্ধু! তুমি বলো,—বলো!

পতিত। এই, তর্‌শু থেকে তুমি একেবারে তামাক খাওয়াটা উঠিয়ে দিলে!—তা, আমি একজন ঘরে রয়েচি, আমাকে ত একবার জিজ্ঞেস্ কর্‌লেও হতো! আমি দেখ্‌চি;—তুমি আপন মনে কাজ কর্‌চো—আমি সে সময় বাধা দিব কেন?—আমি মজা দেখ্‌চি,—এখন ও কর্‌চে করুক;—এই দু-দিন পরে, শেষে আমার কাছে গুড়িয়ে আস্‌তে হ'বে! তখন পতিতকে না-হ'লে কারু চলবে না! তবে কি না,—বন্ধু! তোমার সঙ্গে আমার বড়ই ভালবাসাটা হয়েচে,—তাই এ কথা আজ না ব'লে থাক্‌তে পার্‌লাম না।

হাস্যরস-ময় কালাচাঁদ দেশ-কাল-পাত্র বুঝিয়া বলিলেন,—"বন্ধু! আমি কি সাধ ক'রে 'বড়-তামাক্‌টা' একবারে ছেড়ে দিয়েচি? এর ভিতর

অনেক গোপনীয় কথা আছে! আমার বিছানার উপর একদিন একটা জবাফুল পড়েছিল, তাহা কি তুমি দেখেছিলে?”

পতিত। দেখি নাই,—ঝীয়ের মুখে শুনেছিলাম বটে।

কালাচাঁদ তখন কথার সুর নরম করিলেন,—বলিলেন, “সে’ত ফুল নয়,—মা-কালীর অনুগ্রহ।”

কালাচাঁদ আর কথা না কহিয়া, পতিতের কাণে কাণে কি কথা বলিলেন।

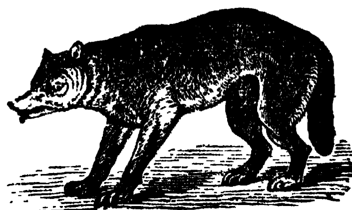
পতিত শিহরিয়া উঠিল। তাহার নয়নদ্বয় বিস্তৃত হইল। মুখটা ‘হাঁ’ হইয়া গেল। পতিত বলিল, “বল কি, বন্ধু! বল কি?”

কালাচাঁদ। এর সবটাই সত্য। তাই ‘তামাক’ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলাম।

পতিত প্রকৃতিস্থ হইয়া, খানিক ভাবিয়া বলিল, “মা-কালীর আজ্ঞে, অবিশ্যি লঙ্ঘন করিতে নেই;—কিন্তু কথক-ঠাকুর সে-দিন বলেছিলেন, শরীরটে আগে, ধর্ম্মটা পরে।”

কালাচাঁদ। কি কর্‌বো বল, বন্ধু!—শরীর রক্ষা করিতে গেলে; মা-কালীর আজ্ঞে লঙ্ঘন করিতে হয়। কাজেই তামাকটা ত্যাগ করিতে হইল।

পতিত আর কোন কথা কহিল না। ত্বরায় তথা হইতে উঠিয়া গেল। ঘরেও আর তিষ্ঠিল না। 'ভাঁড়' বগলে করিয়া রাজপথে বাহির হইয়া পড়িল। আপন-মনে যদৃচ্ছাক্রমে যাইতে যাইতে বোধ হয় এই ভাবিল,—"কালাচাঁদ ত গাঁজাটা ছাড়িয়া দিল। এর পর যদি মাছটা ছাড়িয়া দেয়, তাহা হইলে এ সংসারে থাকাই বৃথা!"



# একাদশ পরিচ্ছেদ।

রমণী এবং গঞ্জিকা উভয়ই কালাচাঁদ-কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইল,—তথাচ পতিতপাবন ক্ষান্ত নাই। কালাচাঁদ কিসে মদিরা-সুধায় আসক্ত হন,—তাহাই তখন তাহার ভাবনার বিষয় হইল। কালাচাঁদের যদি কোন দিন সর্দ্দি করে, পতিত উপদেশ দেয়,—"বন্ধু! একটু মদ খাও।" গ্রীষ্মে যদি কালাচাঁদের ঘাম ঝরে, পতিত উপদেশ দেয়,—"বন্ধু! একটু মদ খাও।" বসন্তে যদি মলয় বায়ু বহে, পতিত উপদেশ দেয়,—"বন্ধু! একটু মদ খাও।" যে দিন আমোদ-প্রমোদ-সঙ্গীত হয়, সে দিন পতিত উপদেশ দেয়,-"বন্ধু! একটু মদ খাও।" যে দিন কোন কারণে শোক-দুঃখ ঘটে, সে দিনও পতিত উপদেশ দেয়,—"বন্ধু! একটু মদ খাও।" যে দিন বর্ষা-বাদলে বাটীতে চাল-কড়াই-ভাজা হয়, পতিত সে দিনও

উপদেশ দেয়,—"বন্ধু! একটু মদ খাও।" কালাচাঁদ কিন্তু কিছুতেই মদ খাইলেন না।

পতিত এক এক দিন, কালাচাঁদের সম্মুখে, অন্যের সহিত, সুরা-বিষয়ে বিচার করিতে বসিত। পতিত বলিত,—"মদে কোন দোষ নাই, তবে অধিক মাত্রায় খাইলেই দোষ। মদ মহৌষধ-স্বরূপ। জ্বর-বিকার হইয়াছে;—ঔষধ মদ। পাঁচ-ক্রোশ পথ চলিয়া পা-দুটী অসাড় হইয়াছে;—ঔষধ মদ। কেহ পড়িয়া গিয়া হাত ভাঙ্গিয়াছে,—ঔষধ মদ। মদ অতি মূল্যবান্ সামগ্রী,—উহা যেরূপ উচ্চ-অঙ্গের জিনিস, তাহাতে উহার দাম আরও অধিক হওয়া উচিত। তবে মাত্রা অধিক হইলে, মদে দোষ ঘটে। তা, মাত্রা অধিক হইলে, কোন্ জিনিস্‌টায় দোষ না ঘটে? সন্দেস অতি উপাদেয় বস্তু। খুব বেশী খাও, পেট ফাঁপিবে,—আরও খুব বেশী খাও, পেট ফাটিয়া যাইবে। সেইরূপ মদে কোন দোষ নাই, মাত্রায় কেবল দোষ আছে। মদে কোন দোষত নাইই,

অধিকন্তু মদ সুপবিত্র। মদ দেবতার ভোগে লাগে। মদ মা-কালীর প্রসাদ! মদ যদি অপবিত্র অশুদ্ধ, হেয় দ্রব্য হইত, তাহা হইলে মা-কালী উহা তাঁহার পানীয় বলিয়া গ্রহণ করিবেন কেন? সুতরাং যে দিক্ দিয়াই দেখ, মদে কোন দোষ নাই।”

এত বিচার বিতর্ক শুনিয়াও, কালাচাঁদ মদ ধরিলেন না। পতিতের দুর্ভাবনার সীমা রহিল না। পতিতের ইচ্ছা হইল, কালাচাঁদের যদি একবার জ্বর-বিকার হয়, তাহা হইলে উহাকে মনের সাধে মদ খাওয়াই। কিন্তু জ্বর-বিকারত কাহারও হাত-ধরা নয়! পতিত ভাবিল, কালাচাঁদ যদি একবার দড়াম্ করিয়া আছাড় খাইয়া পড়িয়া যায়,—হাতে-পায়ে-গায়ে খুব ব্যথা লাগে,—তাহা হইলে বন্ধুকে মদ খাওয়াইবার খুব সুবিধা হইবে। তখন আর কাহারও কথা শুনিব না,—একেবারে জোর করিয়া মুখে মদ ঢালিয়া দিব। কিন্তু কালাচাঁদ পড়েন কিরূপে?

ভাবিতে ভাবিতে পতিতের মনোমধ্যে এক সুযুক্তির কথা উদিত হইল।—"কালাচাঁদ খুব ভোরে উঠিয়া বেড়াইতে যায়। আমি খানিক তেল ফেলিয়া পৈঁঠা পিছল করিয়া রাখি। যাই সে, পৈঁঠায় পা-টী বাড়াইয়া দিবে, অমনি চীৎপাত হইয়া পড়িয়া যাইবে।"

এইরূপ কল্পনা করিয়া, পতিত একসের সরিষার তৈল কিনিয়া আনিল। রাত্রি তৃতীয় প্রহরে উঠিয়া পৈঁঠায় আচ্ছা করিয়া তেল ঢালিয়া দিল। স্বয়ং পতিত, কালাচাঁদের পতন দেখিবার জন্য, জানেলায় মুখটী দিয়া, জাগিয়া বসিয়া রহিল।

কালাচাঁদ প্রভাতে যথানিয়মে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। যথানিয়মে দুপ করিয়া দোয়ার হইতে উঠানে লাফাইয়া পড়িলেন। কালাচাঁদ প্রাতে অন্যের অগোচরে, প্রায়ই লাফ মারিয়াই ভূমিতে অবতরণ করেন। এ সংবাদ পতিত জানিত না। তাই সে, পৈঁঠায় ফাঁদ পাতিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু কালাচাঁদের লম্ফে,

"দূপ্" ইত্যাকার শব্দ হওয়ায়, পতিত নিশ্চয় করিল, বন্ধু অবশ্যই পড়িয়াছে।

তখন পতিত আস্তে-ব্যস্তে এইরূপ হাঁকাহাঁকি করিতে করিতে দৌড়িল,—"কি হে বন্ধু! কি হে বন্ধু!—প'ড়ে গেলে না-কি? আহা-হাঃ—ভারি লেগেচে, ভারি লেগেচে!"

পতিতের অদ্য হঠাৎ এই কাণ্ড দেখিয়া কালাচাঁদ কিছু চমকিত হইলেন। প্রথমত তিনি কোন কথা কহিলেন না।

পতিত স্থির করিলেন,—বন্ধু তবে পড়িয়া মূর্চ্ছা গিয়াছে;—তাই কথা কহিতেছে না।

পতিত উচ্চরবে মূর্চ্ছিত বন্ধুকে সম্বোধন করিয়া আপ্যায়িত করিলেন,—"যাচ্চি, বন্ধু!—যাচ্চি!—কোন ভয় নেই! আমি একেবারে বড় ঔষধের যোগাড় ক'রে নিয়ে যাচ্চি! একটু থামো,—বন্ধু! এই তাকে একপোয়া মায়ের প্রসাদ আছে,—তাই নিয়ে যেয়ে খাওয়ালে, তবে তোমার মূর্চ্ছা ভাঙ্গবে।"

এখনও কালাচাঁদের কথা নাই। তিনি স্থির-বুদ্ধিতে ভাবিতে লাগিলেন,—"আজিকার কাণ্ডখানা কি? প্রিয় বন্ধুটী আজ এমন করে কেন?" কালী-মায়ের প্রসাদের কথা শুনিয়া তাঁহার কতক চমক ভাঙ্গিল। "তবে কি পতিত আজ রাত্রি জাগিয়া আমার পতন প্রতীক্ষা করিতেছিল? 'পড়িলেই গায়ে ব্যথা!—অতএব মদ খাও।'—বন্ধু ত এইরূপ কৌশল-জাল পাতে নাই! আমার পড়িবার জন্য পতিত'ত কোনরূপ কল-কৌশল করে নাই?—ঐ পৈঠায় জল কেন? পাকা কলার ছোবা কেন? কলাপাতার নীচে মটরকলাই কেন? উহা ত জল নয়!—তেল যে!"

কালাচাঁদের মুখে আর হাসি ধরে না। পতিত যখন তাক্ হইতে মায়ের প্রসাদ গ্রহণ-কার্য্যে ব্যস্ত ছিল,—কালাচাঁদ তখন--সেই অবকাশে,—নিঃশব্দে দীর্ঘ-দীর্ঘ পা ফেলিয়া, বাটীর বাহির হইয়া পড়িলেন। দ্রুতপদে একেবারে পাড়া ছাড়াইয়া, গঙ্গার ধার ধরিয়া, চঁচুড়ায় গিয়া উপনীত হইলেন।

এ দিকে পতিত-পাবন ঔষধ-পত্র লইয়া আসিয়া দেখে,—রোগী নাই। পতিত চিন্তা-যুক্ত হইল,—রোগী পলাইল কোথা? এই ভোরবেলা মূর্চ্ছিত কালাচাঁদকে 'নিশিতে' ডাকিয়া লইয়া যায় নাই ত? ঘরে বসিয়া থাকা উচিত নহে,—বন্ধুকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। পতিতও চাদর কাঁধে ফেলিয়া, বগলে গামছা-ঢাকা মহোষধ লইয়া, বন্ধু-অন্বেষণে বহির্গত হইল। পথে যাহাকে পায়, তাহাকেই জিজ্ঞাসে,—"কেহ কি আমার বন্ধুকে দেখেচো।" অনেকে বলিল, "কালাচাঁদকে এই পথেই যাইতে দেখিয়াছি।" বেলা নয়টা পর্য্যন্ত পতিত সমস্ত হুগলী-সহরটা ঘুরিয়া-ঘুরিয়া, বন্ধুকে না পাইয়া, শুষ্কমুখে ঘরে ফিরিয়া আসিল। আসিয়াই দেখিল, কালাচাঁদ স্বয়ং একটা দশসের রুইমাছ কুটিতেছেন। পতিত দেখিয়াই, চমকিয়া উঠিয়া ভাবিল,—"ভূত নাকি?"

কালাচাঁদ স্ফূর্ত্তির সহিত হাস্যমুখে পতিতকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"বন্ধু! আজ কালিয়ে-

পোলাও হবে! পূজারি-ঠাকুর এসে রাঁধ্‌বেন বলেচেন। আজ দেখ্‌বো,—তুমি কত খেতে পারো!

কালাচাঁদকে ব্যথা-শূন্য এবং অক্ষত-দেহ দেখিয়া,—প্রফুল্লমনে মৎস্য-কর্ত্তন-কার্য্যে ব্যাপৃত দেখিয়া, পতিতের প্রকৃতই রাগ হইল। বলিল,—"আমাকে না বলে, না কয়ে,—আজই তুমি এত বড় মাছটা কিন্‌লে কেন? আজ রবিবার—আজ কি মাছ খেতে আছে?

কালাচাঁদ। আজ রবি নয়,—সোমবার।

পতিত। আচ্ছা, না হয় সোমবারই হলো। আমি যদি বাবা তারকনাথের 'সোমবার' আজ থেকেই কত্তে আরম্ভ করি,—তা'হলে ত সব নষ্ট হবে! আমাকে আগে জিজ্ঞেস্ করে—তবে এ সব কাজ আরম্ভ কত্তে হয়!

কালাচাঁদ। জিজ্ঞাসা করিবার সময় পাইলাম কৈ? কাল রাত্রে স্বপ্নে দেখিলাম, কে যেন এক কেঁড়ে তেল কিনে এনে পৈঠেয় মাখিয়ে রেখেচে।

আমি না জেনে, পৈঁঠে দিয়ে নাব্‌তে গেছি। অমনি পা পিছলে পড়ে হাড়গোড় ভেঙ্গে গেল। বাঁচ্‌বার আর উপায় ছিল না। স্বপ্নে কালী মা বল্লেন,—তুই পাড়ার সমস্ত লোক্‌কে যদি কালিয়া-পোলাও খাওয়াস্‌, তবে তোর এই ব্যথা আরাম হবে। এমন সময় আমার ঘুমটী ভেঙ্গে গেল। দেখিলাম, ভোর হইয়াছে। অমনি দূপ করিয়া লাফাইয়া পড়িয়া দৌড়িয়া গিয়া, মল্লিক-কাসেমের হাট হইতে এই মাছটী - কিনে এনেচি। বন্ধু! এতে আর আমার অপরাধ কি?

পতিত। তবে কি তেল আমি ফেলেচি নাকি? যে তেল ফেলেচে, তার সর্ব্বনাশ হো'ক! তিনদিন পেরুবে না—সে মরুক্! তার মুখের গ্রাস উড়ে যাক্।

কালাচাঁদ। বন্ধু! তুমি অমন কর্‌চো কেন?—তোমাকে ত আমি কিছুই বলি নাই।

পতিত। বলতে আর বাকি কি রহিল? এ যে ঝীকে মেরে বৌকে শেখান হ'লো,—এ কি কেউ

আর বুঝ্‌তে পারে না? পতিত জানে সব, বুঝে সব,—তবে পতিত 'মরেচে, কথা কইতে নেই,'—এই যা পতিতের দোষ। যত দোষ, নন্দঘোষ। যে যা করুক্‌, দোষ হবে পতিতের। পতিত আর বেশী-দিন সংসারে থাক্‌বে না,—শীঘ্রই বিবাগী হয়ে, কাশী-বিন্দাবন চলে যাবে। আর এ দেশে আস্‌বে না। বন্ধু! এ বাড়ীত তোমাকেই দান করেচি,—তুমিই ইহা ভোগ-দখল ক'রো।

কালাচাঁদ তখন কার্য্যগতি বুঝিয়া, হাসিয়া উঠিয়া, পতিতের হাত ধরিলেন। বলিলেন, "বন্ধু! আমার উপর কি তোমার রাগ করিতে আছে? এস,—ব'স।"

পতিত বসিলে, কালাচাঁদ তাহাকে স্বয়ং সাজিয়া একছিলিম গয়ার তামাক খাওয়াইলেন। তাম্রকূট-ধূমে দেহ পরিশুদ্ধ এবং প্রফুল্লিত হইলে, কালাচাঁদ পতিতের হাতে ৪৲ চারিটী টাকা দিয়া বলিলেন, "বন্ধু! পোলায়ের জন্য চাল, ঘি, মসলা, কিনে নিয়ে আস্‌তে হবে।"

পতিত টাকা চারিটী লইয়া ট্যাকে রাখিল। মনে মনে সন্তুষ্ট হইল বটে, কিন্তু মুখে একটু কৃত্রিম কোপ দেখাইয়া বলিল,—“পতিত এখন বাজার কত্তে পাল্লে হয়! হুঁ—হুঁ!—বন্ধু! তুমি এই যে, মাছটী নিজে কিনে নিয়ে এসেচো, এটী যদি আমার হাত দিয়ে কিনতে, তা'হলে নিশ্চয়ই ১৲ এক টাকা সস্তা হ'তো। পাঁচগণ্ডা পয়সা—দস্তুরিই কেটে নিতেম! আর, তুমি কি মাছ চেনো? এ যে পশ্চিমে মাছ! এর যে ভাল সোয়াদ হবে না! ভারি ঠকিয়েচে! হাঃ হাঃ!—তোমার পয়সা সস্তা,—যা-ইচ্ছা তাই কর;—তবে নিতান্ত অন্যায়-গুলা দেখতে পারি না, তাই দু-কথা বলি! আমার চুপই আচ্ছা! কি জান, বন্ধু! পুকুরের দিশি-মাছ কেন্‌বার দরকার হ'লে, হাটে-বাজারে যেতে নেই! আগে জেলেবাড়ী যেতে হয়। গিয়ে, জেলেনীর সঙ্গে পরামোশ কত্তে হয়। সেই জেলের মেয়েকে মিষ্টি ক'রে দু-কথা বুঝিয়ে বল্লে, মাছটীও ভাল হয়, দু-পয়সা সস্তায়ও পাওয়া যায়।—”

কালাচাঁদ। এই হুগলী সহরে যার-ই মাছের দরকার হচ্চে, সে-ই কি অম্‌নি জেলেবাড়ী যেয়ে জেলেনীর সঙ্গে মিষ্টি কথা কচ্চে?

পতিত। বন্ধু! তোমাকে কথায় কেউ পারবে না।

এই কথা কহিয়া পতিত বাহুনাড়া দিয়া বাজার করিতে চলিল। বহু-বিলম্বে বাজার হইতে ফিরিল। জিনিস-পত্র রাখিয়া, কালাচাঁদকে বলিতে লাগিল,—"গেলাম, মো'লাম,—উঃ, আর বাঁচিনা; বেলা তিতীয় পহর হইল, মুখে জল দিই নাই! বন্ধু! তোমার জন্য খেটে খেট গেলাম।"

বাজার করায় যতই কষ্ট হউক, সে দিন পতিত পরিতোষরূপে আহার অর্থ, এবং আনন্দ প্রাপ্ত হইল। কিন্তু সে আনন্দ ক্ষণপ্রভাবৎ ক্ষণিক। শুস্ক-মূল ছাড়িয়া পাতায় জল সেচনে ফল কি?



## দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

পতিতপাবন সর্ব্বপ্রকারে বিফল-মনোরথ হইল। অবশেষে অগত্যা কালাচাঁদকে একরকম ছাড়িয়াই দিল। মনে মনে ভাবিল, "কালাচাঁদকে সংশোধন করিবার আর উপায় দেখি না। লোকটা একবারে খারাপ হইয়া, বহিয়া গিয়াছে। নূতন ব্যক্তিকে লওয়ান সহজ;- কিন্তু কালাচাঁদ বকেয়া-ঘাগী—উহাকে বশ করা বড়ই বিষম। কালাচাঁদ পুরাণ-পাপী,—ভুক্তভোগী—সিদ্ধ-পুরুষ। বাঁশ পাকিয়া ঝন্‌ঝনে হইয়াছে,—উহাকে কি আর এখন নোয়ান যায়?"

পতিত, কালাচাঁদ সম্বন্ধে নির্ভরসা হইল বটে, কিন্তু আশা ছাড়িতে পারিল না। আশা,—বড়ই দুষ্টা,—মায়াবিনী। এই, এবেলা ছাড়িয়া দেয়, আবার ওবেলা গ্রহণ করে। পতিত ভাবে, "এত লোকের বড় বড় রোগ আরাম হইল,—কালাচাঁদের

কি এ রোগ আরাম হইবে না? এত ভাল ভাল ঔষধ দিলাম, কিন্তু কিছুতেই ত ফল হইল না। দোষটা ঔষধের কি?”

পতিত এইরূপ ভাবে, আর থাকে। কালাচাঁদও অন্যরূপ ভাবেন, আর পতিতের গৃহে অবস্থিতি করেন।

কালাচাঁদ কারাগার হইতে যে টাকাগুলি আনিয়াছিলেন, তাহা ক্রমশ ফুরাইতে লাগিল। আয় নাই, কেবল ব্যয়;—সঞ্চিত অর্থ কতক্ষণ টিকে? এক কলসী-জল,—গড়াইতে-গড়াইতে কতক্ষণ থাকে? আমদানি নাই কেবল রপ্তানি,—রাজার ভাণ্ডার টুটিয়া যায়;—কালাচাঁদের ভাণ্ডার ত কোন্ ক্ষুদ্র,—ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র!

টাকা ফুরায় আর কালাচাঁদ ভাবেন—‘কুচ পরোয়া নেহি’; আমি এখন সৎ, সাধু, নিস্পাপ,—সুতরাং আমার কষ্ট কিছুতেই ঘটিবে না। ভগবান নির্দ্দোষ, নিষ্কলঙ্ক ব্যক্তিকে কষ্ট দিবেন কেন? আমার নিজের ভাবনা আমি

কিছুই ভাবি না; আমার একটা পেট পূর্ণ করিতে কতক্ষণ? একবেলা মুটেগিরি করিয়া আসিলেও আমার উদর পরিপূর্ণ হইবে। এর জন্য আর চিন্তা কি?

আচ্ছা, কোন কাজ-কর্ম্ম করিলে ক্ষতি কি? অধিক অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিলে, সর্ব্ব-দিকেই সুবিধা। হাতে অর্থ থাকিলে দরিদ্রের দুঃখ মোচন করিতে সমর্থ হইব।

কৃপণ ব্যক্তি 'যখের' ধন আগুলিয়া রাখে; নিজেও খায় না, অপরকেও খাইতে দেয় না। কত কাঙ্গালী কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফিরিয়া যায়; তবু কৃপণ ব্যক্তি তাহাকে একটী পয়সাও দেয় না। দেশের সমস্ত টাকা যদি প্রত্যেক ব্যক্তির হাতে সমভাগে থাকে, তাহা হইলে কাহারও কোন কষ্ট হয় না। কোন ব্যক্তি টাকার উচ্চ পাঁজা সাজাইয়া, তাহার উপর রত্ন-সিংহাসনে বসিয়া আছেন; কেহ বা ভূতলে, কণ্টকাকীর্ণ গর্ত্তের নীচে দাঁড়াইবার স্থান পাইতেছে না! কেন এমন হয়?

ভগবান কি একচক্ষু, দয়ামায়া-হীন? কাহারও খাইয়া খাইয়া পেট ফুলিয়া উঠিয়া, ফাটিয়া যাইতেছে; কাহারও না-খাইতে পাইয়া, আঁত মরিয়া গিয়া, পেটের চাম্ড়া পিঠে ঠেকিতেছে! ঈশ্বর এমন বিসদৃশ নিয়ম কেন করিলেন?

যাই-হউক, আমার অর্থ হইলে, দুঃখী দরিদ্রকে দান করিয়া তাহার সদ্ব্যয় করিব। একটা চাক্‌রীর চেষ্টা দেখাই ভাল। না,—ব্যবসা করাই সর্ব্বোৎ-কৃষ্ট! ব্যবসা-বাণিজ্য করিতে মূলধন কোথা পাইব? আমার ত সঙ্গতি কিছুই নাই,—কেমন করিয়া ব্যবসা আরম্ভ করিব? প্রথম চাকুরীই করিব। কিছু মূলধন জমিলে শেষে ব্যবসা আরম্ভ করিয়া দিব।

কিন্তু চাকুরির জন্য যাই কোথা? কাকে গিয়া বলি? কেইবা আমার দুঃখে দুঃখী হইয়া, আমার চাকুরি করিয়া দিবে?

আমার ঠাকুরদাদার হুগলীসহরে প্রবল প্রতাপ। তিনি প্রভূত ধনশালীও বটেন। বহু-ব্যক্তি তাঁহার

কথার বশ। তিনি মনে করিলে, একদিনেই—এক দণ্ডেই আমার একটা চাকুরি করিয়া দিতে পারেন। বিশেষ, তাঁহার অপেক্ষা এ সংসারে আমার আত্মীয় আর কেহই নাই। আমার মা নাই, বাপ নাই, ভাই নাই,—কেহই নাই;—আপনার বলিতে আছেন কেবল,—ঐ একমাত্র ঠাকুর-দাদা। তাঁহার কাছে যাই, তাঁহার পায়ে ধরি, কাঁদি,—বলি,—'আমি বড় হতভাগ্য। আমাকে ক্ষমা করুন। আপনি না রাখিলে, আর কে স্থান দিবে? আপনিই আমার সব। আপনি ভিন্ন আর আমার কে আছে? আপনার চরণে শরণ লই-তেছি,—আমাকে পায়ে ঠেলিবেন না।' ঠাকুর-দাদাকে একথা বলিতে ত কোন দোষ নাই! কল্য তাহাই গিয়া বলিব।

কিন্তু ঠাকুরদাদা আমায় চরণে স্থান দিবেন কি? শুনিতে পাই, তিনি আমার উপর খড়্গ-হস্ত। শুনিতে পাই, আমার নামে তিনি ঘৃণায় নাসিকা সঙ্কুচিত করেন। শুনিতে পাই, আমার

ছায়ায় তিনি লাথী মারেন। শুনিতে পাই, আমাকে নাতী বলিয়া পরিচয় দিতেই তিনি লজ্জিত হন। যদি কেহ পীড়াপীড়ি করিয়া ধরে, তাহা হইলে বলেন,—'কেলে-ছোঁড়া আমার জ্ঞাতির জ্ঞাতি, তস্য জ্ঞাতি,—গ্রামসম্পর্কে নাতী হইলেও হইতে পারে।' বিধাতার কেন যে এই বিড়ম্বনা, তাহা'ত বুঝিতে পারি না। ইহজন্মে আমি তাঁহার কখন মন্দ করি নাই, মন্দ ভাবিও নাই,—তথাচ কেন-যে তিনি আমার উপর এরূপ বিদ্বেষভাবাপন্ন,—ইহার গূঢ়রহস্য ভেদ করিতে কিছুতেই সক্ষম নহি।

যখন বর্দ্ধমানে আমি দায়রা-সোপরদ্দ হই; তখন শুনিয়াছিলাম, ঠাকুরদাদা আমাকে জেলে পূরিবার জন্য, আমার বিরুদ্ধে মোকদ্দমার তদ্বির করিতেছেন। প্রকৃত কথা বলিতে কি,—আমি এ কথা তখন তিলার্দ্ধও বিশ্বাস করি নাই। কোথা হুগলী, আর কোথা বর্দ্ধমান,—মধ্যে বিশ ক্রোশ পথ ব্যবধান। এতদ্দূরে, হুগলীতে অবস্থিতি করিয়া,

ঠাকুরদাদা আমাকে যে নষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে বর্দ্ধমানে লোক পাঠাইয়া ষড়্যন্ত্র করিবেন,—এ কথা কাহার মনে স্থান পায়? বিশেষ, আমি ঠাকুরদাদার আপনার-লোক—স্নেহের পাত্র,—আর, কোন কালে তাঁহার সহিত বিবাদ নাই, বচসা নাই,—কেনই বা তিনি আমার অনিষ্ট অনুসন্ধানের চেষ্টা করিবেন? কাজেই তখন আমি ঠাকুরদাদার তদ্বিরের কথা বিশ্বাস করিতে পারি নাই; হাসিয়াই উড়াইয়া দিয়াছিলাম। কিন্তু এখন-যেমন শুনিতেছি, বুঝিতেছি,—তাহাতে আমার স্থির-বিশ্বাস,—ঠাকুরদাদা বর্দ্ধমানে আমার বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই তদ্বির করিয়াছিলেন। তাই ভাবি,—কেন এমন হইল?

আচ্ছা, ঠাকুরদাদা প্রকৃতই আমার উপর বিরূপ কি না,—তাহা'ত একবার স্বয়ং সশরীরে বুঝিয়া আসা ভাল। কেবল শুনা-কথায় ঠাকুরদাদার উপর এরূপ অভিযোগ আনা ত উচিত নহে। একবার তাঁহার কাছে যাই না কেন? যাইয়া স্বচক্ষে একবার দেখা ভাল। তিনি ত বাঘ নন

যে, আমাকে দেখিলেই অমনি গিলিয়া ফেলিবেন। আর, আমাকে গ্রাস করেই বা কে?

যাওয়া উচিত। যাইব। কল্যই যাইব। কাল-বিলম্বে ফল নাই।

এইরূপ চিন্তা করিয়া, কালাচাঁদ বন্ধু-পতিত-পাবনকে কহিলেন, "বন্ধু! আমি এক জায়গায় বেড়াতে যাচ্চি। তুমি যাবে কি?"

পতিত। কোথা?

কালাচাঁদ। ঠাকুরদাদার বাসায়।

পতিত পূর্ব্বমুখ হইল। ঊর্দ্ধপানে চাহিল। চাহিয়া, যুক্তকরে, প্রণাম করিতে লাগিল। বলিল,—"দণ্ডবৎ! দণ্ডবৎ! ঈস্! সকালে উঠেই ঐ নাম! আজ অন্ন হবে না।"

কালাচাঁদ। (হাসিয়া) কেন? কেন?—তাঁর কি এতই অপরাধ?

পতিত! বন্ধু! তুমি জান না। মাছ সম্বুরবে, তা তেল দেবে না। ঠিক্ যেন মড়াপোড়ার গন্ধ উঠে। আলু-ভাতে খাবে, তা নুন দেবে না। ঐ

পাকা বুড়ো পিঁপ্ড়ের গা-টিপে গুড় বা'র করে;—ওর কি মুখ দেখ্তে আছে?

কালাচাঁদ। বন্ধু! ঠাকুরদাদার উপর তুমি অত চট্‌লে কেন?

পতিত। আমিই না হয় চটেচি! তোমারই বা আজ অত ভক্তি উথ্‌লে উঠ্‌লো কেন? নাতীকে বাগে পেলে ঠাকুদ্দা এখনি ঘাড়ের রক্ত চুষে খান!—সে নাতীর আজ আর আদর দেখে বাঁচি না।

কালাচাঁদ। আমি যা বল্‌বো,—বন্ধু তার ঠিক উল্টোটী বল্‌বে! বন্ধুর সঙ্গে কোন পরামর্শ ক'রে,—সুখ হয় না। যাহোক আর কোন কথায় কাজ নেই,—চল, বন্ধু! আমার সঙ্গে ঠাকুদ্দার বাসায় চল।

পতিত। আমি ত যাবোই না; তোমাকেও সে কুস্থানে যেতে দিব না। সে লোকটা খুনে। আমাদিগে দেখ্‌লেই, মেরে-ধরে হাড়-গোড় ভেঙ্গে চূর্ণ ক'রে দিবে। বাপ্! সে খানে কি আমি কাঁচা-মাথাটা দিতে যাবো?

কালাচাঁদ। (হাসিয়া) সে ভয় তোমার নাই!

আমাকে মারে কে? আমাকে খুন করিতে অন্তত পাঁচ-শ লোক চাই। ঠাকুদ্দার ঘরে পাঁচজন দরোয়ান আছে বৈত নয়! এক-এক কীলে আমি পাঁচজনকে পাঁচ দিকে শুইয়ে রেখে আস্‌বো। তোমাকে সে সব কিছু চিন্তা কর্‌তে হবে না। যদি তেমন তেমন বাধে,—

পতিত। (সভয়ে) না বন্ধু! আমি যাবো না,—আমাকে ক্ষমা কর!

আজ প্রায় দেড় বৎসর হইল, পতিত ঠাকুর-দাদার গৃহে জুতা খাইয়াছিল। সেই চর্ম্ম-পাদুকা-প্রহার-রূপ-ভীতি পতিতের হৃদয়ে এখনও অষ্ট-প্রহরই উদিত হয়। কাজেই সে, ঠাকুরদাদার নিকট যাইতে একান্ত অসম্মত।

কালাচাঁদ কিন্তু ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিনি মনে মনে হাসিয়া বলিলেন, "বন্ধু! তা হবে না! তোমাকে আমার সঙ্গে যেতেই হবে! তোমাকেই সেখানে দরকার। আমি একা গেলে যদি হ'তো, তা'হলে এতক্ষণ আমি চলে যেতাম।"

পতিতই ভয়ে কাঁপিয়াই আকুল। কাকুতি-মিনতি করিয়া বলিল "হেঁই বন্ধু! তোমার পায়ে পড়ি। তুমি আমাকে সেখানে নিয়ে যেয়ো না। আমি গেলেই খুন হবো।"

পতিতের একটী গাভী ছিল। পতিত বলিত, গাভীটী সুরভী-জাতীয়। জাতিতে যাহাই হউক, পতিত প্রাণ-খুলিয়া গরুটীর সেবাযত্ন করিত,—যেখানে যা-কিছু পাইত, গাইকে আনিয়া খাওয়াইত। কোঁচার খুঁট দিয়া গোরুর গা মুছাইয়া দিত। লোকের নিকট প্রকাশ করিত,—"গাভী মা-ভগবতী। যে ঘরে গোরু নাই, সে ঘর শ্মশান। আমি যে এই গাইটীকে এত ভক্তি করি, তাহা দুধের জন্য নহে;—মায়ের সেবার জন্য—পরকালের জন্য।" দুগ্ধের জন্য গো-সেবা না করিলেও, গাভীটী খুব দুধ দিত। খুব ভক্ত হইলেও, পতিত মা-ভগবতীর সেই দুধ বাজারে বেচিত।

পরম ভক্ত পতিতপাবন, শণ কিনিয়া, ঢেরায়

দড়ী কাটিয়া, সম্প্রতি স্বয়ং স্বহস্তে গোরুর জন্য একগাছি দড়া ভাঙ্গিয়াছিল। প্রকৃতই সে দড়াগাছটী মোটা এবং শক্ত। গত কল্য, সে দড়া পতিত, বন্ধুবান্ধবগণকে দেখায়;—বলে;—"ইহাতে পাকের এরূপ কৌশল আছে যে, ইহা একবারে বজ্র হইয়াছে। দশটা হাতী একত্র হইয়া টানিলেও, এ দড়া ছিঁড়িবে না। তোমাদের মধ্যে যদি কেহ ইহা ছিঁড়িতে পার, তাহা হইলে আমি তাহাকে পাঁচ টাকা দিব।"

একে একে সকল বন্ধু দড়া পরীক্ষা করিল। দড়া ছিঁড়িতে না পারিয়া সকলেই পতিতের নির্ম্মাণ-কৌশলের প্রশংসা করিতে লাগিল। শেষে পতিত, কালাচাঁদকে বলিল,—"বন্ধু! তুমিত লোহার শিকল ছিঁড়িয়া থাক,—এই দড়াগাছটী একবার ছেঁড় দেখি—দেখি, কেমন তোমার শক্তি! এ দড়া স্বয়ং পতিতের বুড়ো-আঙ্গুলের টীপুনি দিয়ে ভাঙ্গা,—কার সাধ্য ছেঁড়ে?"

কালাচাঁদ হাসিলেন। মনে মনে ভাবিলেন,

"পতিত অর্দ্ধপাগল। ও মনে করে, কেবল গায়ের জোরেই শিকল ছেঁড়া যায়, দড়া ছেঁড়া যায়, কবাট ভাঙ্গা যায়, দ্বিতল গৃহ হইতে লাফাইয়া পড়া যায়। কিন্তু তাহাত নয়। অবশ্য গায়ের জোর কিছু চাই বৈকি?—কিন্তু গায়ের জোর ছাড়া আর একটা জোর আছে, যাহার দ্বারা সকল কার্য্য সুসম্পন্ন হয়। সেই জোরের নাম কৌশল-বোধ, হিসাব-জ্ঞান, তুকতাক, এবং অভ্যাস। আমি মনে করিলে, অনায়াসেই এ দড়া ছিঁড়িতে পারি। কিন্তু এত লোকের সাক্ষাতে সে বাহাদুরি দেখাইয়া ফল কি? লাভের মধ্যে, পতিতের এত সাধের দড়াগাছটী নষ্ট হইবে।"

এইরূপ ভাবিয়া কালাচাঁদ হাসিতে হাসিতে উত্তর দিলেন,—"না, বন্ধু!—এ দড়া কি আমি ছিঁড়তে পারি?—আমার মত এক-শ লোক এলেও পার্‌বে না!"

পতিত। তবে তোমার কিসের শক্তি?

গতকল্য এইরূপই কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। অদ্য

যখন পতিত, ঠাকুরদাদার বাসায় যাইতে ভীত হইল, তখন কালাচাঁদ নিজ পরাক্রম দেখাইয়া পতিতের সাহস বৃদ্ধির জন্য, দোয়ার হইতে সেই দড়াগাছটী লইয়া, এক হেঁচ্‌কাটানে ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। পতিত অবাক্। এত পরিশ্রম-লব্ধ, প্রাণসম দড়াগাছ্‌টীকে ছিন্ন হইতে দেখিয়া, সত্যসত্যই পতিতের চক্ষে জল আসিল। একে, সে, ভয়ে অস্থির, তার উপর দড়ার শোক! শোক বলিয়া শোক!—মহাশোক! দেহ হইতে দক্ষিণ বাহু বিচ্ছিন্ন হইলেও, পতিতের এত শোক হইত না।

সুখের মধ্যে এই যে, শোক-সামগ্রীটী অধিকক্ষণ পূর্ণমাত্রায় তিষ্ঠে না। একটু সুস্থ হইয়া পতিত ভাবিল, "কালাচাঁদ ভীম, না, ভগদত্ত? এমন আশ্চর্য্য শক্তি ত আমি কোথাও দেখি নাই!"

কালাচাঁদ দড়া ছিঁড়িয়া হাসি হাসি মুখে বলিলেন, "বন্ধু! দেখ্‌লে ত আমার গায়ে জোর কত! এখনও কি আমার সঙ্গে ঠাকুদ্দার বাসায়

যেতে তোমার ভয় হয়? যদি ভয় হয়, তবে খুলে বল;—আরও একটা 'শক্তির পরিচয় না-হয় দেখাই!"

পতিত কিংকর্ত্তব্যজ্ঞানহীন। হৃদয়-কমল আন্দোলিত। সে, এইভাবে ভাবিতে লাগিল,—"অদ্যকার কালরাত্রি কি আমারই জন্য পোহাইয়াছিল? যদি আজিকার দিন বাঁচি, তাহা হইলে পতিত বোধ হয় এক-শ কুড়ি বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকিবে। বন্ধুকে যদি বলি, আমার এখনও ভয় আছে, তাহা হইলে বন্ধু হয় ত এখনি আর একটা বিতিকিচ্ছি কাণ্ড করিয়া ফেলিবেন। হয় ত বাই-ঠুকিয়া আমার বড় ঘরের দেওয়ালটা ভঙ্গিয়া দিবেন। হয় ত আমার এই দো-ফলা আমগাছটা সজোরে উপ্ড়াইয়া ফেলিবেন। হয় ত জোর দেখাইবার জন্য, আমাকেই ঊর্দ্ধে এক-শ হাত উচ্চে ছুড়িয়া ফেলিয়া, লুফিয়া লইবেন। আমাকে রামে মেলেও মেরেচে, রাবণে মেলেও মেরেচে। বন্ধু এখন যা বলেন, সেই কথাই শোনা ভাল।"

এইরূপ চিন্তা করিয়া প্রকাশ্যে পতিত বলিল,—"বন্ধু! তোমার সঙ্গে তবে আমি যাবো;—কিন্তু দেখো বন্ধু! শেষে যেন প্রাণে মরি না।"

কালাচাঁদ কহিলেন,—"ভয় নাই।"

পতিতের সঙ্গ ব্যতীত কালাচাঁদ যে, ঠাকুরদাদার গৃহে যাইতে অক্ষম, তাহা নহে! পতিতকে সঙ্গে লইবার বিশেষ যে, কোন কারণ ছিল, তাহাও নহে। তবে কালাচাঁদ এত জেদ ধরিলেন কেন?—কেবল মজা করা ভিন্ন অন্য কোনও কারণ ত দেখি না। পতিত ভয়ে ভীত হইয়া বলিল, 'যাইব না,'—কালাচাঁদের মজা হইল। ভীত ব্যক্তি দেখিলে, কালাচাঁদের আনন্দ হইত। পতিত ভীত হইয়াছে; অতএব পতিতকে সেই ভয়সঙ্কুল স্থানে লইয়া যাইতে হইবে;—ইহাই হইল,—কালাচাঁদের রঙ্গরস, রসিকতা, রস-চাতুরি!



## ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

কালাচাঁদ, পতিতের সমভিব্যাহারে, ঠাকুরদাদার বাসায় গেলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তথায় আদৌ আদর-অভ্যর্থনা পাইলেন না। ঠাকুরদাদা, নাতীকে দেখিয়া মহা বিরক্ত হন; মুখ বাঁকাইয়া বসিয়া থাকেন; যে দু-একটী কথা কন, তাহাতে বিরক্তি এবং ব্যঙ্গের ভাবই প্রকাশিত হয়। কালাচাঁদ শুষ্কমুখে প্রত্যাগত হইলেন। পতিত বলিল, "বন্ধু! দেখ্‌লে,—আমি যা বলেছিনু, তাই ঠিক্ হ'লো! আমি মর্‌বো কবে, তাই জানি না,—নহিলে, পতিত জানেনা কি?"

কালাচাঁদ। তুমি যা বলেছিলে, ঠিক্ তার উল্টা হলো।

পতিত। উল্টা হবে কেন?—ঠিক্‌ই হয়েচে।

কালাচাঁদ। তুমি বলেছিলে, ঠাকুদ্দা দুজনকেই খুন ক'রে ফেল্‌বেন; না হয়, মেরে পিঠ ছিঁড়ে দিবেন।

পতিত। খুন কে কাকে করে? এ কোম্পানীর

মুলুকে খুন আর কাকেও কত্তে হয় না! কথার কথা একবার বলেছিলেম ব'লেই কি, ঠাকুদ্দা অমনি দুইটা জেয়ান্ত মানুষকে খুন কত্তে পারেন! বন্ধু! তুমি কি তামাসা বুঝ না?

কালাচাঁদ। তা, আর কৈ বুঝিতে পারিলাম!

এইরূপ কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে দুই বন্ধুতে বাসায় প্রত্যাগত হইলেন। সন্ধ্যার পর আবার পতিতকে সঙ্গে লইয়া, কালাচাঁদ অন্যান্য আত্মীয়, গ্রামস্থ ব্যক্তির বাসায় গেলেন। তিনি যেখানে যান, সেইখানেই উপেক্ষিত এবং উপহসিত হন। কোথাও কালাচাঁদ স্নেহ, ভালবাসা,—অধিক কি, মৌখিক মিষ্ট কথা পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইলেন না। তাঁহার ভগ্নমন আরও ভাঙ্গিল।

কালাচাঁদ ভাবিতে লাগিলেন, আমি এখন সচ্চরিত্র, সাধু, সত্যবাদী হইয়াছি,—তথাচ লোকে আমাকে এত ঘৃণা করে কেন? এরূপ উপহাসইবা করে কেন? লোকগুলা বড়ই বদ্। লোকগুলা চোর, প্রবঞ্চক, বিশ্বাসঘাতক।

লোকগুলা মন্দ হয়, হউক;—আমি কিন্তু সৎপথ কখন ছাড়িব না। সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর, আমাকে সৎপথাবলম্বী দেখিলে, অবশ্যই সন্তুষ্ট হইবেন। ভগবানের কৃপাদৃষ্টি থাকিলে, অনলে, জলে, শৈলে, রণে, বনে, ভবনে,—কোথাও আমি কষ্টে বা সঙ্কটে পতিত হইব না। আমি মানুষের ভালবাসা চাই না। ভগবানই আমার ভরসা। ভগবান আমাকে ভালবাসুন। হে ভগবন্! আমি তোমার ক্ষুদ্র দাস;—চরণাশ্রিত, সেবক। তুমি অসীম, অনন্ত, অক্ষয়। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তোমার উদরে অধিষ্ঠিত। তুমি স্নেহময়ী যশোদাকে, লীলাচ্ছলে, তোমার মুখাভ্যন্তরে সমুদায় সংসার দেখাইয়াছিলে। তুমি ভক্তের অধীন, তুমি ভক্তের বৎসল। প্রাণ-সঙ্কটে তুমি ধ্রুব-প্রহ্লাদকে রক্ষা করিয়াছ। হে শ্রীমধুসূদন! কুরুসভায়, তুমিই দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ করিয়াছ। হে দীনবন্ধু! সুধন্বাকে তপ্ততৈল হইতে রক্ষার তুমিই কারণ। হে প্রভু! আমার বাপ নাই; তুমিই আমার

পিতা; আমার মা নাই, তুমিই আমার জননী; আমার বন্ধু-বান্ধব কেহই নাই, তুমিই আমার সুহৃদ্! প্রভু! তোমার চরণে আমার এই প্রার্থনা, যেন মন্দকর্ম্ম করিতে আর মন না যায়। আমি পাপী, দুরাচার, অকৃতী, অধম। তুমি মুখ তুলিয়া না চাহিলে, আমার আর উপায় নাই। প্রভু! আমার কেবল এই মিনতি,—তোমার চরণযুগলে স্থান দিও।"

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে কালাচাঁদের হৃদয় কতকটা সুস্থ হইল! মন ঠাণ্ডা হইলে, তিনি গো-সেবায় তৎপর, পতিতপাবনকে বলিলেন, "বন্ধু! তুমি আজ কি খাবে বল? লুচি বল, খিচুড়ি বল, সরুচাকলি বল,—এ তিনের মধ্যে, তুমি যা'বল, তাই খাওয়াইব।"

বন্ধু তখন খুব কুঁচি কুঁচি করিয়া গোরুর জাব কাটিতেছিল। আহারের নামে অর্দ্ধ-কর্ত্তিত খড়-আটিটী ফেলিয়া উঠিয়া পড়িল। ঝটিতি কালাচাঁদের নিকট আসিয়া বলিল,—"বন্ধু! তুমি আমার খাবার

কথা ব'ল্‌চো বটে,—কিন্তু আমার মুখে কোন জিনিস্ আর রোচে না! ভাত খাওয়াত উঠে গেছে! এই, আধ্‌পো চেলের অন্ন রাঁধি,—তারই বার-আনা-ভাগ পাতে পড়ে থাকে। তবে একটু দুধ খেয়ে থাকি। দুধই হ'লো আমার এখন জীবন। তা, আমাকে লুচি, খিচুড়ি খাবার কথা বলা বৃথা। তবে তুমি বল্লে'ত কথা এড়াতে পারি না—"

কালাচাঁদ। ওসব কথা যাক্। এখন বল,—ঐ তিনটা জিনিসের মধ্যে কোন্‌টা খাবে?

পতিত এইবার বড় বিপদে পড়িল। সরুচাক্‌লিটে তাহার বড়ই প্রিয়তম। সরুচাক্‌লির নামে তাহার রসনা লহ-লহ করে। কিন্তু এদিকে লুচি, ওদিকে খিড়িচু। এ দুইটার মধ্যে কোনটাইত মন্দ জিনিস নহে। লুচি হইলে, দই, তরকারি, সন্দেস থাকিবে। কিন্তু খিচুড়ি হইলে মাছ ভাজা, মাছের কালিয়ে থাকিতে পারে। দই ত হইবেই। খিচুড়িতে দই না খাইলে গরম হয়। আর, শেষে মিষ্টিমুখ করিবার জন্য অবশ্যই সন্দেস থাকা চাই। তবে

লুচি-খিচুড়ির মধ্যে খিচুড়িটেই ভাল। কিন্তু লুচি-সামগ্রীটা সর্ব্ব-মনোহর! আচ্ছা করিয়া ময়ান দিয়া, একটু খর-খর করিয়া ভাজিয়া, অল্প গরম গরম থাকিতে থাকিতে খাইতে পাইলে,—খিচুড়ি কোথায় লাগে? কিন্তু আমি যে, সরুচাকলিটা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসি—তাহার কি? খাঁটি দুধের পরমান্নের সহিত সরুচাকলি মাখিয়া খাইবার সময় যে কিরূপ আরাম, সোয়াস্তি হয়—তাহা আর বলিবার নহে। আ—আঃ—আহা,—গরাসে গরাসে যেন চাঁদ নিঙড়িয়া সুধা খাইতেছি বলিয়া মনে হয়। কিন্তু সরুচাকলি খাইলে বড়-মাছের মুড়ার কালিয়ে পাইব না। বন্ধু বলিবে,—সরুচাকলির সঙ্গে আবার মাছ খাওয়া কি? সুতরাং আমি বলি কি? কোন্ জিনিসটা খাই?—এ-যে দেখিতেছি,—আমার পক্ষে সবই সমান হইয়া দাঁড়াইল!

কালাচাঁদ। বন্ধু! এত ভাব্‌চো কি? বল না কি খাবে?

পতিত মাথা চুলকাইতে লাগিল; কিছুই ঠিক

করিতে পারিল না। ভাবিল, "অদ্যকার বড়ই গুরুতর সমস্যা। বিশেষ না ভাবিয়া, না বুঝিয়া, হঠাৎ এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইবে না। রাত্রে শুইয়া-শুইয়া, সমস্তক্ষণ জাগিয়া জাগিয়া, ভাবিয়া ভাবিয়া, একটা যা-হয়, ঠিক করিয়া, বন্ধুকে কল্যপ্রাতে ইহার উত্তর দিব।"

এইরূপ চিন্তা করিয়া, একটু বুদ্ধিব্যয়পূর্ব্বক পতিত বলিল,—"বন্ধু! ক্ষুধাটা মন্দা আছে;—আজ না হয় থাক্—কাল খাওয়ান হবে!"

কালাচাঁদ। তাও কি কখন হয়? পূজারি-ঠাকুরকে বলে এসেচি,—তিনি এসে রাঁধ্‌বেন!

পতিত জানে,—কালাচাঁদ যাহা ধরে, তাহা সহজে ছাড়ে না। নিরুপায় হইয়া বলিল, "আচ্ছা, বন্ধু! সরুচাক্‌লি হ'লেত পায়েস নিশ্চয়ই হচ্চে—

কালাচাঁদ। তা, অবশ্য হবে।

পতিত। আমি সে কথা বল্‌চি না—পায়েস ত হবেই! আমি বল্‌চি কি,—বড় মাছের কালিয়ে হবে না কি?

কালাচাঁদ। আচ্ছা,—তুমি বল ত,—তাও হবে।

পতিত। আমার কোন বলাবলি নেই,—তোমার ইচ্ছা হয়—হোক; না ইচ্ছা হয়..........., কি জান্‌লে, বন্ধু! বড় মাছের মুড়া জিনিসটা ভাল।

কালাচাঁদ। আচ্ছা, মাছের কালিয়াও করা যাবে।

পতিত। বন্ধু! একসের ময়দায় আদসের ঘিয়ের ময়ান দিয়ে, তুমি কখন কি লুচি খেয়েছ?

কালাচাঁদ। না।

পতিত। আমি খেয়েচি। তোমার ঠাকুদ্দার কাছ থেকে আইবুড়ো-ভাতের তত্ত্ব নিয়ে আমি একবার রাজবাড়ীতে যাই। রাজা অনেকদিন মরে গেছেন,—রাণীই কর্ত্তা। রাণী আমাকে একটা সিধে দিলেন,—আধমণ চাল, দশসের ময়দা, পাঁচসের ঘি, পাঁচসের একটা মাছ,—আরও যে কত-কি সিধেতে ছিল, তা আর কি বল্‌বো। সিধে দেখেই ত আমার আত্মাপুরুষ উড়ে গেল। ভাব্‌লাম,—

এত সিধে নিয়েইবা আমি কি কর্‌বো? তখন মনে হ'লো, একসের ময়দায় আধসের ঘিয়ের ময়ান দিয়ে লুচি তৈয়ের করা যা'ক্!—দেখি-না কেমন হয়! তাহাই করিলাম। বন্ধু! লুচি যা তৈয়ের হলো, তা আর তোমাকে কি বল্‌বো? মুখে দি,—আর মিলিয়ে যায়! সে লুচি ঠোঁটের কাছে ঠেকাই,—আর নাই!—ঠোঁটের কাছে ঠেকাই,—আর নাই! বুকের কল্‌জেটা-সুদ্ধ একেবারে সাফ হয়ে গেল। সে রকম লুচি সেই একবার কোন্-কালে খেয়েছিলেম,—আর খাই নাই। বন্ধু! আমার ইচ্ছে যে, তোমাকে একদিন সে-রকম লুচি খাওয়াই! যদি বল, তবে আজই, সরুচাক্‌লি তৈয়েরির সময় পূজারি-ঠাকুরকে দিয়ে, সেরখানেক ময়দার সে-রকম লুচি ভাজাই।

কালাচাঁদ। (হাসিয়া) একসের ময়দায় আধসের ঘি ময়ান দিলে যে, লুচি গুঁড়ো হয়ে যাবে—খোলায় ভাজা হবে কেন? ঘিটেও নষ্ট হবে, লুচিও কেউ খেতে পাবে না।

পতিত। আমি বল্‌চি, হবে! যদি না হয়, তবে তার দায়ী আমি আঁছি।

কালাচাঁদ। তাই হোক,—আমার আপত্তি নাই।

পতিত। বন্ধু! আমি নিজের খাবার জন্য বলি নাই;—তোমাকে খাওয়াব, এই আমার সাধ। তুমি খেলেই আমার তৃপ্তি।

কালাচাঁদ। (হাসিয়া) তবে আর খিচুড়ীটে বাকী থাকে কেন?—খিচুড়ীও হোক।

পতিত। (হঁা—হঁা রবে) তা হবে না, তা হবে না,—এত জিনিস খাবে কে? পয়সা নষ্ট করা তোমার একটা রোগ বৈত নয়! (একটু থামিয়া) তবে বন্ধু! তোমার যদি ইচ্ছা হয়ে থাকে, তা'হলে ভুনিখিচুড়ীই না-হয় হোক! তোমার কোন কাজে আমি বাধা দিতে পারি না।

সে রাত্রি সরুচাকলি, লুচি, খিচুড়ি তিন রকমই হইল। পতিতের অন্তরের আশা পূর্ণ হইল। এমনটা শুনা গিয়াছে, আহারের পর তিনদিন

পতিত কোন কাজকর্ম্মে বাহির হইতে পারে নাই। পতিত বলিত,—"পায়ে গেঁটে-বাত হইয়াছে।" বন্ধু-বান্ধবগণ বলিত, "আহারের রাত্রি—অর্থাৎ ভোর বেলা—হইতে পতিতের এমন একটী ব্যারাম হইয়াছে, যাহার নাম করিলেই পতিত রাগিয়া উঠে।"

পতিতের নামে কালাচাঁদ এইরূপ আহারাদির উদ্যোগ করিতেন বটে, কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য অন্যরূপ ছিল। প্রতিবেশীগণের মধ্যে যাহারা দীনদরিদ্র, যাহারা উদরপূর্ণ করিয়া কখন খাইতে পায় না, কালাচাঁদ তাহাদিগকে ধরিয়া-ধরিয়া আনিয়া ভোজন করাইতেন। গৃহস্থ-ঘরের যে সকল দুঃখিনী রমণী, কালাচাঁদের বাসায় আসিয়া খাইতে সম্মত হইত না, পূজারি-ঠাকুরের দ্বারা কালাচাঁদ, তাহাদের লুচি সন্দেস পাঠাইয়া দিতেন। বন্ধু পতিতপাবন, এ সব কার্য্যে বড়ই প্রতিবাদ করিত; বলিত,—"তোমার পয়সা রাখ্‌বার ত যায়গা নেই,—খাওয়াচ্চ কি না ভূতগুলাকে, আর পেত্‌নীগুলাকে।" কালাচাঁদ

বলিত,—"বন্ধু! এরা কখন লুচি সন্দেস খেতে পায় না—এক দিন খাগ্‌।"

বলা বাহুল্য, এরূপ দরিদ্র-ভোজনে কালাচাঁদের কোনও আড়ম্বর ছিল না। এদিকে পূজারি-ঠাকুর রন্ধনকার্য্য আরম্ভ করিলেন, ওদিকে কালাচাঁদ সন্ধ্যার পর ধীরে ধীরে বাহির হইলেন। গয়ারামের বাটী গিয়া দেখিলেন, চাঁদের আলোকে গয়ারাম বিচালির বড় পাকাইতেছে। অমনি আস্তে-আস্তে গিয়া, পশ্চাৎ হইতে গয়ারামের পিঠে দুই কীল। গয়ারাম ভয়ে চমকিয়া উঠিয়া দেখিল, পশ্চাতে কালাচাঁদ। সে তখন আর কোন কথা কহিল না। নমস্কার করিয়া যোড়হাতে দাঁড়াইল।

কালাচাঁদ কহিলেন, "তুই এখনও বসে আছিস্—যা,—আমার ওখানে যা। বুঝেচিস্,—ছেলেপিলেকে নিয়ে যাস্।"

গয়ারাম যোড়হাতে প্রণাম করিয়া বলিল,—"যাচ্চি।"

বৃদ্ধ হলধর তাঁতির চিরদিনই অন্নকষ্ট। কালাচাঁদ

গিয়া, তাহার চোখ টিপিয়া ধরিলেন। বুড়া ভয়ে "আঁউ মাঁউ" করিয়া উঠিল।

কালাচাঁদ। আমি কে, বল,—তবে চোখ্ খুলে দিচ্চি।

হলধর। আমি বুঝ্‌তে পাচ্চি না,—আপনি যে হও,—পায়ে পড়ি, চোখটী খুলে দাও,—হাঁপিয়ে মরে গেনু—

কালাচাঁদ। সন্দেস্ খাবি? ক গণ্ডা খাবি বল্?

হলধর। বুঝেচি—বুঝেচি—তুমি ঠাকুদ্দা—

কালাচাঁদ তখন হাসিয়া চোখ খুলিয়া দিলেন। বলিলেন,—এখনি যা—দৌড়ে যা—আমার বাসায় আজ ভারি মজা।

কালাচাঁদের নিমন্ত্রণ-প্রথা এইরূপই ছিল।



# চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

কাল্যাচাঁদ একদিন তাঁহার তহবিল গণিলেন। দেখিলেন, আর ৫১৲ একান্নটী মাত্র টাকা মজুদ আছে। ভাবিলেন,—"ফুরাইয়া ত আসিল। ৫১৲ টাকায় আর কদিন চলিবে? হদ্দ—বড় জোর এক মাস। তার পর কি? অর্থ কোথা পাই? খাই কি?—খাওয়াই কি?

চাকুরি!—তা, যার কাছে যাই, সে-ই আমাকে দেখিয়া উপহাস করে। যে ব্যক্তি উপহাসের পাত্র, সে, চাকুরির প্রস্তাব করিবে কেমন করিয়া? চাকুরির জন্য ত পাঁচ সাত স্থানে গমন করিলাম,—কিন্তু সর্ব্বস্থানেই যে, অবমানিত হইলাম।

পুনরায় তাঁহাদের নিকট যাই-না কেন? তোষামোদ করিয়া বলি,—আমাকে একটী চাকুরি দাও। তাঁহাদের পায়ে ধরিয়া পীড়াপীড়ি করি-না কেন?

পায়ে ধরিতে কোন ক্ষতি নাই,—কিন্তু ধরি কার্? পায়ে ধরিবার উপযুক্ত পাত্র কৈ? যে কয়জন লোকের নিকট চাক্‌রীর উমেদারীতে গিয়াছিলাম,—তাঁহাদের সকলেই ভাগ্যবান্, ক্ষমতাবান্, অর্থবান্ বটেন,—কিন্তু কেহই ত সৎস্বভাব-সম্পন্ন নহেন। মাথামুণ্ড কি আর বলিব,—সকল বেটাই চোর। ইহাঁদের মধ্যে কেহ হইলেন, লম্পটকুল-চূড়ামণি; কেহ হইলেন, জালিয়াৎ-কুলতিলক; কেহ হইলেন, দস্যুবংশাবতংস; কেহবা সর্ব্বগুণধর;—তিনি হইলেন, লম্পটকুল-চূড়ামণি+জালিয়াৎ-কুলতিলক+দস্যুবংশাবতংস। এই সমস্ত পাপী পাষণ্ড ব্যক্তির সেবা করিতে আমি কিছুতেই সক্ষম হইব না। এক পয়সা অর্থ উপার্জ্জন করিতে না পারি, তাও স্বীকার,—খাইতে না পাই, তাও স্বীকার,—ভিক্ষা করিতে হয়, তাও স্বীকার,—তথাচ আমি মূর্ত্তিমান্ মল-মূত্রের নিকট উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান থাকিতে সক্ষম হইব না।

আমি এখন সাধু, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়,—এই

কয়মাস আমার চরিত্রে কলঙ্ক-কালিমা তিলমাত্রও স্পর্শ করে নাই,—আমি খাইতে-মাখিতে পাইব না; আর, এই ঠক-ঠেঁটা, লম্পট-শঠ লোকগুলা চিরদিনই পরমভোগে পরিতৃপ্ত হইতে থাকিবে,—ইহা কি কখন সম্ভবপর কথা? মাথার উপর ভগবান আছেন,—তিনি কি এসব দেখিতে পাইতেছেন না?

অবশ্যই ভগবান ইহার বিচার করিবেন। অবশ্যই আমি খাইতে পাইব।"

কালাচাঁদ আরও ভাবিতে লাগিলেন,—"এখন মোট মজুদ ৫১৲ টাকা। এইটীই এখন জীবন। এইটী ফুরাইলেই, ভগবান ভরসা।

একান্ন টাকায় একমাসের অধিক চলিবে না। ত্রিশদিন পরেই কি আমাকে "হা অন্ন! হা অন্ন"—বলিয়া, ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে ফেলিয়া, লোকের দ্বারে দ্বারে বেড়াইতে হইবে? আচ্ছা, একটু কৃপণ হইনা কেন? অন্যান্য খরচ সমস্তই একেবারে বন্দ করিয়া, কেবল নিজের উদর পূর্ণ করিনা কেন?

তাহাতে আর কত খরচ লাগিবে? মাসিক চারি টাকা হইলেই ভাসিয়া যাইবে। এরূপ করিলে, এক বৎসরেরও অধিককাল নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি। কিন্তু তাহাতেই বা কি লাভ? এক বৎসর পরে ত আবার ঠিক সেই দশা!—সেই ভিখারীর ভাব—সেই ঝুলি—সেই হা-অন্ন—হা-অন্ন!

যদি অন্নের জন্য প্রকৃতই আমাকে ভিক্ষার ঝুলি বহন করিতে হয়, তবে আর বিলম্বে প্রয়োজন কি? শুভস্য শীঘ্রং। একমাসের স্থানে আমি একবৎসর বৃথা অতিবাহিত করিব কেন?

কিন্তু সৎপথে থাকিলে, অর্দ্ধরাত্রে অন্ন হয়,—পণ্ডিতগণের মুখে কতবার এই কথা শুনিয়াছি। আমি কখনই নিরন্ন হইব না,—ইহাই আমার ধ্রুব বিশ্বাস।"

দেখিতে দেখিতে একমাসের মধ্যে কালাচাঁদের ৩৮৲ আটত্রিশ টাকা খরচ হইল। সংক্রান্তির দিন হাতে নগদ ১৩৲ তেরটী টাকা রহিল। সেই দিন কালাচাঁদ কাঙ্গালী-ভোজন করাইলেন। মোটাচেলের

ভাত, কড়ায়ের ডাল, কুমড়ার তরকারি, এবং মাছের অম্বল,—বন্দোবিস্ত হইল। দুইশত কাঙ্গালী বসিয়া খাইল। পূর্ণমাত্রায় আহার করিয়া, পরম-পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়া, কাঙ্গালীগণ কালাচাঁদের জয় গাহিতে-গাহিতে প্রস্থান করিল। সকলে চলিয়া গেলে, কালাচাঁদ, পতিতকে বলিলেন, "বন্ধু! তুমি একবার উঠানের মধ্যস্থলে দাঁড়াও।"

পতিত। কেন, কেন? কি হয়েচে?

কালাচাঁদ। একবার দাঁড়াওই-না ছাই?—

পতিত দাঁড়াইল।

কালাচাঁদ অমনি এক বকুনা কড়ায়ের ডাল আনিয়া পতিতের মাথায় ঢালিয়া দিল।

পতিত। করো কি, বন্ধু! করো কি?

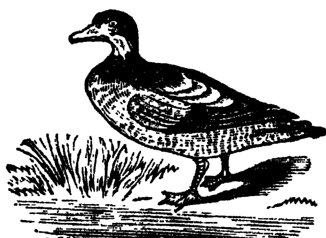
কালাচাঁদ। বন্ধু! কেমন শোভা হইয়াছে, দেখ দেখি?

পার্ষদগণ উচ্চ-হাসি হাসিল। কালাচাঁদ কিন্তু হাসিলেন না।

পতিত একটু রাগ করিয়া উঠিল। বলিল,—

সন্ধ্যাবেলা আবার নাইতে হবে,—দেখ্‌চি। এমন কাজও করে কি? সর্দ্দি হ'য়ে মারা পড়্‌বো আর কি।

কালাচাঁদ। বন্ধু! রাগ ক'রো না।—আজই শেষ। আর কখন এমন দিন হবে না। আজ এ যজ্ঞের পূর্ণাহুতি হ'লো।



## পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

কালাচাঁদ যে, অদ্য কপর্দ্দক-শূন্য হইলেন, পতিত তাহা জানিত না। একা পতিত কেন, এ সংবাদ কেহই অবগত ছিলেন না। তখনও লোকের ধারণা ছিল,—কালাচাঁদের হাতে অনেক টাকা আছে।

কালাচাঁদ ঠিক এক ভাবেই আছেন। অর্থযুক্ত-কালে, যে ভাব,—এখন, অর্থহীনকালেও তাঁহার সেই ভাব। কিছুতেই দৃক্‌পাত নাই।

সংক্রান্তির দিন হইতেই মুদির দোকানে ধার আরম্ভ হয়। ক্রমে ধারেই সংসার চলিতে লাগিল। এক মাস কাল ধারে উঠ্‌না দিয়া, পর মাসের প্রথম দিবসেই মুদি, কালাচাঁদের কাছে তাগাদায় আসিল। কালাচাঁদ কহিলেন,—"আমার হাতে এখন কিছু নাই।"

মুদি। তা, থাক্—তা, আজ থাক্—যে দিন

আপনার সুবিধা হবে, সেই দিনই দিবেন। টাকার জন্য এসে-যাচ্চে কি? আপনি অতি মহাশয়-ব্যক্তি।

মুদি চলিয়া গেল। আবার দশ দিন পরে তাগাদায় আসিল। বলিল,—"আজ কিছু কি অনুগগরো ক'রবেন? পাইকেরের কাছ থেকে গুড় কিনেচি,—সব টাকা জোটাতে পারি নি—পাইকেরকে দোকানে বসিয়ে রেখে, আপনার কাছে এসেচি।

কালাচাঁদ। টাকা কড়ি, বাপু! আমার হাতে কিছুই নাই।

মুদি। কিছু দিন্‌না,—নিদেন পাঁচটা টাকাও দিন্‌না? বাকী টাকা দশ দিন পরে দিলেই হবে। তা, আপনার কাছে ত আমার টাকার ভাবনা নেই!

কালাচাঁদ। ৫৲ টাকা দূরে যাউক, পাঁচটী পয়সা আমার হাতে নাই।

মুদি। তবে আমি টাকার জন্য কবে আস্‌বো?

কালাচাঁদ। তাইবা ঠিক কেমন ক'রে বল্‌বো? তোমাকে আর আস্‌তে হবে না। টাকা হাতে এলেই, তোমাকে আমি পাঠিয়ে দিব—

মুদি। কি জানেন,—আমরা গরীব মানুষ,—পুঁজি-পাটা কম। এতটাক। আপনি যদি ফেলে রাখেন, তবে আমি দোকান চালাই কেমন করে? আমরা নগদ আনি, নগদ বেচি। আপনাদের দোয়ার থেকে দু-পয়সা নিয়ে গুজরান করি। তা, আজ কিছু না-হয় টাকা দিন্,—

কালাচাঁদ। বাপু! আজ একটী পয়সা থাকিলেও তোমাকে দিতাম,—

মুদি। আপনি যদি এমন করেন, তবে আর কোথা থেকে উঠ্‌নো যোগাব?

কালাচাঁদ। ইচ্ছা না হয়,—আর যোগাইও-না।

মুদি। আমি তা বল্‌চি না,—আমি আর পাবো কোথা,—তাই বল্‌চি।

কালাচাঁদ। সেই কথাত আমিও বল্‌চি—

মুদি। আজ্ঞে, মোশাই! পরশু তারিখে

আস্‌বো—কিছু আমাকে যোগাড় ক'রে দিবেন। আমি আপনার উঠ্‌নো বন্দ 'কর্‌বো না—

কালাচাঁদ। তুমি উঠ্‌নো বন্দই কর। আমি এ কথা রাগ ক'রে বল্‌চি না—

মুদি। আমি যদি উঠ্‌নো বন্দ করি,—তবে আপনাকে ত নগদ চাল-ডাল কিনে আন্‌তে হবে।

কালাচাঁদ। পয়সা না থাক্‌লে, নগদ কিনিব কেমন করিয়া?

মুদি। আপনার সঙ্গে -অনেক দিন থেকে লেন্‌-দেন, আলাপ-পরিচয়, তাই আমি ধারে দিতে পার্‌বো। অন্য কেহ ত ধারে দিবে না।

কালাচাঁদ। নাইবা দিলে?

মুদি। তখন ত নগদ পয়সা বা'র্‌ কত্তে হবে!

কালাচাঁদ। (হাসিয়া) তোমার ত বড় আশ্চর্য্য কথা শুন্‌চি। মোটেই পয়সা না থাক্‌লে, কোথা থেকে নগদ পয়সা বার্‌ করবো?

মুদি। তবে, চাল ডাল কোথা থেকে আস্‌বে—বলুন?

কালাচাঁদ। কোথাও থেকে আস্‌বে না—

মুদি। তার পর!—

কালাচাঁদ। তার পর আবার কি?—

মুদি। খাওয়া-দাওয়া চল্‌বে কোথা থেকে?

কালাচাঁদ। কোথাও থেকে চল্‌বে না। আমি উপ'স করে থাক্‌বো।

মুদি। সে কি কথা?

কালাচাঁদ। আমার কথায় দোষ কি হইল?

মুদি। না খেলে মানুষ বাঁচে কি?

কালাচাঁদ। না,—বাঁচে না।

মুদি। তবে?—

কালাচাঁদ। আমি বাঁচিব না।

মুদি হাসিল।

কালাচাঁদও হাসিলেন।

যাত্রাকালে মুদি বলিল, "পরশু দিন আমি আস্‌চি,—সে দিন কিছু টাকা যোগাড় করে আমাকে দিবেন। সেদিন আর ফির্‌বো না।"

কালাচাঁদ মনে মনে কেবল হাসিলেন; কোন কথা কহিলেন না।

মুদি কালাচাঁদের উঠ্না বন্দ করিল না,—পর দিন যথানিয়মে সামগ্রী-পত্র পাঠাইয়া দিল। বরং অন্যদিন অপেক্ষা উত্তম উত্তম সামগ্রী পাঠাইল। অদ্যকার ওজন কম'ত নহে-ই, বরং খর-খর।

পরশ্ব দিন শীঘ্রই আসিল। মুদিও আসিয়া সমুপস্থিত হইল। কালাচাঁদ শুইয়া ছিলেন; মুদীকে দেখিয়া উঠিয়া বসিলেন। হাসি হাসি মুখে মুদীকে বলিলেন,—"এস, এস—ভাল হয়ে ব'সো।"

সমাদর দেখিয়া মুদী ভাবিল,—আজ নগদ টাকা।

কালাচাঁদ মুদিকে আপ্যায়িত করিয়া, জিজ্ঞাসিলেন,—"আমি যদি আজ টাকা না দি, তা হ'ইলে তুমি কি কর?"

মুদি একটু হাসিল। ভাবিল, "সে দিন কিছু

কড়া তাগাদা হয়েছিল কি না,—তাই বাবু আজ টাকা মজুদ রে'খে,—আমার সঙ্গে তামাসা কচ্চেন।” মুদি প্রকাশ্যে বলিল,—“আপনারা ভদ্দর লোক; আপনারা যদি টাকা দিতে দেরী করেন, তা'হলে, আপনাদিগে কি আর বল্‌বো?—আর, আমি আপনাদের কর্‌বোই বা কি? নিতান্ত চলে না বলেই,—তাগাদায় আস্‌তে হয়।

কালাচাঁদ। কিছুই ব'লবে না!

মুদি। আজ্ঞে, তা কি কিছু বল্‌তে পারি?

কালাচাঁদ। বাপু! আমি একটী পয়সাও দিতে পার্‌বো না। আজও আমার একটী পয়সাও যুটে নাই।

মুদি। (বিস্ময়ে) বলেন কি মোশাই?

কালাচাঁদ। তুমি আর কেন কথা ক'চ্চ বাপু!—তুমি কেন চুপ করে উঠে চলে যাও না?

মুদি। তা'হ'লে যে, মোশাই! আমার সর্ব্বনাশ হবে! দোকান বন্ধ হয়ে যাবে।

কালাচাঁদ। আবার কথা ক'চ্চ! তুমি এই

মাত্র বল্লে যে, টাকা না পেলে, তুমি কোন কথা কবে না। তবে কেন, বাপু! কথা কও?

মুদি। (ক্রোধভরে) সে কি মোশাই?—আপনারা ভদ্দর লোক। আমরা মুরুক্ষু মানুষ। আমরা কি এত কথার কাটাকাটি বুঝ্‌তে পারি?—আপনি এখন টাকা দিবেন কি না বলুন?—ভদ্দর লোক হয়ে, এমন ক'রে টাকা ফাঁকি দিতে আছে কি?

কালাচাঁদ। (মিষ্টস্বরে) বাপু! তুমি কি আমাকে কিছু গাল্ দিতে ইচ্ছা করেচো?—তা, দাও, কিছু বল্‌বো না,—মনের সাধে গাল্ দাও।

মুদি। গাল্ কে দিচ্চে? আমাদের কার্‌বার্ যত ভদ্দর লোকের সঙ্গে। আমরা গালাগালি জানি না—কখন করিও না। সে-যা'হোক—মোশাই! টাকা দিন্। টাকা না পেলে আজ আমি আর ছাড়্‌চি না—

কালাচাঁদ। ছাড়িয়া কাজ কি? আমাকে লইয়া কি করিতে হয়,—কর।

মুদি। আমি আপনার সঙ্গে বাক্‌চাতুরি কত্তে আসি নাই। উঠুন্—উঠুন্—টাকা দিন্।

কালাচাঁদ। যদি উঠিলেই টাকা মিলিত, তাহা হইলে, আমি এতক্ষণ দশহাত উর্দ্ধে লাফাইয়া উঠিতাম।

মুদি। আপনি সোজা কথায় দিবেন কি না, বলুন ?

কালাচাঁদ। আমি সোজা কথায়ও দিব না,—বাঁকা কথায়ও দিব না। বাপু! টাকা নাই,—কোথা থেকে দিব ? তুমি রাগ করো না। টাকা হলেই পাঠিয়ে দিব।

কালাচাঁদ যত নরম সুরে, মিষ্টি করিয়া মুদিকে বুঝাইতেছেন,—মুদি তত চড়িয়া-চড়িয়া উঠিতেছে। চড়িয়া-চড়িয়া ক্রমশ অন্তিমে উঠিয়া, মুদি বলিল,—"ভদ্দরলোক ব'লে তোমাকে এতক্ষণ কিছু বলি নাই। তুমি জানো,—আমার নাম হরিহর মুদি ? তুমি আজ টাকা না দিলে, গলায় গামছা দিয়ে টাকা আদায় কর্‌বো—"

মুদি এত শক্ত কথা বলিলেও, কালাচাঁদের রাগ হইল না। কালাচাঁদ অধমর্ণ,—মুদি উত্তমর্ণ। মুদির এখন যা-খুসি-তাই বলিবার অধিকার আছে। ইহাই কালাচাঁদের ধারণা। এইরূপ জ্ঞান ও বিশ্বাসে, তাঁহার কিঞ্চিন্মাত্র ক্রোধের উদয় হইল না। তিনি ধীরভাবে মুদিকে কহিলেন, "বাপু! আজ তুমি আমার বুকে বসিয়া গলায় গামছা বাঁধিলেও, আমি কিছু বলিব না। কিন্তু গলায় গামছা দিলেই কি টাকা আদায় হইবে? আমাকে কাটিয়া দ্বিখণ্ড করিলেও, তোমার এক পয়সা আদায় হইবে না। আমার আছে কি?—যদি কিছু পিতল-কাঁসার জিনিসও থাকিত, তাহা হইলে, আজ তোমাকে তাহা দিয়া বিদায় করিতাম। মুদি! তোমাকে প্রকৃতই বলিতেছি, আমার কিছুই নাই। বরং তুমি আমার ঘর খুঁজিয়া দেখ—কিছু আছে কি না? আমি এই এক-বস্ত্র পরিয়া আছি, আমার দ্বিতীয় বস্ত্র নাই। আর একখানি শতধাছিন্ন চাদর আছে। গঙ্গা-স্নানের পর, ঐ চাদরখানি পরিয়া,

আমার কাপড় শুখাইতে দি। একটী জল খাবার লোটা মাত্র অবশিষ্ট আছে। ইচ্ছা হয়, তুমি লোটাটী লইয়া যাও। মুদি! আমার ভাত খাইবার থালা-পাথর নাই,—জল খাবার গেলাস-ঘটী নাই, পাতিয়া শুইবার বিছানা পর্য্যন্ত নাই। আছে, এক ছেঁড়া মাদুর, এক পিতলের লোটা, আর এই কাপড় এবং ঐ চাদরখানি। ইহার মধ্যে তুমি কি লইবে বল?

মুদি "থ" হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

তখন কালাচাঁদের কি যেন কথা একটা স্মরণ হইল;—এইরূপ ভাব দেখাইয়া, তিনি দ্রুতগতিছন্দে বলিতে আরম্ভ করিলেন;—"ও হোঃ!—বড় মনে পড়েচে! একখানি তলোয়ার আছে, আমার কাছে। সেই তলোয়ারের নূতন বেলায় দাম ৫০৲ পঞ্চাশ টাকার কম নহে। ভাল জিনিস। এক চোটে বাঘ বলি দেওয়া যেতে পারে। সেই তলোয়ারখানি পতিত নিয়ে রান্না-ঘরে, রেখে দিয়েচে। একটু ব'স্—ঐ রান্না-ঘরে আছে, শিগ্গির আন্‌চি আমি।

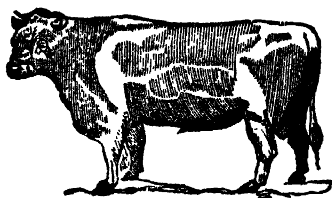
কালাচাঁদ তৎক্ষণাৎ লম্ফ দিয়া রন্ধনশালায় গেলেন। সেই চক্‌চকে তলোয়ার সবেগে ঘুরাইয়া আসিতে-আসিতে কালাচাঁদ বলিতে লাগিলেন, "মুদি! বড় সরেস্ তলোয়ার! খুব হাল্‌কা।—ইহা বেচে, তুমি—"

কালাচাঁদকে আর অধিক কথা কহিতে হইল না। কালাচাঁদের সেই ভীষণ কৃষ্ণমূর্ত্তি, তীক্ষ্নধার তরবারির সেই উজ্জ্বলদ্যুতি—দেখিয়া মুদির প্রাণ উড়িয়া গেল। মুদি ভাবিল,—"কালাচাঁদের গলায় আমি গামছা দিব বলিয়াছি;—কালাচাঁদ, সেই রাগে, আমাকে খুন করিবার জন্য, কৌশলে এখানে বসাইয়া রাখিয়া, ঐ তলোয়ার আনিতেছে।" কালাচাঁদকে তদবস্থায় তলোয়ার ঘুরাইতে দেখিয়া, মুদি "বাপ্!—বাপ্‌রে!—মেরে ফেল্লেরে!"—রবে দৌড়িয়া পলাইল।

সেই তরবারি হস্তে করিয়া কালাচাঁদও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলেন। মুখে উচ্চকণ্ঠে মুদিকে বলিতে লাগিলেন,—"ভয় কি? পালাও কেন?

এ তলোয়ার বেচিলে, অন্তত তোমার পঁচিশ টাকা নিশ্চয় হবে—”

তখন সে কথা আর কে শুনে? মুদি প্রাণ-ভয়ে “বাপ্ বাপ্” ধ্বনিতে দিগন্ত পূর্ণ করিয়া ভীমবেগে দৌড়িল। কালাচাঁদ মুদির পশ্চাৎ পশ্চাৎ খানিক গিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিলেন।



## ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

মুদি নিজ পল্লীমধ্যে রাষ্ট্র করিল, "উঠ্‌নার টাকা চাহিতে যাওয়ায়, কালাচাঁদ তাহাকে কাটিতে আসিয়াছিল। তলোয়ার ওঁচাইয়া পথ পর্য্যন্ত পেছু পেছু ছুটিয়াছিল।" এই কথায় সেদিন-সেরাত্রি সে পাড়াটি খুব গরম হইয়া রহিল।

অনতিবিলম্বে পতিতপাবনের কর্ণকুহরে এ কথা প্রবেশ করিল। পতিত তখন ঠাকুরদাদার গৃহে যাতায়াত আরম্ভ করিয়াছে,—চড়কে তাঁহার নিকট টাকা বক্‌শীশ পাইয়াছে,—ভবিষ্যতে আরও অনেক টাকা পাইবার আশা করিয়া বসিয়া আছে।

কালাচাঁদ যে সম্বল-বিহীন, পতিত এখন তাহাও বুঝিয়াছে। কালাচাঁদের যে, সমস্তই ঐন্দ্রজালিক কাণ্ড, তাহাও পতিতের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। পতিত, কালাচাঁদকে প্রত্যহ একসের করিয়া দুধ বিনামূল্যে খাইতে দিত। বলিত,—

"গো-দুগ্ধ বেচিতে নাই;—মূল্য কিছুতেই লইব না।" কালাচাঁদ, পতিতকে অন্যরূপে সে দুগ্ধের দামের দ্বিগুণ পোষাইয়া দিতেন। আজ প্রায় পনের দিন হইল, পতিত, কালাচাঁদকে সে দুগ্ধ দেওয়া বন্দ করিয়াছে।

ক্রমশ পতিতের ইচ্ছা হইল, কালাচাঁদ তাহার বাসায় আর না থাকেন। কিন্তু সে, ভয়ে একথা কিছুতেই মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিত না। কালাচাঁদ যেরূপ গোঁয়ার-গোবিন্দ লোক, তাহাতে তিনি যদি রাগিয়া উঠিয়া, পতিতকে একটা চড়াইয়া দেন,—ইহাই তাহার ভাবনা হইয়াছিল।

পয়সা-শূন্য কালাচাঁদকে তাড়াইবার জন্য, পতিত ঠাকুরদাদার সঙ্গে ক্রমে বেশী ঘনিষ্ঠতা আরম্ভ করিল। ওদিকে যতবেশী ভাব হয়, এদিকে কালাচাঁদের সঙ্গে তত ভাব কমে। এমন কি,—ক্রমশ কথাবার্ত্তা পর্য্যন্ত বন্ধ হইবার উপক্রম হইল।

অদ্য তরবারি-ঘটিত ব্যাপার শুনিয়া পতিত বড়ই ভীত হইল। ভাবিল,—"কালাচাঁদের হাত

হইতে তলোয়ার খানি ভুলাইয়া লইবার উপায় কি?—আমি নিজে যাইয়া চাহিব কি? বাপ্! বাঘের মুখে কে যাবে? বাঘ কিন্তু আমার পোষা। আমাকে সে কিছুই বলে না। মুদির নিকট আগে একবার যাইয়া নিজের কাণে সকল কথা শোনাই উচিত।”

এইরূপ ভাবিয়া, পতিত, হরিহর মুদির দোকানে উপস্থিত হইল। দোকানে বসিয়া, পতিত প্রাণ ভরিয়া কালাচাঁদের নিন্দা আরাম্ভ করিল। সেই নিন্দাবাদ শ্রবণ করিবার নিমিত্ত, তাহার চতুর্দ্দিকে বহু লোক দাঁড়াইল। এই পৃথিবীমধ্যে কালাচাঁদের ন্যায় মন্দ লোক আর দ্বিতীয় নাই,—ইহাই পতিত প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছিল। এমন সময় একজন লোক আসিয়া হরি মুদির হাতে একখানি পত্র,—এবং সেই তরবারি,—প্রদান করিল। পত্রলেখক কালাচাঁদ। পত্রে লিখিত আছে,—“তুমি বড় ভুল বুঝিয়াছ। পলাইলে কেন? তরবারি পাঠাইলাম। বেচিয়া

যাহা দাম হয়, লইও। অবশিষ্ট দেনা,—হাতে টাকা আসিলে, অগ্রে শোধ দিব।”

তরবারি দেখিয়া, পতিত চমকিয়া, লাফাইয়া উঠিল। ভাবিল,—“আমি তরবারির ভয়ে নিজের ঘর ছেড়ে এখানে পালিয়ে এসেচি,—কিন্তু তরবারি যে, আমাকে ছাড়ে না;—আমার সঙ্গে সঙ্গে এখানেও এসে পড়্‌লো। এস্থানে আর থাকা হবে না।”

তরবারির আগমনে পতিত তৎক্ষণাৎ তথা হইতে উঠিয়া পড়িল। ভয়ে সেদিন আর আহার করিল না। কালাচাঁদের সহিতও সাক্ষাৎ করিতে সাহস হইল না। রাত্রে শুইয়া-শুইয়া কেবল ভাবিল,—“এ বাড়ী হইতে কালাচাঁদকে তাড়াইবার উপায় কি?”

তার পর যে ঘটনা ঘটে, তাহা পাঠক অবগত আছেন। ঠাকুরদাদার নিকট হইতে প্রশ্রয় পাইয়া, তাঁহার সাহসে সাহসী হইয়া, পতিত অর্দ্ধভুক্ত কালাচাঁদকে বেলা তৃতীয় প্রহরে গৃহত্যাগ করিতে আদেশ করিল।

গৃহত্যাগের পর কালাচাঁদ যাহা যাহা করিলেন,—গঙ্গার ঘাটে বসিয়া যেরূপ ভাবিলেন; 'চুরি করায় দোষ নাই'—যেরূপে ঠিক করিলেন;—তাহা অবশ্যই সকলেরই মনে আছে। কিন্তু লাঠিদ্বারা কাছারির ঘাটের লণ্ঠন ভাঙ্গার পর, সে রাত্রি কালাচাঁদ যে, কোথায় কিরূপে অতিবাহিত করিলেন, তাহা পাঠক জানেন না।



ভাবিতে ব্রাঞ্চ-স্কুল-ভবনের প্রাচীরে গিয়া উপবেশন করিলেন। তখন প্রাচীর এত উচ্চ ছিল না। তিনি চ'কের বাজারের দিকে লোলুপ-দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। ক্ষুধায় তাঁহার জঠর জ্বলিতেছে। মন "কিখাই, কিখাই"—করিতেছে। সম্মুখেই ভোলা ময়রার দোকান। কালাচাঁদ ভাবিলেন,—"এ দোকানে ত সবই আছে;—সন্দেস, মিঠাই, জিলিপি রসগোল্লা,—লুচি, কচুরি, নিমৃকি,—ক্ষীর, ছানা, মাখন—এ দোকানে নাই কি? ভোলানাথ প্রধান দোকানদার। হুগলীসহরস্থ প্রায় অধিকাংশ বড়লোকের বাড়ী ভোলানাথ মিষ্টান্ন যোগাইয়া থাকে। অবশ্যই এই দোকানে নানাবিধ মুখপ্রিয় সরস সামগ্রী আছে। দোকান-ঘরের চাবি ভাঙ্গিয়া, উদরপূর্ণ করিয়া আহারাদিপূর্ব্বক একটু সুস্থ-শান্ত হই;—তারপর টাকা কড়ির চেষ্টা করা যাইবে।"

এই ভাবিয়া কালাচাঁদ তথা হইতে উঠিলেন। ভোলা ময়রার দোকানে গিয়া চাবিতে হাত দিলেন। আবার ফিরিয়া আসিলেন। একটু

## সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

কোন প্রহরী জাগ্রত আছে কি-না,—ইহা পরীক্ষা করিবার জন্যই কালাচাঁদ লণ্ঠন ভগ্ন করেন। প্রহরী নয়ত—যেন ঠিক্ এক-একটী মূর্ত্তিমতী নিদ্রা। কুঞ্জর-পদতলদ্বারা মর্দ্দিত হইলেও, সহসা ইহাদের নিদ্রাভঙ্গ হয় কি-না সন্দেহ। ইহারা জাগিয়া থাকিবার জন্য মাহিনা পায়,—চোর ধরিবার জন্য মাহিনা পায়,—দুর্ব্বল ব্যক্তিকে প্রবলের উৎ-পীড়ন হইতে রক্ষা করিবার জন্য মাহিনা পায়;—ইহারা মাসে মাসে নির্দ্দিষ্ট নিয়মে মাহিনাটী বেশ বুঝিয়া লয়,—কিন্তু কাজের বেলায় কেবল ঘুম,—মহাঘুম। যেটী করিতে নিষেধ, সেইটীই করে। ইহাদের ন্যায় বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তি ত সংসারে আর দেখি না। ঠাস্ করিয়া গালে চড়ই—ইহার উপযুক্ত ঔষধ।

কালাচাঁদ সেই গভীর নিশীথে এইরূপ ভাবিতে

ওজন,—একসের। ২য় রকম, কম ওজন,—১৫ ছটাক। ৩য় রকম বেশী ওজন,—১৭ ছটাক। কোন জিনিস যখন তুমি অন্যের নিকট হইতে মাপিয়া লও,—তখন সেই ১৭ ছটাককেই সের বল। তুমি অন্যকে যখন কোন জিনিস বিক্রয় কর, তখন সেই ১৫ ছটাককেই সের বল। যদি কখন ধরাধরি, কড়াকড়ি হয়,—তুমি এই ভয়ে ঘরে ঐ ষোল ছটাকের সেরটী রাখিয়া দিয়াছ। তুমিও ত ভাই! চোর। তবে আর আমার উপর রাগ করিবে কেন? তুমি হইলে, ক্ষুদ্র-চোর, উঞ্ছ-চোর,—আমি হইলাম, চোর-রাজ! প্রধান সেনাপতির নিকট সামান্য পদাতি যেরূপ, আমার নিকট তুমিও সেই-রূপ। ফল কথা,—উভয়ের বৃত্তি একই। সে যাহাই হউক,—ভাই! তুমি মনে কিছু দুঃখ করিও না। তোমার দোকানে মিষ্টান্নের মধ্যে যাহা কিছু আমার ভাল লাগিবে, তাহাই আমি খাইব;—যত পারিব, উদর পূরিয়া ততই খাইব। ভাই! মনে কিছু করিও না। তোমার দোকানে নগদ যদি টাকা

পাই,—তাহাও লইব। বেশী লইব না,—আবশ্যক মত লইব। ভাই! মনে কিছু করিও না। যতশীঘ্র পারি, তোমার টাকা শোধ দিব। আজ আমার ক্ষুধা প্রবলা। আর থাকিতে পারিতেছি না। গা ঝিম্ ঝিম্ করিতেছে। ভাই! ভোলা নাথ! চাবি ভাঙ্গিতে চলিলাম,—কিছু মনে করিও না।



# অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

কালাচাঁদ পুনরায় চাবিতে হাত দিলেন। একবার চাবিটী নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিলেন। দক্ষিণ হস্তের দৃঢ়-মুষ্টিতে চাবি ধরিলেন। ধরিয়া, এদিক-ওদিক চাহিলেন। তারপর, অমনি চাবিতে এক মোচড়! সুর্‌সা সহিত চাবি ভাঙ্গিয়া কালাচাঁদের হাতে আসিল। ভগ্ন-চাবি কালাচাঁদ নর্দ্দমায় ফেলিলেন।

কালাচাঁদ সন্দেসের ঘরে ঢুকিলেন। ঘর অন্ধকার। কোথায় কোন্ দ্রব্য আছে, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। বিলাতী দেশ্‌লাই থাকিলে, এ সময় কালাচাঁদের সুবিধা হইত। কিন্তু তখন এ দেশে বিলাতী-দেশ্‌লায়ের এরূপ ভাবে আমদানি হয় নাই। তখন ব্যবস্থা ছিল—চকমকির। 'ইস্পাত' দিয়া ঠুক্ করিয়া চকমকির পাথর একবার ঠুকিলেই সোলায় আগুন পড়িত। সেই

সোলায়, টীকা বা কয়লা ধরাইতে হইত। টীকা ধরিলে, দিশি-দেশ্‌লায়ের সাহায্যে প্রদীপ জ্বালা হইত।

কালাচাঁদ নূতন ব্রতী। চৌর্য্য-কার্য্যে নিতান্ত নূতন ব্রতী না হইলেও, এরূপ চাবি ভাঙ্গিয়া রাত্রিকালে চৌর্য্য-কার্য্যে নূতন ব্রতী বটেন। তিনি জানিতেন না যে, চোরের সঙ্গে অগ্নি থাকা একান্ত আবশ্যক। অনভিজ্ঞ বলিয়াই,—তিনি অগ্নি বা কোনরূপ আলোক, সঙ্গে করিয়া আনেন নাই। বলাবাহুল্য, তিনি এ বিষয়ে কোন 'খেয়াল' করেন নাই,—ঘর খুলিলেই রসগোল্লা,—ইহাই তাঁহার ধারণা ছিল;—কিন্তু ঘর খুলিলেই যে, অন্ধকার,—ইহা তিনি ভাবিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

সুবিধার মধ্যে, তখনও থাকিয়া থাকিয়া এক একবার ঈষৎ বিদ্যুৎ চমকিতে ছিল। যদি মেঘে মেঘে ঘোরতর সংঘর্ষণ হইয়া, এ সময় ভীষণা চপলা চমকিয়া বজ্রাঘাতও হইত, তাহা হইলে কালাচাঁদের আরও সুবিধা ঘটিত। কেন না, তিনি

এখন চাহেন—অধিক আলোক!—তা, বজ্রাঘাতও না-জানি, মহাপ্রলয়ও না-জানি!

দুঃখ এই, বজ্রাঘাত হইল না;—মেঘের কোলে বসিয়া সৌদামিনী মাঝে মাঝে কেবল মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। মন্দের ভাল বটে। কালাচাঁদের কিঞ্চিৎ সুবিধা হইল। অদূরে চক্‌মকি নজর হইল। পাথর, সোলা, ইস্পাত, কয়লা—সমস্তই তিনি আভাসে দেখিতে পাইলেন। গুড়ি মারিয়া যাইয়া, তিনি হাতড়াইয়া চক্‌মকি ধরিলেন। ধরিয়া, ভাবিলেন,—লাভ যে কিছুই হইল না দেখিতেছি। চক্‌মকি ঠুকিব কেমন করিয়া? ঠুকিলেই যে, শব্দ হইবে। রাত্রিকালে, চোর চুরি করিতে আসিয়া, গৃহস্থের গৃহে বসিয়া চক্‌মকি ঠুকিবে কেমন করিয়া? আর, এই ঘরের দ্বারইবা কতক্ষণ খোলা রাখিব? দরজা এখনি বন্ধ করিয়া দেওয়াই উচিত! কিজানি যদি কোন পথিক এপথ দিয়া চলিয়া যায়,—তাহা হইলেত আমাকে ধরিয়া ফেলিবে। ধরিতে অবশ্যই পারিবে না। তবে আহারটা হইবে না—এইমাত্র।

কিন্তু, দরজা বন্ধ করিয়া দিলেত,—ঘরটী ঘোর অন্ধকারময় হইবে। আমি এই আঁধার রাশির মধ্যে একা নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়াইবা কি করিব ?

চকমকিও ঠোকা হইবে না, দরজাও বন্দ করিতে হইবে,—অথচ চাই আলোক। এ-মহা সমস্যার কেমন করিয়া মীমাংসা করিব ?

আচ্ছা, হাঁড়িগুলা হাতড়াইয়া দেখি না কেন ? মিষ্টান্নপূর্ণ একটা হাঁড়ি পাইলেই আমার যথেষ্ট হইবে।

কিন্তু এক ভয়। কোথায় কি আছে, কিছুই জানি না। কোন্ জিনিস কিরূপ ভাবে সাজান আছে, তাহাও অবগত নহি। যদি হাতড়াইতে-হাতড়াইতে হাঁড়িগুলা হুড়মুড় করিয়া পড়িয়া যায়—তাহা হইলে ত সর্ব্বনাশ। অথবা অন্ধকারে আমি যদি রসের ডাবার ভিতর দুম্ করিয়া পড়িয়া যাই,—তাহা হইলে, সে-ও এক কম ব্যাপার হইবে না।

আরও এক বিষম অভাব দেখিতেছি যে। তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে। জল কোথা পাই? আগে জল চাই! সুধু সন্দেস লইয়া কি করিব? সন্দেসগুলা খাইলে ত আরও অধিক পিপাসা পাইবে। সন্দেসইবা গলাধঃকরণ হইবে কেন?

কালাচাঁদ কাতর হইলেন। এসময় কি যে করিবেন,—তাহার কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না। একবার ভাবিলেন,—বাহির হইতে একটা আলোর যোগাড় করিয়া আনি না কেন? কিন্তু এরাত্রে আলোক কোথায় পাইব? গৃহস্থকে গিয়া কি বলিব,—'অগো! আমার চুরির ভাল সুবিধা হইতেছে না, তোমরা একটা আলো দাও?' তাও কি কখন হয়?—আর, এরূপ যোগাড়যন্ত্র করিতেই যে, রাত পোহাইয়া যাইবে।

ক্ষুৎপিপাসাশ্রমাতুর কালাচাঁদ বিষম সঙ্কটে পতিত হইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতেছেন,—এমন সময় আবার সৌদামিনী ঝলসিল। কালাচাঁদ দেখিলেন, তাঁহার ঠিক বামপার্শ্বেই উনান। উনানে আগুন

নাইত?—একটুও কি আগুন থাকিবে না? কালাচাঁদ বসিলেন। উনানের ভিতর হাত দিলেন। কৈ উনান-ত বেশী গরম নয়? তবে কি হতভাগার অদৃষ্টে কিছুতেই আজ আগুন মিলিবে না? বোধ হয়, আমি মরিলে, আজ আমার মুখাগ্নিরও আগুন পাওয়া যায় না।

কালাচাঁদ অদ্য অদৃষ্টবাদী, পরকালবাদী না হইলেও, এ অন্তিমে, মনভ্রমে,—অভ্যাস নিবন্ধন—ভাগ্যের কথা, অদৃষ্টের কথা তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল। অন্তিমকাল বড় কঠিনকাল।

কালাচাঁদ এইরূপ ভাবিতেছেন, আর উভয় হস্ত-দ্বারা উনান হইতে পাঁশ তুলিয়া বাহিরে রাখিতেছেন। সর্ব্বাঙ্গ পাঁশে আচ্ছাদিত হইল। নাকে, মুখে, চোখে পাঁশ প্রবেশ করিল। তথাচ কর্ম্মে তাঁহার অবহেলা নাই। একাগ্রমনে যোগীপুরুষের ন্যায়, তিনি পাঁশ-বহিষ্করণ-কার্য্যে নিযুক্তই হইয়া রহিলেন।

হঠাৎ কালাচাঁদের হাতে গরম ঠেকিল। অমনি আনন্দে তাঁহার মন লাফাইয়া উঠিল। মনে মনে মহোল্লাসে বলিলেন "পেয়েছি, পেয়েছি!—আগুন নিশ্চয় আছে। আর ভাবনা কি?" ধীরে ধীরে অতি যত্নের সহিত, তাঁহার অগ্নিতে তিনি হাত দিলেন। অগ্নি এখন প্রাণের ন্যায় প্রিয়মত বস্তু,—সুতরাং হাত দিয়া সেই অমূল্য অগ্নিকে টিপিয়া ধরিতে তাঁহার কষ্টবোধ হইল না। হাতে যে 'জ্বালা' লাগিতে লাগিল, তাহা তিনি তাদৃশ অনুভব করিতে পারিলেন না। এখন জ্বালাও মিষ্টি!

কালাচাঁদ সেই অগ্নিকে বাহিরে আনিয়া তাঁহার সম্মুখে ধরিলেন। কিন্তু সেই ঘোর অন্ধকারে সেই অগ্নির ত কোনরূপ আলোক দীপ্তি পাইল না। কালাচাঁদ ফুঁদিতে লাগিলেন। তাহাতেও অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল না। সেই অগ্নি, উনানের ভিতরে যত গরম ছিল, বাহিরে আনা হইলে, সে, আর তত গরম রহিল না। কালাচাঁদ তখন

তু-ই হাতে করিয়া নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিলেন,—অনুভবে স্পষ্টত বুঝিলেন,—"ইহা আগুন নহে,—একটা লোহা-ভাঙ্গা। বোধ হয় কড়া-ভাঙ্গা হইবে। উনানে কখন্ হয়ত পড়িয়া গিয়া থাকিবে।"

ক্রোধে কালাচাঁদ সেই উত্তপ্ত ভগ্ন লৌহখণ্ডকে নর্দ্দমায় নিক্ষেপ করিলেন। বলিলেন, "তুমি আমার সহিত বড়ই প্রবঞ্চনা করিয়াছ। তুমি নর্দ্দমা-রূপ নরকে গিয়া বারমাস বাস কর।"

কেহ যদি নৈরাশ্যের জীবন্ত ছবি দেখিতে ইচ্ছা করেন, তবে তিনি এইবার—শীঘ্র কালাচাঁদের মূর্ত্তি অবলোকন করুন। হস্ত-পদ শিথিল, নিস্পন্দ নয়ন,—মুখটী যেন গুটাইয়া গিয়াছে,—কোমরে যেন কে লাঠীর আঘাত করিয়াছে,—চোখের কোল বসিয়াছে, চড়াইয়া কে যেন গালটী ভাঙ্গিয়া দিয়াছে—সর্ব্ব-শরীর চুপ্‌ষিয়া গিয়াছে। যদি কাহারও সাধ থাকে, তবে এই বেলা এ ছবি দেখিয়া লউন।

কিন্তু অধিকক্ষণ এ ভাব রহিল না। দেখিতে

দেখিতে মূর্ত্তি পরিবর্ত্তিত হইল। কালাচাঁদ ক্রমশ বল পাইয়া যেন একটু সুস্থ হইলেন।

কালাচাঁদ ভাবিলেন, "লৌহ-খণ্ডটা যখন প্রথমে খুব গরম ছিল, তখন নিশ্চয়ই উনানের ভিতর আগুন আছে। আগুন না থাকিলে, লোহাটা এরূপ গরম থাকিবে কেন? উনান-মধ্যে গণ্‌গণে আঙরা অবশ্যই নাই। তবে পাঁশের ভিতর একটু-আধটু অগ্নি বা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ অবশ্যই আছে। আর পাঁশ বাহির করা হইবে না,—ঘাঁটাঘাঁটিতে, যে আগুন-টী এখনও আছে, তাহা নিবিয়া যাইতে পারে। চক্‌মকীর সোলা ও টীকা সংগ্রহ করা—অগ্রে আবশ্যক।"

কালাচাঁদ তখন বামহস্তে টীকা ও সোলা রাখিলেন। মুখটী ঠিক উনানের মুখে দিলেন। ডানহাতটী উনানের ভিতর ঢুকাইয়া আগুন খুঁজিতে লাগিলেন।

আবার হাতে গরম ঠেকিল। অগ্নিস্ফুলিঙ্গও দৃষ্ট হইল। কালাচাঁদের হৃদয়ে আবার হর্ষোদয় হইল।

সত্যসত্যই এবার কালাচাঁদ সোলা ধরাইলেন। সোলার অগ্নি টীকায় আসিল। কালাচাঁদ হাসিয়া ভাবিলেন,—"আগে, একবার তামাক খাইলে হয় না?"

উনানের পাশেই ঘিয়ের কড়াই ছিল। তাহাতে ঘি কিছুই ছিল না,—তবে কড়াইটা ঘি মাখান বটে। কালাচাঁদ আপনার কাপড়ের কোঁচার দিক্‌টা খানিক ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। সেই ছিন্ন কাপড়টুকু ঘিয়ের কড়ায় বারকয়েক বুলাইলেন। কাপড় বেশ ঘৃতাক্ত হইলে, তাঁহার লাঠীর মুখে সেই কাপড় বাঁধিলেন। দিব্য মশালের মত হইল। কালাচাঁদ কৌশলে তখন টীকা ও সোলার সাহায্যে তাহাতে আগুন জ্বালিয়া দিলেন। বেশ আলো হইল।

বলা বাহুল্য, ইতিপূর্ব্বেই তিনি সদর-দরজা বন্দ করিয়াছিলেন। আলোক জ্বালা হইলে ভাবিলেন, আগে খিড়কীর দরজাটা খুলিয়া রাখিয়া আসা উচিত। তিনি তখন সেই জ্বলন্ত মশাল লইয়া, দোকান ঘরের চারিদিক্‌ 'দেখিতে দেখিতে

চলিলেন। প্রথম ঘর পার হইয়া আর একটী ঘরে পড়িলেন। সেই দ্বিতীয় ঘরের সম্মুখেই একটী ক্ষুদ্র উঠান। সেই উঠানে এক কূপ। কূপের নিকট জল তুলিবার দড়ী এবং ঘটী।

কালাচাঁদের স্নান করিবার সাধ হইল। মশাল-টীকে ঘরের এককোণে তখন লুকাইয়া রাখিলেন। উল্লাসে কূপের নিকট স্নান করিতে বসিলেন। ধীরে ধীরে জল তুলিয়া প্রায় বিশ ঘটী জল মাথায় দিলেন। অঙ্গের মলা দূর করিলেন। স্নানে যেন পুনর্জীবন প্রাপ্ত হইলেন। নবজীবন পাইয়া, কালাচাঁদ খিড়কী-দ্বারের খিল খোলা তত আবশ্যক বিবেচনা করিলেন না।

স্নানান্তে ভাবিলেন, "একটু নেবুর সরবৎ পাই ত খাই।" নেবু মিলিল না, কিন্তু তিনি বাতাসা ভিজাইয়া সরবৎ করিয়া খাইলেন।

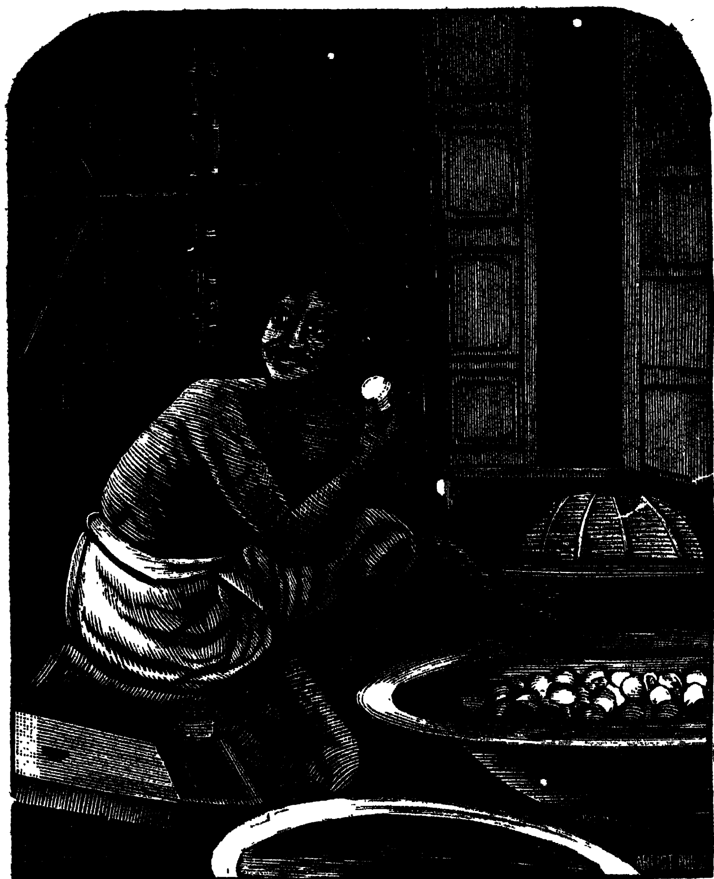
তারপর দুইখানি কম্বলাসন যুড়িয়া পাতিলেন। বৃহৎ একখুলি রসগোল্লা আনিয়া সম্মুখে রাখিলেন। এক ধামা সন্দেস এবং এক হাঁড়ী ক্ষীর আনিলেন।

এত উদ্যোগের পর কার্য্যারম্ভ। কালাচাঁদ প্রথমত সেই পাতলা ক্ষীর এক হাঁড়ী খাইয়া গলাটা সরল করিয়া লইলেন। তারপর রসগোল্লার বড় খুলিখানা সম্মুখে আরও একটু সরাইয়া আনিয়া, টপাটপ্ সপাসপ্-রূপে শীঘ্রহস্তে শুভকার্য্যে মনঃসংযোগ করিলেন। রসেভরা বড় বড় রসগোল্লা এক একটী করিয়া মুখে এই ফেলেন, আর এই নাই! আবার মুখে ফেলেন,—তখনই মুখে আর তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। যেন যাদুমন্ত্রে রসগোল্লাগুলা উড়িয়া যাইতে লাগিল। তাঁহার দক্ষিণ-কর মুখ-গহ্বরে রসগোল্লা নিক্ষেপ-কার্য্যে যেরূপ তৎপর, মুখ-গহ্বরও তাহাকে উদর-রসাতলে পাঠাইতে সেইরূপ, বা তদপেক্ষা অধিক তৎপর।

কালাচাঁদের প্রাণ কঠিন হইলেও, তিনি এক একবার চমকিতে লাগিলেন। ব্যবসার অদ্য প্রথম আরম্ভ,—হাতে-খড়ি,—তাই বুঝি এক একবার হাত কাঁপিতে লাগিল।

এসব কার্য্যে কালাচাঁদের অভ্যাস ত বেশী

কালাচাঁদের রসগোল্লাভক্ষণ।



নাই,—কোথায় একটী ইন্দুর নড়ে;—তিনি মনে করেন, ভোলাময়রা বুঝি আসিতেছে। বাদুড় উড়িয়া যায়, তিনি মনে করেন, তাঁহাকে বুঝি কে ডাকিতেছে!

যে কারণেই হউক, কালাচাঁদ সমুদায় রসগোল্লা খাইলেন না। যতগুলি খাইলে, রাত্রির ক্ষুধা সহজভাবে নিবৃত্তি পায়, ততগুলিই উদরস্থ করিলেন।

রসগোল্লা ভক্ষণ-কার্য্য প্রথমত যেন ডাকগাড়ীর বেগে আরম্ভ হইয়াছিল,—কিন্তু হঠাৎ সে বেগ নরম হইল। যেন গাড়ীর চাকা ভাঙ্গিয়া গেল। সে ভীম ভৈরব বেগ যদি আর অর্দ্ধদণ্ডকাল থাকিত, তাহা হইলে আধখানি রসগোল্লাও পড়িয়া থাকিত কি না সন্দেহ,—খুলিখানি পর্য্যন্ত থাকিত কি না, তাহাতেও কিঞ্চিৎ সন্দেহ!!

কালাচাঁদ রসগোল্লার পর সন্দেস ধরিলেন। দুইটী সন্দেস মুখে দিয়া বলিলেন,—"ভোলানাথ! একটু দই দিতে পার? তোমার যদি দই নাই, তবে সন্দেস খাবো কেমন ক'রে? এমন নিমন্ত্রণ

করা কেন? দূর কর! আর খাবো না!—এই রাগ করিয়া উঠিয়া পড়িলাম। দাও, ভোলাবেটার ক্ষীরের হাঁড়ি ভেঙ্গে।”

ক্ষীর-ভাণ্ড ভাঙ্গিয়া কালাচাঁদ ভোলানাথের বাক্স ভাঙ্গিলেন। বাক্সে অনেকগুলি টাকা থাকিলেও, আটটী টাকা, তিনটী সিকি এবং চারিগণ্ডা পয়সা ব্যতীত আর কিছুই লইলেন না।

আপন জিনিসপত্র সমস্ত বুঝিয়া লইয়া, কালাচাঁদ ভিজা কাপড়ে ভোলানাথের দোকান-ঘর পরিত্যাগ করিলেন।



# ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

কালাচাঁদের দশগুণ বল বৃদ্ধি হইল। ব্যবসারম্ভের প্রথম দিনেই প্রচুর ফললাভ,—কালাচাঁদের বলবৃদ্ধি হইবে-না' ত কি? আজ নবীন সেনাপতি প্রথম যুদ্ধে জয়লাভ করিল,—আনন্দ-উল্লাসের কি আর অবধি আছে?

ক্ষুধা নিবৃত্তি হইল,—ক্লান্তি দূর হইল,—হৃদয়ে আনন্দ উথলিয়া উঠিল,—কালাচাঁদ গজেন্দ্র-গমনে পুনরায় সেই কাছারির ঘাটে গেলেন। রাত্রি তখন তৃতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে ঘাটের যে পৈঁঠায় বসিয়া পাপ-পুণ্য, চোর-সাধু, সত্য-মিথ্যার বিষয় ভাবিয়াছিলেন,—যেস্থলে বসিয়া তিনি 'চুরি-করায় দোষ নাই'—এই মীমাংসায় উপনীত হইয়াছিলেন;—কালাচাঁদ গিয়া ঠিক সেই-খানেই বসিলেন। এক প্রহর পূর্ব্বে যেখানে সিয়া কত অশ্রু-বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, এখন

সেখানে বসিয়া পরমসুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। আগে ছিল, সংসার তাঁহার পর; এখন হইল, সংসার তাঁহার আপনার। এই বিশ্বসংসারের সমগ্র পর-দ্রব্য তাঁহার আপনার হইল। অহ্লাদ-সলিলের নদী না বহিবে কেন?

কালাচাঁদ ভাবিতে লাগিলেন,—"কোম্পানীর এই কালেক্টরীতে যত-লক্ষ টাকা আছে,—সমস্ত আমারই; কেবল কৌশলে লইতে পারিলেই হইল। ব্রজনাথ বড়াল, এক আনা, দুই আনা সুদে টাকা ধার দিয়া,—এখন কোটীপতি; তাহার নিকট হইতে অন্তত পাঁচ আনা ভাগ চাহিব;—না দেয়, বুদ্ধির জোরে কাড়িয়া লইব। এ অঞ্চলে যত লোক আছে, তাহাদের প্রত্যেকের নিকট হইতে, অবস্থা-নুসারে ৫৲, ১০৲, ২৫৲, ১০০৲—অধিক কি, এক হাজার টাকা পর্য্যন্ত 'চৌথ' আদায় করিব। আমার টাকার অভাব কি? যদি তেমন কিছু অভাব হয়,—তবে একদিন ঠাকুরদাদার লোহার সিন্দুকটা মাথায় করিয়া তুলিয়া আনিসেই চলিবে। লো'

মহাভিড়। প্রায় আড়াই শত নরনারী উপস্থিত। সকলেই অগ্রগামী হইয়া, গাছের গুঁড়ির কাছে যাইবার জন্য উদ্যত। এজন্য বিলক্ষণ ঠেলাঠেলি, অল্পস্বল্প কিলোকিলিও হইতেছে। কতকগুলি অদূরে-দণ্ডায়মান দর্শক, ব্যাপার কি, জানিবার জন্য বিষম ব্যস্ত। উৎকণ্ঠার সীমা নাই। কিন্তু কার সাধ্য ব্যূহ-মধ্যে প্রবেশ করে? এই ভিড়ের ভিতর মেয়ে আছে, ছেলে আছে, বুড়া আছে, বুড়ী আছে, নেড়া আছে, নেড়ী আছে, যুবা আছে, যুবতী আছে। নাই কি?

একটা লোক হাঁপাইতে হাঁপাইতে বহু কষ্টে ভিড় ঠেলিয়া বাহিরে আসিল। তার গায়ে লাল রঙ্গের ছিটের আংরাখা; পায়ে নাগরা জুতা; মাথায় চাদর জড়ান; পরণে একটু-ওসারে-খাটো রাঙ্গা-পেড়ে ধূতি। লোকটা আসিয়াই আপন মনে বলিতে লাগিল, "ভিড়ের ঠেলায় মরে গেছলুম আর কি?—ভিতরে ব্যাপার কিন্তু অতি আশ্চর্য্য।—"

একজন জিজ্ঞাসিল, "ভিতরে কি কাণ্ডটা হচ্চে, বল দেখি?"

উত্তর। অতি আশ্চর্য্য! অতি আশ্চর্য্য! বড়ই অদ্ভুত!—

প্রশ্ন। কি?—কি?—কি?—

উত্তর। কোথা হইতে এক পরম সন্ন্যাসী এসেছেন। তিনি পৃথিবীর সর্ব্ব তীর্থ ভ্রমণ ক'রে বেড়াচ্চেন,—এই পথে শ্রীক্ষেত্র যাবেন। আজ এখানে থাক্‌বার জন্য তাঁকে এখানকার অনেকেই অনুরোধ কর্‌লেন; তাই তিনি রাসতলায় রাত্রিবাস ক'র্‌বেন বলেছেন। বাবুরা দোতলার বৈঠকখানায় রাখ্‌বার জন্য তাঁকে অনেক সেধেছিলেন। কিন্তু সন্ন্যাসী বল্লেন, বৃক্ষতলাই আমার রাজবাটী।

প্রশ্ন। সন্ন্যাসী কি খান? কি করেন?

উত্তর। তিনি কিছুই খান না। অনেক ভক্ত তাঁর সম্মুখে রাশীকৃত সন্দেস সাজিয়ে দিয়েছিল;—কিন্তু তাহার তিনি একটীও স্পর্শ করেন নাই। হাসিয়া বল্লেন, আমার কিছুই দরকার

নাই। তখন তাঁর চেলারা সন্দেসগুলো এক-পাশে সরিয়ে রেখে দিলে। সাধু পুরুষ! সাধু পুরুষ!!

প্র। ওখানে বসে তিনি কি কচ্চেন?

উ। সদা ভগবানের নাম জপ কচ্চেন, আর ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান গণনা করে বলে দিচ্চেন! অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার! এই দেখুন না কেন? আমার বাড়ী হ'লো নদে জেলা,—আমার সঙ্গে ওঁর কস্মিন্‌কালে দেখা শুনো নাই—আমি প্রণাম করে দাঁড়াতেই খুসী হয়ে সন্নেসী বোল্লেন,—'এস, এস হরিদাস এস,—ব'স।' আমি ত "থ" হয়ে দাঁড়িয়ে ভাব্‌তে লাগ্‌লেম—'সন্নেসী আমার নাম জান্‌লেন কি করে?'

প্র। বলেন কি মোশাই?—তাঁর অতি আশ্চর্য্য ক্ষমতা বল্‌তে হবে ত?

উ। আশ্চর্য্য নয় ত কি? দেখ্‌লে একবারে অবাক্ হয়ে যাবেন! একজন বোবা এসে সন্নেসীর কাছে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো। তা দেখে, ঠাকুরজীর

দয়া হ'লো। তিনি তার মুখে হাত বুলাইয়া মন্তর আওড়াতে লাগ্‌লেন—আর পাঁচ মিনিটের মধ্যে তার কথা ফুট্‌লো। সে লোকটা এখনও ঠাকুরজীর কাছে বসে আছে—আর মাঝে মাঝে তাঁর পদ-সেবা কর্‌চে। সন্নেসীকে দেখ্‌বেন যদি, তবে এইবেলা যান।

প্র। ভিড় ঠেলে ঢুকি কি করে?

উ। আসুন তবে আমার সঙ্গে!—কুনুয়ের গুঁতো দিয়ে ঠেল্‌তে ঠেল্‌তে চলে যাব, তার আর ভাবনা কি?

যাঁহার সহিত হরিদাসের কথাবার্ত্তা হইতেছিল, তিনি গরিফার কলে কাজ করেন! একটু সর্দ্দারী-গোছ চাক্‌রী,—বেশ দু-টাকা রোজগারও আছে। তাঁর সঙ্গে সাত আট জন কলের কারিকর আছে। তিনি হরিদাসকে জিজ্ঞাসিলেন, "মহাশয়ের নামটী কি বোল্লেন,—ভুলে গেছি!"

হরিদাস হসিয়া বলিলেন,—"আমার নাম হরিদাস পরামাণিক। কেষ্টনগরের রাজবাটীতে আমার

বারমাস থাকা হয়। রাজা আমাকে বড় ভাল বাসেন। এক দিনের তরেও আমাকে কোথায় যেতে দেন না।· আমার ইস্তিরীর ব্যারাম হয়েচে ব'লে, ছুটি নিয়ে, আমি লুকিয়ে ম্লাস দেখ্‌তে এসেছি।”

ঈষৎ থামিয়া, একবার এদিক-ওদিক চাহিয়া হরিদাস প্রশ্ন করিলেন, “মহাশয়ের নামটী কি? আপনাকে যেন কোথায় দেখেচি বলে আমার মনে হচ্চে—”

উ। আমার নাম প্রেমচাঁদ দাস—এই কলেই আমি থাকি। কল্‌কাতায় দেখে থাক্‌বেন বলে বোধ হচ্চে। আমার বড় ছেলেকে কল্‌কাতার কলেজে পড়্‌তে দিয়েচি—কাজেই মধ্যে মধ্যে তথায় যাওয়া-আসা কর্ত্তে হয়,—

হরিদাস। ছেলেপিলেকে ইংরেজী না শেখালে কি আজকাল কিছু হবার যো আছে? তা বেশ করেছেন,—অতি উত্তম কাজ হয়েছে! মোশায়ের কি ঐ একটী সন্তান?

প্রেমচাঁদ। দুই পুত্র, তিন কন্যা। ছোট ছেলেটীর জন্য আমি বড় কষ্টে আছি। তার দুটী চোখেই ছানি পড়্‌বার যোগাড় হয়েচে। দেখি, যদি সন্ন্যাসী ঠাকুর কিছু এর উপায় কত্তে পারেন।

একদল স্ত্রীলোক, এই সব কথা হাঁ করিয়া গিলিতেছিল। বোধ হয়, আধা-ছানার মণ্ডা অপেক্ষা এ কথা তাহাদের অধিক মিষ্ট লাগিতেছিল। ঐ দলমধ্যস্থ একজন বর্ষীয়সী স্ত্রীলোক হরিদাসকে কাতরভাবে জিজ্ঞাসিল, "বাছা আমরা কি সন্নিসীকে একবার দেখ্‌তে পাবো না?—আমার নিজের জন্য বলি নাই,—(একটী পার্শ্বস্থ, আধঘোমটা-দেওয়া যুবতী স্ত্রীলোকের গায়ে হাত দিয়া দেখাইয়া)—এই মেয়েটীর একবার হাতটা দেখাতাম। এতে দু-টাকা দু-সিকে খরচ হয়, তাও এখনি দিতে আমি রাজী আছি।"

হরিদাস চমকিয়া উঠিয়া জিহ্বা কাটিয়া বলিলেন, "ছি ছি ছি! পয়সার নাম শুন্‌লে

তিনি রাগ করেন। তবে তাঁর ঠাকুরকে কিছু প্রণামী দাও, ভোগ দাও—তাঁর চেলাগণকে গাঁজা খেতে কিছু দাও,—সে স্বতন্ত্র কথা। এবার তোমাদিগে ভিড়ের মধ্যে কিছুতেই নিয়ে যেতে পারবো না। আগে বাবুদিগে দেখাই; তারপর যদি সময় থাকে, তোমাদিগে নিয়ে যাবো। তোমরা এইখানে দাঁড়াও।"

এই কথা বলিয়া হরিদাস, প্রেমচাঁদ প্রভৃতিকে লইয়া বীরদাপে ভিড়ের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা অদৃশ্য হইবামাত্র, আর দুইটী লোক, সেই স্ত্রীলোকদুইটীর সম্মুখে আসিয়া আপনা-আপনি হাসিতে খেলিতে, নাচিতে লাগিল। তন্মধ্যে যেটী বয়োবৃদ্ধ, সেটী আপন মনে বলিতে লাগিল, "হায় হায়! সন্নেসী নয় ত—ঠিক যেন কাঁচা—জীয়ন্ত দেবতা!—পাঁচ বছর হ'লো আমি এই ছেলে-টীকে হারিয়েছিলুম। সন্নেসীর কাছে এসে দড়াম্ করে পড়ে কেঁদে বল্লুম,—'ঠাকুর! তুমি আমার ছেলে না এনে দিলে, আমি উঠবো না—এইখানে

হতো হবো।’ সন্নেসী হেসে তিনবার ‘আয়, আয়, আয়’ ব’লে ডাক্‌লেন :—আর, অমনি এই ছেলে এসে একেবারে আমার কাছে উপস্থিত। আমার কাছে তখন বেশি পয়সা ছিল না, চেলাদের এক টাকা সন্দেস খেতে দিয়ে চলে এলাম।”

সেই বয়োবৃদ্ধা স্ত্রীলোকটী তাহাকে জিজ্ঞাসিল,—“বাবা! এই মেয়েটীকে একজন খুব ভালবেসেছিল,—কিন্তু ছমাস তার কোন খবর পাওয়া যায় নাই। সন্নেসীর কাছে গেলে এর কোন উপায় হতে পারে কি?”

এইরূপে সেই পিতা-পুত্রের সঙ্গে সেই মেয়েদলের অনেক কথাবার্ত্তা হইল। পরস্পরের সহিত পরস্পরের আলাপ-পরিচয়-ভাব হইল। নাম-ধাম-ঠিকানা কেহ কাহারো জানিতে ত্রুটি করিল না। অবশেষে পিতা-পুত্র, সেই মেয়েদলকে সঙ্গে লইয়া ভিড়ের মধ্যে ঢুকিল।

সন্ন্যাসীর প্রাদুর্ভাবে আজ প্রকৃত রাস-তলায় লোক কম হইয়াছে। দোকানের জিনিসপত্র ভাল

বিক্রয় হইতেছে না। অধিকাংশ লোকেই বেগে সন্ন্যাসীর দিকে ছুটিয়াছে।

ধন্য সাধু সন্ন্যাসী! আর, ধন্য লোকের তরল মন!! গণৎকার বা ভবিষ্যৎবক্তা,—লোকের এমন মনোহরণ করে কেন? লোক এমন অন্ধ হইয়া দৌড়ায় কেন?

দেখিতে দেখিতে প্রায় পাঁচশত লোক সন্ন্যাসীকে ঘেরিল।

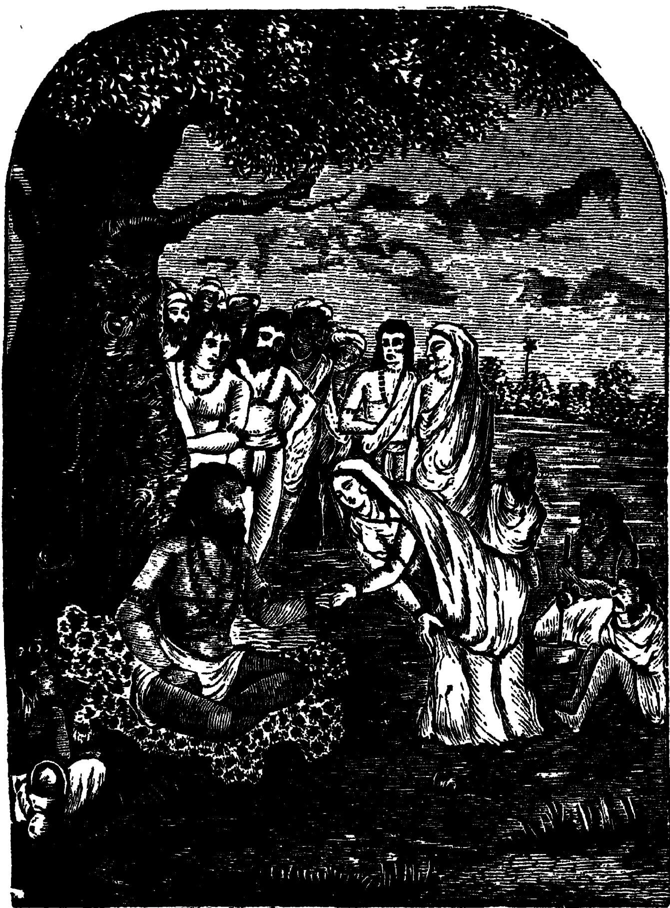


# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সন্ন্যাসী, বটবৃক্ষমূলে উপবিষ্ট। সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম মাখা। আসন বাঘছাল, পরিধান বাঘছাল। মস্তকে জটাভার। দাড়ী বিলম্বিত। নেত্র ঢুলু ঢুলু। হৃষ্টপুষ্ট, দীর্ঘকায়, কৃষ্ণবর্ণ। হস্তে ত্রিশূল। মুখে সদা—কখন ধীরে, কখন উচ্চরবে—'শিবো শিবো, শিবো' করিতেছেন। সন্ন্যাসীর কথা কখন বাঁকাবাঁকা বাঙ্গালা, কখন আধা-বাঙ্গালা আধা-হিন্দি। চারি ধারে আধ হাত পরিমিত স্থান লইয়া 'গণ্ডী' দেওয়া। দক্ষিণে এক প্রকাণ্ড মহাদেব-মূর্ত্তি; বামে শিষ্যগণ অবস্থিত। কখন শঙ্খধ্বনি হইতেছে; কখন কাঁসর-ঘণ্টা বাজিতেছে; কখন বা ধূপধূনা গুগ্‌গুলের সৌরভ চারিদিকে ছুটিতেছে। এক সমারোহ কাণ্ড!

সন্ন্যাসীর আজ্ঞাক্রমে দেবতার ভোগের পর, একজন চেলা, ভিক্ষুকগণের উদ্দেশে এক রাশি

বটবৃক্ষমূলে সন্ন্যাসী।



[ ৫৫১।

সন্দেস ছড়াইয়া দিল। দর্শকমণ্ডলী মধ্যে অনেকেই সন্ন্যাসীর এই নিঃস্বার্থপরতা এবং নিষ্কামধর্ম্ম দেখিয়া নিরন্তর "সাধু, সাধু" বলিতে লাগিল। সন্দেস বিতরণের পর অন্য একজন চেলা আট আনার পয়সা ছড়াইয়া দিল। লোকসকল, 'অবাক' হইয়া বলাবলি করিল,—"সন্ন্যাসী পরমভক্ত—সাধু,—নিস্পৃহ—দেবাংশে জন্ম।"

তখন আবার গণনা আরম্ভ হইল। একটী অষ্টাদশবর্ষীয়া রমণী আধ-সিকি-ভরি ঘোমটা দিয়া গণাইতেছেন। তাঁহার দুই পার্শ্বে দুইটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক। তন্মধ্যে একটী স্ত্রীলোক একজন চেলাকে বলিতেছে, "বাবা, দুটী টাকা বৈত আনি নাই;—এই এখন নিয়ে ঠাকুরের ভোগ দাও; মেয়েটী যদি ওর সোয়ামীকে ফিরে পায়, তা'হলে এক থান মোহর প্রণামী দিয়ে বাবার ষোড়শোপচারে পূজা দিব।"

এই কথা শেষ না হইতেই সন্ন্যাসী, রমণীর করকমল ধরিয়া বলিলেন, "মায়ী! তোহার

নামটী বুঝি গুলাব্ কামিনী!—ঠিক্ বলিস্ মায়ী।”

রমণী, অপরিচিত সন্ন্যাসীর মুখে তাঁহার প্রকৃত নাম শুনিয়া, শিহরিয়া উঠিলেন। মৃদুস্বরে বলিলেন, “হ্যাঁ ঠিক।”

সন্ন্যাসী পুনরায় হাসি হাসি মুখে বলিতে আরম্ভ করিলেন,—“মায়ী! তোহার কুছ ভয় নেহি,—পাবি, পাবি—ফিরে পাবি! মায়ী! তোর মনটী খুব ভাল আছে। তুই পরের ভাল করতে যাস্, কিন্তু তোহার ভালো কেহু করছে না। তোর যশোভাগ্যি কম্‌তি আছে, মায়ী!—”

ক্রমশই সন্ন্যাসীর উপর রমণীর ভক্তি বাড়িতে লাগিল। সন্ন্যাসী তখন হৃষ্টচিত্তে বলিলেন, “মায়ী! তুহি মন্‌মে মন্‌মে একটা ফুলের নাম্ কর্ দেখি?—এঃ এঃ মায়ী, তুই এক ফুলকো নাম্ মনে কর্‌কে, আউর দোস্‌রা ফুলকো নাম্ বদল কিয়া কেঁউ?”

তখন সন্ন্যাসীর যেন একটু ক্রোধভাবের

উদয় হইল। রমণী অধিকতর আশ্চর্য্যান্বিতা হইলেন। বাস্তবিকই প্রথমে যুঁই ফুলের নাম মনে করিয়া, শেষে তাহা গেঁদায় পরিবর্ত্তন করেন। সন্ন্যাসী বলিলেন "থাক্ থাক্ মায়ী!—আর ফুলকো নাম কর্‌তে হইবে নেই,—সাতদিনকে ভিতর্‌মে, তোহার সোয়ামী মিল্‌বে, হামি মন্তর বলে দিচ্চি,—(হস্তে জল লইয়া)

জলে উড়ম জলে পড়ম জলে দিয়া পাঁও।
এই জল পড়ে দিলে কামিখ্যে চণ্ডী মাঁও॥
সোয়ামী হ'লো তোহার আকাশের চাঁদ।
এই জল ছুঁলে তুই ঘরে পাবি জীল॥
ভাত দিবে কাপড় দিবে, দিবে তোরে কাঠ।
গুলাবীর আর তার একই শ্মশান ঘাট॥
শ্রীগুরু রামদাসের আজ্ঞা পাঁও।
এই জল না ফলেতো পুতের মাথা খাঁও॥

এই মহামন্ত্র উচ্চারণানন্তর সন্ন্যাসী, সেই জল রমণীর গাত্রে ছড়াইয়া দিয়া বলিলেন, "তুই ঘরে যা মায়ী—মিল্‌বে, মিল্‌বে!—পাবি—পাবি—পাবি!

রমণী উঠিয়া যাইবার সময় পার্শ্বস্থ বৃদ্ধার কাণে কাণে বলিলেন, "তোমার কাছে আর একটী টাকা আছে নয়? সন্নেসী জাগ্রত দেবতা,—সে টাকাটীও দাও।" বৃদ্ধা, টাকাটী লইয়া সন্ন্যাসীকে দিতে গেল। সন্ন্যাসী একটু যেন কুপিত হইয়া অথচ হাসিয়া বলিলেন,—"মায়ী! হামি পয়সা নেহি মাঙ্গতা। পয়সায় হামারা কেয়া কাম আছে।"

একজন চেলা দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল,—"মায়ী! তুই কি কর্‌চিস্—টাকার কথা শুনলে, সন্ন্যাসী রেগে এখনি তোকে ভস্‌মো করে ফেলবে! টাকা এইদিগে দে—এইদিগে দে—বাবার ভোগ হবে।"—এই বলিয়া সেই ব্যক্তি ক্ষিপ্রহস্তে, বৃদ্ধার হস্ত হইতে টাকাটী তুলিয়া লইল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। সন্ন্যাসীর সম্মুখে দাউ দাউ দুইটা মশালের আলো জ্বলিতেছে। শিষ্যগণ ঘোষণা-প্রচার করিল, "সন্ন্যাসী আজ আর গণনা করিবেন না—এইবার তিনি ধ্যানে বসিবেন—সমস্ত রাত্রি ধ্যান হইবে, কাহারও সহিত

কথা কহিবেন না। সকলে তফাৎ হও, তফাৎ হও—কাল আসিও। কল্য একপ্রহর পর্য্যন্ত সময়। তাহার পরে আসিলে, সন্ন্যাসীকে কেহ দেখিতে পাইবে না।” এই ঘোষণাবার্ত্তার সঙ্গে সঙ্গে একটা মহা ভয়ঙ্কর গোল উঠিল। চারিজন কন্‌ষ্টেবল, একজন ইন্‌স্পেক্টার, বেগে ভিড়ের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। একটা শব্দ উঠিয়াছে,—“পাক্‌ড়ো, পাক্‌ড়ো, জল্‌দি পাক্‌ড়ো—ডাকু ভাগেগা।” ঘটনা কি, ব্যাপার কি ?—সকলেই জানিতে উৎসুক।

বেলা চারিটার সময় দুইটী স্ত্রীলোক গণাইতে আসিয়াছিল। বাবার ভোগের জন্য তাহারা সন্ন্যাসীকে প্রত্যেকে ৪৲ হিসাবে ৮৲ টাকা দেয়। তাহাতেও বাবার কুলান হইবে-না বলায়, তাহারা উভয়ে হস্তস্থিত রূপার পৈঁছা বাবার ভোগের জন্য দিয়া যায়। মেয়ে দুটী কৈবর্ত্তদের। কৈবর্ত্তদের বড়কর্ত্তা সন্ধ্যার পর ঘরে আসিয়া, ব্যাপার শুনিয়া, ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া পুলিসে খবর দিল।

এক্ষণে পুলিসকে সঙ্গে লইয়া, বড়কর্ত্তা সন্ন্যাসীকে ধরিতে আসিতেছে।

মহা হুলস্থুল। সেই মসাল দুইটা হঠাৎ নিবিয়া গেল। হঠাৎ ঘোর অন্ধকার হইল। ভয়ঙ্কর গোলযোগ। কে কার ঘাড়ে পড়ে, তাহার ঠিক নাই। একজন বলিল, "ঐ পলায়, ঐ সন্ন্যাসী পলায়, ধর্ ধর্ ধর্!" কনষ্টেবলগণের গতি মৃদুমন্দ;—তাহারা ধরিতে ছুটিল বটে, কিন্তু সে "বাদসাহী-চাল্" কোথায় যাবে? তখন কৈবর্ত্তদের বড়কর্ত্তা প্রাণপণ চেষ্টায় দৌড়িয়া গিয়া, সন্ন্যাসীর দীর্ঘদাড়ী একেবারে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিল। সন্ন্যাসীও বিলক্ষণ বলিষ্ঠ। বিষম টানাটানিতে সেই দীর্ঘ দাড়ী বড়কর্ত্তার হাতে আমূল রহিয়া গেল;—আর সেই কৃষ্ণকায় সন্ন্যাসী লম্বা-লম্ফে আসিয়া ঝুপ করিয়া গঙ্গার জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। বড়কর্ত্তা আলো আনিয়া দেখিল, সন্ন্যাসীর দাড়ীটা কৃত্রিম, পরচুলা মাত্র। রাস উপলক্ষে জলে তখন অসংখ্য নৌকা বাঁধা। কত

দিক হইতে কত নৌকা আসিতেছে, কত দিকে কত নৌকা যাইতেছে, কত নৌকা সেইস্থানেই দাঁড়াইয়া-দাঁড়াইয়া ঘুরিতেছে। প্রায় পাঁচ মিনিট পরে পুলিস-প্রভু সশরীরে আসিয়া গঙ্গাজলে অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন; কিন্তু সন্ন্যাসীকে আর কোথাও পাওয়া গেল না। গঙ্গায় যত নৌকা ছিল, পুলিস-কর্ত্তার হুকুমে সমস্ত নৌকা আটক হইয়া গেল। অনেক দাঁড়ী মাঝী মার খাইল। অনেকের জিনিস পত্র নৌকা হইতে গঙ্গার জলে পড়িল। একটা ভীম-ভৈরব কাণ্ড বাধিল।

সন্ন্যাসী সাধু কি ভণ্ড?—এই কথা লইয়া রাসতলায় রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত বাদানুবাদ চলিল। প্রথমে সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে স্থির হইয়াছিল, "সন্ন্যাসীটে ডাকাত, জুয়াচোর, ভণ্ড!—তা, না হ'লে, পলাবে কেন?" যত রাত্রি অধিক হইতে লাগিল, ততই প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল। তখন কেহ কেহ বলিল, "এমনওত হইতে পারে, সন্ন্যাসী ইংরেজের অনাচার, পুলিসের অত্যাচার দেখিয়া অন্তর্দ্ধান

হইয়াছেন। শ্রীচৈতন্য-প্রভু শ্রীক্ষেত্রে সাগরে ঝাঁপ দেন ; সন্ন্যাসী-প্রভু কাঁঠালপাড়ার গঙ্গায় ঝাঁপ দিলেন।” ফলতঃ, সে রাত্রে কোন বিষয়েরই সুমীমাংসা হইল না।



## তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অগ্রহায়ণের আরম্ভ। শীত সম্বন্ধে এখন মত-ভেদ। যাঁহার শীতবস্ত্র বেশী আছে, তাঁহার মতে এখন খুব শীত; যাঁহার কিঞ্চিৎ কম আছে, তাঁহার মতে এখনও তত শীত পড়ে নাই।

প্রভাতকাল। সংসার-ক্ষেত্রে যেন মানুষ-সঙের মহা-মেলা। ইস্তক ফুর্‌ফুরে মলমলের চাদর, নাগাইদ তূলা-ভরা দু-আঙ্গুল পুরু বালাপোষ—সর্ব্ব রূপ বসনই এখন মানব-গাত্রে বিরাজ করিতেছে। যেখানে পাঁচটী লোক একত্র বসিয়া আছে, সেখানে দেখিবে,—কাহারও গায়ে বনাত, কাহারও গায়ে লুই, কাহারও গায়ে রেজাই, কাহারও গায়ে চাদর, কাহারও গায়ে কোঁচার টেপ। সঙ নয় ত কি?

পুরুষ-পাল-মাঝে শীত সম্বন্ধে এরূপ মতভেদ থাকিলেও, কুল-মহিলা-মণ্ডলে কিন্তু এসম্বন্ধে এখনও

কোনও উচ্চবাচ্য নাই। স্ত্রীজাতির পরিধেয়-বসনের আজও কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। গৃহলক্ষ্মী সেই অনুদয়ে উঠিয়া, যথানিয়মে পূর্ব্ববৎ, অঞ্চল দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া,—জল তুলিতেছেন, বাসন মাজিতেছেন, ঘর নিকাইতেছেন, উঠান ঝাঁট দিতেছেন। শীত এ অঞ্চলে আদৌ ঘেঁসিতে পারে নাই।

তবে এখন প্রকৃত কালটা কি?—শীত, না গ্রীষ্ম? একটু উচ্চ অঙ্গের কবি হইলে বলিতাম,—ইহা শীতও নহে, গ্রীষ্মও নহে;—গঙ্গা-যমুনা সঙ্গম,—হর-গৌরী মিলন,—দীপক-মল্লার সংঘটন!

এ হেন কালে হুগলীর ডাকঘরে দুইটী লোক উপবিষ্ট। একটী প্রবীণ,—পরিপক্ক কেশ। একটী নবীন,—যুবতী-রঞ্জন বেশ। উভয়েই ডাকঘরের কাজ একটু-আধটু করিতেছেন এবং পরস্পর কথাবার্ত্তা কহিতেছেন।

প্রবীণ। ভায়া! তীর্থ-ভ্রমণ ত ক'রে এলে;—আমার জন্য কি নিয়ে এসেচ বল?

নবীন। দাদা! তোমার তরে কিছু কি না-নিয়েই ফিরে এসিচি?

প্রবীণ। কি?—কি?—কি জিনিস্?

নবীন। তা, এখন বল্‌বো না।

প্রবীণ। বলই-না কেন?

নবীন। তা কি এখন বলা হয়? সে বড় শক্ত জিনিস্।

প্রবীণ। শক্তই হো'ক, আর নরমই হোক—সে কথা বল্‌তে দোষ কি?

নবীন। দাদা! তুমি কি সে সামগ্রীর মর্ম্ম বুঝ্‌তে পার্‌বে? সে-একদিন তোমার বাসায় যাবো;—দিদিকে ডেকে, সে জিনিস্‌টী হাতে হাতে সমর্পণ ক'রে আস্‌বো।

প্রবীণ। তোমার বুঝি সব ফাঁকি! পথ থেকে চার্‌টী ধুলো কুড়িয়ে নিয়ে যেয়ে, বল্‌বে,—"এই বৃন্দাবনের রজ নাও।" আমি ধূলো-কাদায় ভুল্‌চি না! সাড়ে তিন-গজা নামাবলী তিনখানি চাই;—তুল্‌সীর মালা চার্ গাছি চাই; রেশমের হরিনামের

ঝুলি অন্তত দুটী চাই। আর, কাশী থেকে পেতলের বাসন কি এনেচ বল?

নবীন। দাদাঠাকুর! তোমার কি চাই বল-না? আমি কি এনেচি, না-এনেচি—সে খোঁজে কাজ কি?

প্রবীণ। তোমার সঙ্গে'ত কথায় কেউ পার্‌বে না!—আমার মোদ্দা একটী ফুল-কাটা পানের বাটা চাই!

নবীন। আর কি চাই?

প্রবীণ। গয়ার তামাক।

নবীন। সে তামাক এখনি খাওয়াচ্চি।

প্রবীণ। সঙ্গে ক'রে এনেচ নাকি? কতটুকু এনেচো?—পোয়াটাক্ তামাক বাসায় নিয়ে যেতে হ'বে।

নবীন। তা, তামাক অনেক আছে! এখন একবার খেয়ে দেখো—

প্রবীণ। তবে, ভায়া! কেষ্টাকে শীগ্‌গির সাজ্‌তে ব'ল!—এখনি সাহেব এসে পড়ুবে!

কৃষ্ণধন ডাকঘরের একজন পিয়ন। নবীনের আদেশমাত্র সে অমনি তাওয়া-দিয়া এক-ছিলিম গয়ার তামাক সাজিয়া ফেলিল।

তামাক খাইতে-খাইতে প্রবীণ ব্যক্তি তামাকের বহু গুণানুবাদ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। বলিলেন, "এ তামাকে মন একেবারে তর্ হইয়া যায়। বেশ, ভায়া! তুমি যে, গয়া থেকে এ তামাকটী নিয়ে এসেচো—এটী অতি উত্তম কাজ হয়েচে। তা, ভায়ার আজকাল কোন্ কাজটাই বা মন্দ?—গরদের জামা গায়ে,—তার উপর আবার বুক-পকেটে ফুলের তোড়া! ভালো,—ভায়া!—ভালো!"

নবীন। দাদা! ফুলের তোড়াটী আজ সাহেবকে দিতে হবে—

প্রবীণ। তা, তুমি সাহেবকেই দাও, আর নিজেই পরিয়া থাকো,—সে কথা আমি বল্‌চি না। আমি বল্‌চি,—ভায়ার আজকাল বাহারটা ভালো!

নবীন-পুরুষ হাসিতে লাগিলেন।

প্রবীণ কহিলেন,—"তা, বাহার হোক! সে'ত হ'বারই কথা। আমি বলি,—তুমি একটী বিয়ে-থা কর,—ঘর-সংসার হোক্।"

নবীন-পুরুষ আরও হাসিয়া উঠিলেন,—বলিলেন,—"আমার বয়স্ কি?—আমিত এখন ছেলে-মানুষ! আর, এত তাড়াতাড়ি বিয়েই বা কেন?"

প্রবীণ। ভায়া! তুমি ছেলে-মানুষ কিসে? তোমার বয়স্ বরং পঁচিশ বৎসরের বেশী হবে, তবু কম নয়! তোমার বিবাহ-কাল উত্তীর্ণ হয়েচে।—তবে তুমি বিয়ে না কর্ত্তে চাও,—সে স্বতন্ত্র কথা!

নবীন। বিয়ে যে কর্‌বো না—এমন কথাত আমি বল্‌চি না,—তবে আরও দুচার-বছর-দশবছর যা'ক,—তারপর একটা দেখেশুনে বিয়ে করা যাবে—

প্রবীণ। এ-যে একরকম বিয়ে না-করাই হলো।—এখনও দশবছর পরে বিয়ের সম্বন্ধ হবে!—ভায়া! এ কাজটা কি ভাল হচ্চে?

নবীন। এর আবার ভালমন্দ কি আছে?

প্রবীণ। তা, আমি বুঝেচি,—তুমি বিয়ে ক'র্‌বে না। ভায়া, তুমি যে বাড়ীতে আছ, সেখানে থাক্‌লে কি আর মানুষ, মানুষ থাকে। সে-যে কামরূপ কামিখ্যের মন্ত্র,—রেতে মানুষ, দিনে ছাগল!

এই কথা শুনিয়া নবীন-পুরুষ হাসিয়াই আকুল।

প্রবীণ। ভায়া, হেসো-না,—হেসো-না! হাসি ভাল নয়! তুমি যে বাসায় আছ, সে বড় কুস্থান! ডাকিনী-মন্ত্রে মানুষকে যে উড়িয়ে নিয়ে যায়,—শুনেচ?—তা, সেখানে তাই। ঘাড়ের রক্ত চুষে খেয়ে ফেলে—

নবীন। দাদা! এত ভয় কর কেন?

প্রবীণ। ওহে! তোমরা ছেলে-মানুষ, বুঝনা! তারা মায়ে-ঝীয়ে দুজনে না কত্তে পারে, এমন কাজ নেই। বরং তার মেয়েটা কিছু ভালো,—কিন্তু মা-বেটী জেয়ান্ত রাক্ষুসী।

নবীন। রাক্ষুসীই হোক, আর মানুষীই

হোক,—আমার কেউ কিছু কত্তে পার্‌বে না। দাদা! তুমি ভেবো না।

প্রবীণ। আজকাল তোমার বাহার দেখে কিছু ভয় হয়! ওদিকে গয়া-কাশী-বৃন্দাবনে যেয়ে তীর্থও করা আছে, নাকে তিলক, গলায় তিনকণ্ঠী তুলসীর মালাও আছে;—এদিকে আতর-গোলাপ আছে, বাঁকা টেড়ি আছে, রঙ-বেরঙের কাপড় জামা আছে, ফুলের মালা, ফুলের তোড়াও আছে? তা, এমন বয়সে ওসব বাহার ত একটু হবেই,—তা, হোক; তাতে আপত্তি করি না। তবে কি-না, আমি বলি, একটী বিবাহ কর,—সকল দিকেই শোভা পায়! এখন কি তোমার তীর্থ কর্‌বার বয়স্‌?

নবীন। (হাসিয়া) মা-বাপের গয়ায় পিণ্ড না দিলে কি উদ্ধার আছে?—কেবল গয়া যাবো বলেই যাত্রা করি,—শেষে কেমন মন হ'লো,—৺কাশী-বৃন্দাবন না যেয়ে থাক্‌তে পার্‌লাম না।—তাই দেড় মাসের স্থানে সাড়ে তিন মাস হলো!—আমি মনে করেছিলাম,—সাহেব ভারি রাগ

কর্‌বেন! তা, কাল তাঁর বাসায় গিয়ে তুই সেলাম ঠুকে তাঁকে বশ করে এসেচি।

প্রবীণ। সাহেব খুবই রাগ করেছিলেন। একদিন আমায় বল্লেন,—যে ব্যক্তি চারি মাস কাজ ক'রে, তিন মাস কামাই করে,—তাকে আর রাখ্‌তে নেই!

নবীন। সাহেব রাগই ত কত্তে পারেন। সাহেবের দোষ কি? সাহেবকে ত কাল তুই সেলাম ক'রে,—খুসি কর্‌লাম। আর, বিবিকে খুসি ক'র্‌লাম—এক কাঁদি পাকা মর্ত্তমান কলা দিয়ে। তখন সাহেবের মেয়ে তুটা আমাকে এসে ধর্‌লে,—'আমাদের জন্য কি এনেচো?' আমি কি করি—তু-সের সন্দেস এবং দশটা পাঁড়-শশা তখনি কিনে আনা'লাম। মেয়ে তু-জন এবং স্বয়ং বিবি,—এই তিন জনে ঠিক যেন বানরীর মত হাম্‌ হাম্‌ ক'রে কলা, শশা ও সন্দেস খেতে লাগ্‌লো—

প্রবীণ। সে কথাটাও তোমাকে বল্‌বো-বল্‌বো মনে করেচি। তোমার গয়া যাবার পূর্ব্বেই

দু-একটা লোক কাণাঘুষা আরম্ভ করেছিল,—'পোষ্ট-মাষ্টার সাহেবের বড়মেয়ের সঙ্গে, ছোট কেরাণী বাবুর ভাব কিছু বেশী বেশী হয়েচে।' তুমি গয়া যাবার পর' এ কথা সহরময় খুব রাষ্ট হয়ে পড়্লো। তার পর এখন, তিন চারমাস অতীত হয়েছে, লোকে সে কথা ভুলে গেছে, বা কিছু থেমে আছে। তাই বলি, সাহেবের বাড়ী এখন তোমার যাতায়াত না করাই ভালো।

নবীন পুরুষ হাসি-হাসি মুখে বলিলেন,—"তবে আমি যাই কোথা? যে বাসার সংস্রবে আমি আছি, সেখানে থাক্‌লে,—তারা মা-ঝীয়ে দুজনে আমাকে ডাকিনী-মন্ত্রে উড়িয়ে নিয়ে যাবে! মনিব-সাহেবের বাসায় গেলে, লোকে তার মেয়ের সঙ্গে আমার বদনাম রটাবে! যদি নগরের প্রান্ত-ভাগে একটা বাসা করি,—তা'হলেও লোকে বল'বে—ও-লোকটা বিয়ে-থা করে নাই, কেবল মন্দ মতলবের জন্য একলা তেপান্তর মাঠে বাসা

করেছে। তাই বলি, যাই কোথা? ক্রমে আমি মহামুস্কিলে পড়্‌লাম।

প্রবীণ। তোমার যে স্বভাব-চরিত্র খুব ভাল, তাহা আমি জানি। তবে কি জান, ভায়া! তোমার বয়স্‌-কাল এখন খারাপ পড়েচে। একটু-তেই তোমাদের এখন মন নেচে উঠে!

মনে মনে হাসিয়া—একটু ন্যাকা সাজিয়া, নবীন-পুরুষ উত্তর দিলেন,—"তবে কি আমার বাসা অন্য স্থানে করবো?"

প্রবীণ। আমার মতে তাই করাই ঠিক।— ঐ যে সাহেব আস্‌চেন!

প্রবীণ ব্যক্তি তখন হুঁকাটা লুকাইয়া রাখিলেন। নবীন-পুরুষ গলদেশ হইতে ফুলের মালা খুলিলেন; বুক্‌-পকেট হইতে ফুলের তোড়া লইয়া সাহেবের টেবিলের উপর রাখিলেন। গল্প বন্দ হইল। নীরবে কাজ-কর্ম্ম চলিতে লাগিল।

হুগলীর পোষ্ট-মাষ্টার,—তখন একজন ফিরিঙ্গী-

সাহেব ছিলেন। তাঁহার দুই কন্যা এবং এক স্ত্রী। জ্যেষ্ঠকন্যাটীর বয়স্ ঊনবিংশতি; কনিষ্ঠার বয়স্ চতুর্দ্দশ। উভয়েই অবিবাহিতা বালিকা।



আচ্ছা, আমি যে তোমাকে গান-বাজনা শিখাবো, আমার সে পরিশ্রমের পারিতোষিক কে দিবে?

কালাচাঁদ। আমি গরীব লোক। টাকা-কড়ি কোথা পাবো?

কন্যা। (হাসিয়া) তোমার কি এমন কোনও জিনিস নাই—যাহা তুমি আমাকে আনন্দের সহিত দান করিতে পার?

কালাচাঁদ। (হাসিয়া) প্রত্যহ একগাছি করিয়া ফুলের মালা, এবং একটী ফুলের তোড়া দিতে পারি।

কন্যা। (হাসিয়া) ইহাই যথেষ্ট! সাবাস্ দত্তজা! তবে—এস, তোমার সহিত একবার কর-মর্দ্দন করি।

এই বলিয়া সেই ঊনবিংশবর্ষীয়া বালিকা-কন্যা, স্বয়ং বলপূর্ব্বক কালাচাঁদের দক্ষিণ-কর গ্রহণ করিয়া, সজোরে মর্দ্দন করিয়া দিলেন!

তখন কালাচাঁদ একবার এদিক ওদিক চাহিলেন; মাথা চুলকাইলেন। চুলকাইয়া, কন্যাকে কহিলেন,—"আজ তবে আমি আসি।"

এই বলিয়া কালাচাঁদ উঠিয়া পড়িলেন। কন্যা অমনি কালাচাঁদের হাত ধরিয়া বলিলেন,—"এখনি যাওয়া কেন? দত্ত! ব'স, ব'স! আমার একটা গান শুনিবে-না?"

কালাচাঁদ কি করেন, অগত্যা বসিলেন। বলিলেন,—"দেখুন, বাড়ীতে একটু বিশেষ কাজ আছে,—আমি আজ যাই, কাল না-হয় আস্‌বো!"

কন্যা। তুমি বিবাহ কর নাই। ঘরে তোমার সুন্দরী-স্ত্রী নাই। স্ত্রী থাকিলে, তিনি তোমার মুখ চাহিয়া এতক্ষণ হয় ত অপেক্ষা করিতেন। সুতরাং বাড়ীতে এখন যাইয়া তোমার ফল কি?

কালাচাঁদ। (হাসিয়া) আমার অন্য একটু কাজ আছে।

কন্যা। (হাসিয়া) আমার কাছে থাকিতে কি তোমার কষ্ট হয়?—তা হবে বৈকি? আমি ত আর সুন্দরী নই!

কালাচাঁদ দেখিলেন, ঘোর বিপদ! ক্রমশ

বুদ্ধির দশা! কন্যা বলিতে লাগিলেন,—"তুমি যদি আমাকে ভাল-বাসিতে,—তা হ'লে এমন জোর করে উঠে যেতে চাইতে না। আচ্ছা,—তুমি ঠিক্ ক'রে বল,—আমাকে ভালবাস কি না?

কালাচাঁদ দেখিলেন, দুই দিকেই গোল। যদি বলি 'ভালবাসি,'—তাহা হইলে মেয়েটা একেবারে পাইয়া বসিবে। যদি বলি 'ভালবাসি-না,'—তাহা হইলে মেয়েটা একটা অকাণ্ড-কাণ্ড বাধাইতে বা অঘটন ঘটনা ঘটাইতে পারে। করি কি? বলি কি?—কিন্তু 'ভালবাসি' বলিলে, বোধ হয় উপস্থিত কোন বিপদ দেখি না। যাই-হউক, একটা ত কথা কহিতেই হইবে।

এই ভাবিয়া কালাচাঁদ বলিলেন,—"হাঁ, তোমাকে ভালবাসি বৈকি?"

কন্যা। আমাকে যদি সত্য-সত্যই ভালবাস, তবে আমাকে সঙ্গে লইয়া এখনি গাড়ী করিয়া চুঁচুড়া-ফরেষ-ডাঙ্গা দিয়া বেড়াইয়া আনো দেখি?

কালাচাঁদ। আজ সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে,

বেড়াইয়া আসিতে রাত হইবে। আগামী শনিবার তোমাকে লইয়া বেড়াইতে যাইব।

কন্যা। তুমি বড়ই নিষ্ঠুর।

কালাচাঁদ ভাবিলেন, মেয়েটার সঙ্গে এত বাড়াবাড়ি করা ভাল হয় নাই। এখন কোন্ উপায়ে ইহার হাত হইতে ত্রাণ পাইব? প্রকাশ্যে বলিলেন,—"আমি নিষ্ঠুর কিসে?"

কন্যা। যে ব্যক্তি স্ত্রীলোকের অপমান করে, সেই নিষ্ঠুর।

কালাচাঁদ। আমি ত তোমার অপমান কিছুই করি নাই।

কন্যা। আমি মুখ ফুটিয়া বলিলাম,—'এস আমরা দুজনে একত্র বেড়াতে যাই;'—কিন্তু তুমি সে কাজে রাজী হইলে কৈ? ইহা অপেক্ষা স্ত্রীজাতির আর অধিক অপমান কি আছে?

কালাচাঁদ। রাত্রি হইয়াছে। এ সময় দুজনে একত্র বেড়াইতে গেলে, তোমার মাতা রাগ করিতে পারেন।

কন্যা। মা, কখনই রাগ করিবেন না। আমাদের জাতির সেরূপ কুসংস্কার নাই। তুমি মিছামিছি মায়ের ওজর কর কেন? স্পষ্ট করিয়া খুলিয়াই বল না,—'আমি বেড়াইতে স্বীকৃত নহি।'

কালাচাঁদ। এখন কি গাড়ী পাওয়া যাবে?

কন্যা। গাড়ী এখনি চাকর আনিয়া দিবে।

কালাচাঁদকে আর কোন কথা কহিতে হইল না। কন্যা চৌকী হইতে উঠিয়া, টেবিলের নিকট গিয়া চাকরের উদ্দেশে ঘণ্টা-ধ্বনি করিলেন। কিন্তু কেহই সাড়া দিল না। আবার ঘণ্টা-ধ্বনি হইল,—তথাচ কেহ আসিল না। কন্যা তখন কুপিতা বাঘিনীর ন্যায় বাহিরে গেলেন—মাতাকে জিজ্ঞাসিলেন;—'চাকর কোথা?' মাতার নিকট হইতে যাহা শুনিলেন, তাহার ভাব এইরূপ;—"চাকরের চারি মাসের মাহিনা বাকী পড়িয়াছে। প্রত্যহ সে মাহিনার তাগাদা করে। অদ্য কিছু উচ্চরবে তাগাদা করায়, সাহেব তাহাকে মারিয়া তাড়াইয়া দিয়াছেন।"

কন্যা আসিয়া কালাচাঁদকে কহিলেন,—“চাকর এখন নাই। তুমি ত নিজে গিয়া গাড়ী আনিতে পার। এখনি যাও; শীঘ্র গাড়ী আন। কিছুতেই যেন বিলম্ব না হয়। কোচম্যানকে ঘোড়া খুব ছুট কাটাইয়া আনিতে বলিবে। আমি এই গৃহদ্বারে তোমার অপেক্ষায় বসিয়া রহিলাম। দেখিও,—কিছুতেই যেন দেরি না হয়। উঠ—উঠ—শীঘ্র উঠ। দৌড়িয়া যাও।

কালাচাঁদ ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িলেন। সেদিন আর ফিরিলেন না।



## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

কালাচাঁদ কেবল কেরাণী নহেন। কেবল যে, তিনি ডাকঘরে গিয়া 'দশটা-পাঁচটা' কলম-পেষণ করেন,—তাহা নহে। তাঁহার আরও অন্য অনেক কাজ ছিল।

কালাচাঁদ অতি প্রত্যুষে উঠিতেন,—প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত, সঙ্গতিপন্ন, এবং গৃহস্থ ব্যক্তির বাসায় একবার করিয়া যাইতেন। একই লোকের বাসায় প্রত্যহ যে তিনি যাইতেন, বা যাইতে সক্ষম হইতেন,—তাহা নহে। নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে, আজ ইহাঁর বাসায়, কাল তাঁহার বাসায়, পরশ্ব উহাঁর বাসায়,—এইরূপ নিয়মে তাঁহার গতায়াত ছিল। ফল কথা, এক মাসে,—ত্রিশ দিনে, এক এক গৃহস্থের বাটী দুই তিন বার করিয়া তাঁহার যাওয়া ঘটিত।

হুগলীর অধিকাংশ ভদ্র-লোকই কালাচাঁদকে

ভাল বাসিতেন। কালাচাঁদকে দেখিলেই কেমন তাঁহাদের অন্তরে আনন্দের উদয় হইত! কালা-চাঁদের সদা হাসি-হাসি মুখ, সরস-সরস কথা, কালো-কালো-নবীন-নধর গড়ন,—এই ভাব দেখি-য়াই লোকের কেমন প্রীতি জন্মিত! কালাচাঁদ লোকের নিকট "আত্ম-তত্ত্ব" গোপন রাখিতেন। তিনি সকলেরই কাছে একটু ন্যাকা-ন্যাকা, বোকা-বোকা, আদুরে-আদুরে ভাব দেখাইতেন। সে-ভাবে লোকে স্বতই সন্তুষ্ট হইত।

ক্রমশ কালাচাঁদ জনসমাজে একজন "খাইয়ে" বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেন। রাষ্ট হইল,—কালাচাঁদ একটা গোটা বড় কাঠাল একবারে খাইতে পারেন। মহিলাকুল মাঝে, এমন সংবাদও প্রচার হইল,—কালাচাঁদ, এক ধামা মুড়ি, আটটা ঝুনা নারিকেল, এবং আড়াই-সের কাঁচা-গোল্লা প্রাতে জল-যোগ করেন। গৃহ-দাসী-মণ্ডলীতে এমন কথাও কাণাকাণি হইল,—কালাচাঁদের ভাত রাঁধিবার হাঁড়ি বাজারে কিনিতে মিলে নাই; সেই জন্য কুমার আসিয়া

ফরমাইস মত মাপ লইয়া বড় হাঁড়ি গড়িয়া দিয়াছে। ফল-কথা, হুগলীতে কালাচাঁদের নাম-ডাক পড়িয়া গেল।

ইহার ফলে, অনেকের বাড়ী কালাচাঁদের আহারের নিমন্ত্রণ হইতে লাগিল। বৌ-ঝী পর্য্যন্ত কবাটের ফাঁক দিয়া, কালাচাঁদের খাওয়া দেখিতে আরম্ভ করিল। কোন এক বাটীতে তাঁহার খাওয়া হইলে, সেই পাড়ার পাঁচ-বাড়ীর মেয়ে, দলে-বলে, কালাচাঁদের ভোজন-কাণ্ড সন্দর্শনার্থ সমাগত হইতে থকিল। কালাচাঁদ ভাবিতে লাগিলেন, "এ, এক বড় মন্দ মজা নয়! বেশী খাইলেই যদি লোককে খুসীতে রাখিতে পারা যায়, তবে আমি বেশী না খাইব কেন?" এইরূপ ভোজ-নিমন্ত্রণে, কালাচাঁদ তাঁহার পরিমিত আহারের দুইগুণ-তিনগুণ খাইতে আরম্ভ করিলেন। তিনি কতরূপ কল-কৌশল মায়া-জাল পাতিলেন। একটা কৌশলের কথা বলি। বিশ-পাঁচিশ জন ব্যক্তি একত্র খাইতে বসিলে, দর্শক-মণ্ডলী,—কে অধিক খাইতেছে, কে কম খাইতেছে,

এ বিষয়ে প্রথমে ততটা লক্ষ্য রাখেন না। যতই আহার-কার্য্য শেষ হইতে থাকে, ততই দর্শকের ভোজনকারীর পাতের প্রতি অধিক দৃষ্টি পড়ে। তখন, দর্শকমণ্ডলী মধ্যে—"পাতে আরও দাও, আরও দাও"—এইরূপ ধ্বনি উঠে। এই, শেষকালে যিনি অধিক খাইতে সক্ষম হন, তাঁহারই নাম বাজিয়া যায়। কালাচাঁদও এইরূপ নীতির পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি অন্যের বাড়ী পঙক্তি-ভোজনে খাইতে বসিলে, প্রথম হইতে একটু হাত রাখিয়া খাইতেন। শেষে হাত দেখাইতেন! যখন অন্য সকলের ভোজন শেষ হইয়াছে, কালাচাঁদের খাওয়া তখনই শীঘ্রহস্তে—হুহু শব্দে চলিতেছে! বহু লোকে চিত্রার্পিতের ন্যায় অনিমিষলোচনে তাহা দেখিতেছেন। চারিদিক হইতে 'বাহবা' পড়িতেছে। কালাচাঁদ মনে মনে বলিতেছেন,—'কেমন ঠকাইয়াছি! প্রথমে না খাইয়া, শেষে কেবল কসরৎ দেখাইতেছি।'

এইরূপ কৌশল ব্যতীত, আরও দু-একটা

তুক্‌তাক্ ছিল। আহার করিতে আসিবার পূর্ব্বে তিনি এমন কোন প্রক্রিয়া সাধন করিতেন,—যদ্দ্বারা তাঁহার ক্ষুধা খুব প্রবলা হইত। আহারের চব্বিশ-ঘণ্টা পূর্ব্বে সংবাদ পাইলেই, কালাচাঁদের ঐরূপ প্রক্রিয়ার অনুষ্ঠানে সবিশেষ সুবিধা ঘটিত।

একেত কালাচাঁদ একজন প্রকৃতই 'খাইয়ে' পুরুষ,—তাহার উপর ঐ কৌশল এবং প্রক্রিয়া,—এবং সেই সঙ্গে প্রাণপণ যত্ন ও চেষ্টা,—সুতরাং কালাচাঁদের ভোজন যে, বিরাট বিভীষণ ভোজন হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি ?

এক ঢিলে দুইটী পাখী মরিত। কালাচাঁদের রসনারও তৃপ্তিসাধন হইত,—এবং লোকরঞ্জন-রূপ যে, তাঁহার গভীর উদ্দেশ্য, তাহাও সুসিদ্ধ হইত!

কালাচাঁদ যেখানেই প্রভাতে বেড়াইতে যাউন,—বাসায় ফিরিবার সময়, একবার ঠাকুরদাদার বাসা হইয়া তাঁহাকে আসিতেই হইবে। সেখানে প্রত্যহ 'হাজিরা' লেখান চাই! যেদিন অধিক

বেলা হইত, সেদিন ঠাকুরদাদার পদযুগলে একটী প্রণাম করিয়াই তিনি চলিয়া আসিতেন।

পথে এক এক দিন একটু আধটু গোলযোগও ঘটিত। অর্থাৎ, পতিতপাবন পরামাণিক, কালাচাঁদকে পথে দেখিলেই দৌড়িয়া পলাইত। তখন পতিত আর পেছু-পানে চাহিত না, ঊর্দ্ধশ্বাসে লম্বালম্ফে ছুটিত! কালাচাঁদও, গলা-খেঁকারি দিতে-দিতে পতিতের পশ্চাৎ পশ্চাৎ হন্ হন্ চলিতেন। এক এক দিন ব্যাপার কিছু গুরুতর হইত। এক পথ দিয়া কালাচাঁদ আসিতেছেন;—পতিত, তাহা দেখিয়া, ঠিক তাহার বিপরীত পথ ধরিল। কালাচাঁদ অমনি দ্রুতপদে অন্য এক সোজা পথ দিয়া, পতিত যে পথে গিয়া পড়িবে, ঠিক সেই পথের মোড়ে আগে আসিয়া ঈষৎ প্রচ্ছন্নভাবে দাঁড়াইলেন। যাই পতিত সেই মোড়ে আসিল, অমনি কালাচাঁদ অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া, পতিতের মুখের কাছে হাত-তালি দিয়া "হো-হো" শব্দ করিয়া উঠিলেন। তখন পতিত ভয়বিহ্বল

হইয়া "বাপ্! বাপ্" রবে দৌড়িয়া পলাইল। কালাচাঁদ হাসিতে হাসিতে অন্য পথ দিয়া বাসায় চলিয়া আসিলেন।

কালাচাঁদ সন্ধ্যার সময় বড়-একটা বাসা হইতে বাহির হইতেন না। বাসায় বসিয়া একাগ্র-মনে কখন পড়িতেন, কখন লিখিতেন। কখন বা আবাস-বাটীর সংলগ্ন পুষ্পোদ্যানে মৃদুল-সান্ধ্য-সমীরণ সেবন করিতে করিতে, ফুল-সৌরভে মোহিত হইয়া আপন-মনে বিচরণ করিতেন,—অথবা মালা-গাঁথিবার জন্য পুষ্পচয়নে ব্যাপৃত থাকিতেন। কোন দিন বা নিকটবর্ত্তী গঙ্গাতীরে বসিয়া জ্যোৎস্না-জড়িত গঙ্গার তরঙ্গমালা গণনা করিতেন। তবে এরূপ শুনা গিয়াছে,—কালাচাঁদ এক-আধ দিন, গোপনে, সকলে ঘুমাইলে, রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহরের পর বাসা হইতে বহির্গত হইয়া কোথায় চলিয়া যাইতেন; পর দিন প্রাতে আবার বাসায় ফিরিয়া আসিতেন।

চাকুরি হওয়ার এক মাস পরে কালাচাঁদ

পোষ্ট-মাষ্টার সাহেবের নিকট এক মৌখিক দরখাস্ত করিলেন। দরখাস্তের মর্ম্ম এই,—"আমি একবার মামার বাড়ী যাইব। চারি দিনের ছুটী চাই।" এই ছুটী প্রার্থনার তিন দিন পূর্ব্বে, কালাচাঁদ সাহেবকে দুইটী পাঁঠা, তদুপযুক্ত ঘি-মসলা, দশ সের আটা এবং পাঁচ সের রসগোল্লা উপঢৌকন পাঠাইয়াছিলেন। সুতরাং দরখাস্ত করিবামাত্র ছুটী মঞ্জুর হইল।

কালাচাঁদ সেই দিন রাত্রেই হৃষ্টচিত্তে মামার বাড়ী যাত্রা করিলেন।



## সপ্তম পরিচ্ছেদ।

কালাচাঁদ যখন কারাগারে অবস্থিতি করিতেন, তখন তাঁহার অনেক পাকা, ওস্তাদ ডাকাইতের সহিত আলাপ-পরিচয় হইয়াছিল। তাহাদের নিকট হইতে তিনি সাপ-ধরা এবং বশীকরণ প্রভৃতি অনেকরূপ উৎকট-ব্যাপারের মন্ত্র-তন্ত্র-ঔষধাদি শিখিয়াছিলেন।

কালাচাঁদকে সহসা সহজে কেহ ডাকাত বলিয়া চিনিতে না পারে,—এইজন্য তিনি পোষ্টাফীসের চাকুরি গ্রহণ করেন। ঘোমটা দিয়া বেশ্যা সতী সাজে। চাকুরি-রূপ পর্দ্দার ভিতর থাকিয়া কালাচাঁদ সাধু সাজিলেন।

কালাচাঁদ বাহিরে সাধু হইলেন বটে, ভিতরে কিন্তু পূর্ণমাত্রায় ডাকাত রহিলেন। চুরি-ব্যবসা কিসে উত্তমরূপে চলে, ইহাই তখন তাঁহার চিন্তার একমাত্র বিষয় হইল।

একা ডাকাতি করিব, না দল বাঁধিব? একমাত্র স্বত্বাধিকারী হইব, না ইংরেজী-মতে জয়ণ্ট-ষ্টক-কোম্পানী-লিমিটেড খুলিব? ব্যবসাটা কি এইরূপ নামেই চলিবে,—"দত্ত এণ্ড কোং লিমিটেড্?" দল বাঁধিলে যোদ্দা গোল ঢের! কিন্তু একা ব্যবসা চালাইলেও ত, সঙ্গে দুই চারি জন মুটে-গোছ লোক আবশ্যক হইবে। সুতরাং মাহিনা দিয়া লোক ত রাখিতেই হইতেছে! কিন্তু মাহিনা দিয়া লোক রাখিলে ভাল কাজ করিবে কি? যে কাজে সঙ্কটে প্রাণ পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইতে পারে, সে কাজে বেতনভুক্ কর্ম্মচারী লইলে সুবিধা হইবে কি? মাসিক পাঁচ টাকা মাহিনার লোভে কে বল প্রাণের মায়া ছাড়িবে? প্রাণের ন্যায় প্রিয়তম বস্তু সংসারে আর কি আছে?

তবে কি দল বাঁধাই সুযুক্তি? দলস্থ প্রত্যেক লোককেই এ ব্যবসার অংশীদার করিয়া লইব! অংশীদার হইলে, ব্যবসার উন্নতির জন্য, সকলেই প্রাণপণে কাজ করিবে। সুতরাং ব্যবসাও শীঘ্র

ফলাও হইয়া পড়িবে, এবং লাভও প্রচুর হইবে।

কিন্তু মাহিনার লোক-দ্বারা কি একবারেই কাজ অচল হইবে? এই ত শত-শত সহস্র-সহস্র সিপাহী,—কেবল মাসিক ছয় বা সাত টাকার জন্য ইংরেজরাজের গোলাম হইয়াছে,—শীত-বর্ষা-গ্রীষ্মে,—কালাকাল বিচার না করিয়া, যখন-তখন মরুভূমি, পর্ব্বত, সমুদ্র লঙ্ঘন করিতেছে,—ইংরেজ-সেনাপতির ইঙ্গিতমাত্রে অমনি রণভূমে আত্মপ্রাণ বলি দিতেছে! আমিও না হয় ৭৲ টাকা মাসিক মাহিনা দিব,—৭৲ টাকা কেন, মাসিক ১৪৲ টাকা মাহিনা দিব,—আমার কর্ম্মচারীগণ কি আমার কার্য্যে প্রাণ বিসর্জ্জন করিবে না?

কোন্ পথ অবলম্বনীয়? কিছুই ত বুঝিতে পারিতেছি না!—কিছুই ত স্থির করিতে সক্ষম হইতেছি না!

আরও একটা ভাবনার বিষয় আছে। এ ব্যবসা গোপনে, না প্রকাশ্যে চালাইব? আমার ত একবার

মনে হইতেছে, গোপনে,—প্রচ্ছন্নভাবে কার্য্য করাই সুযুক্তি! পোষ্টাফীসের ছোট-কেরাণী হইয়া বেশ মজায় থাকিব,—আর, নিশীথে ব্যবসাটী, অন্যের অগোচরে, উত্তমরূপে চালাইব! কেহ জানিবে না, বুঝিবে না, ধরিবে না! একপক্ষে আমি লোক-লোচন-পথে দিবসে দিব্য ভদ্রলোক হইয়া বেড়াইব; অন্যপক্ষে আমি নিশাকালে দিগ্বিজয়ী দস্যুরাজ হইয়া বিচরণ করিব। এরূপস্থলে আমার কার্য্যাকার্য্যের বিষয় পুলিস জানিবে না, প্রতিবেশীগণ জানিবে না, সহরবাসী কেহই জানিবে না। বড়ই সুন্দর কৌশল!

কিন্তু এক দোষ। দুর্ব্বল ব্যক্তিই গোপনে কাজ করিতে চায়। ভয়কম্পিত হইয়া লুকাইয়া কার্য্য করিলে মনুষ্যত্ব নষ্ট হয়। আমি কখনই কাপুরুষের ন্যায়, ক্লীবের ন্যায়, কর্ম্ম করিতে সক্ষম হইব না! আমি লজ্জাশীলা কুলবধূর ন্যায় কেরাণী-গিরিরূপ ঘোমটার ভিতর থাকিতে চাহি না। আমি এরূপ আত্ম-বঞ্চনা করিতে পারিব না। আমি কি

যাত্রার দলের সঙ, না বহুরূপী? ছি ছি! "নাম কি?"—কেহ জিজ্ঞাসিলে, তাহা বলিতে পারিব না! পিতার নাম জিজ্ঞাসিলেই বা কি বলিব?—এই হতভাগ্য কালাচাঁদকে তদীয় স্বর্গীয় পিতৃদেবের পবিত্র মধুর নাম উচ্চকণ্ঠে উচ্চারণ করিতেও কি কুণ্ঠিত হইতে হইবে? পিতৃদেবকে কখন চক্ষে দেখি নাই, বাপ যে কেমন বস্তু তাহা কখন বুঝি নাই,—ইহজীবনে পিতা বলিয়া কাহাকেও সম্বোধন করিতে পাই নাই,—সেই পরমপূজনীয় জন্মদাতা পিতার নামটী পর্য্যন্ত আমি মুখে আনিতে পারিব না!—ইহা অপেক্ষা আর অধিক মর্ম্মযাতনার কথা কি আছে?

যাহা ঘটিবার তাহা ঘটুক,—আমি স্বনাম ঘোষণা-পূর্ব্বক প্রকাশ্যে ব্যবসা চালাইব। নিবিড় অরণ্যে বা গিরি-গুহায় আশ্রয় লইব! যথা-সময়ে নগরে-নগরে, গ্রামে-গ্রামে প্রকাশ্য ব্যবসা চালাইয়া, আবার অরণ্যে আসিয়া বাস করিব! এমন নিভৃত ভূখণ্ডে অবস্থিতি করিব যে, পঞ্চাশ বৎসর অন্বেষণ

করিলেও, আমার কেহ সন্ধান পাইবে না। ৺ রামতারণ দত্তের পৌত্র কালাচাঁদ দত্তের নাম দিগ্বিজয়ী বলিয়া দেশে দেশে প্রসিদ্ধি লাভ করিবে। এই মীমাংসাই স্থির!

কিন্তু কেমন করিয়া এই সাধু-সঙ্কল্পকে কার্য্যে পরিণত করিব? হঠাৎ আজ মুখস খুলিয়া, ডাক-ঘরের কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, ঠাকুরদাদাকে ছাড়িয়া, একা ঢাল-খাঁড়া ধরিয়া, দিগ্বিজয়ী সাজিলে ত কার্য্যোদ্ধার হইবে না! আশা, অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইবে! উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত কাজই করা উচিত। অবিবেচনার ফলে, অসময়ে কোন কার্য্য করিলে শেষে অবশ্যই ঠকিতে হইবে!

এই সকল গুরুতর বিষয়ের পরামর্শই বা কাহার সঙ্গে করি? সৎপরামর্শদাতা লোক'ত কৈ দেখিতে পাই না? এ সময় কোন্ কাজ করা উচিত?

আমি ডাকাতি বা দিগ্বিজয়ের কার্য্যে নূতন ব্রতী। আদৌ বহুদর্শিতা নাই! এই নব-ব্যবসায়ে প্রথমে পদে-পদে আমার ভুল হইতে পারে!

হয় ত প্রথমে একটী ভুলেই সর্ব্বনাশ সাধিত হইতে পারে। ভোলাময়রার দোকানে সামান্য একটী চুরি করিতেই কত-না কষ্ট পাইতে হইয়াছিল, কতই-না বিভ্রাট ঘটিয়াছিল! মন-ভ্রমে আলো না লইয়াই চুরি করিতে গিয়াছিলাম! তাই বলি, চুরি বিদ্যা বড় কঠিন বিদ্যা! উপযুক্তরূপে শিক্ষিত না হইলে, এ কার্য্য করিতে যাওয়াই বিড়ম্বনা!

তাই ভাবি,—আমার উপযুক্ত শিক্ষক কে? একটী গুরু চাই! আগে সদ্‌গুরুর অন্বেষণ করিতে হইবে। গুরুর কাছে উপযুক্ত শিক্ষা পাইয়া, সুশিক্ষিত হইয়া, এ ব্যবসা আরম্ভ করাই কর্ত্তব্য।

যখন আমি কারাগারে ছিলাম, তখন যে সকল দস্যুর সহিত আলাপ হইয়াছিল,—তাহাদিগকে একবার আহ্বান করি না কেন? আটজন ওস্তাদের সহিত আলাপ হয়, তন্মধ্যে পাঁচজন মুক্তি পাইয়াছে। সেই পাঁচজনকেই পত্র লিখিয়া আনাই!

একেকালে পাঁচজনকে পত্র লেখা উচিত হয় না। পাঁচজনের মধ্যে যিনি প্রধান, তাঁহাকেই পত্র লেখা যাউক।

যাক্। যিনি এই পাঁচজনেরই গুরু, তাঁহাকেই চিঠি লিখি না কেন? তিনি ব্রাহ্মণ, প্রবীণ, বুদ্ধিমান্, বহুদর্শী। তিনিই ত উত্তম গুরু, শ্রেষ্ঠ শিক্ষক।

না,—চিঠি লেখা হইবে না। আমি স্বয়ং তাঁহার নিকট যাইব। শুভ কার্য্যে বিলম্ব করিব না;—শীঘ্রই যাইব।

কালাচাঁদ পোষ্টমাষ্টার সাহেবের নিকট এই জন্যই চারি দিনের ছুটী লয়েন। মাতুলালয় যাত্রার কথা ভাণ মাত্র।



## অষ্টম পরিচ্ছেদ।

কালাচাঁদ মামারবাড়ী গেলেন, পতিতের ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িল। পতিতের কেমন একটা দুর্ভাবনা হইয়াছিল; তাহার খাইয়া-মাখিয়া-শুইয়া সুখ ছিল না।

পথে কালাচাঁদকে দেখিলে, পতিতের ভয় হইত। ঘরে কালাচাঁদের কথা ভাবিলে, পতিতের অতীব আতঙ্ক উপস্থিত হইত। নিদ্রায় কালাচাঁদকে স্বপ্ন দেখিয়া, পতিত চেঁচাইয়া উঠিত। পতিতের এরূপ ভীতির হেতু কি?

পাছে কালাচাঁদের সহিত দেখা হইয়া পড়ে, এই ভয়ে পতিত অনেকের বাড়ীতে কামাইতে যাওয়া বন্ধ করিয়াছিল। কালাচাঁদ কিন্তু পতিতকে মুখে কোন কথাই বলিতেন না,—কেবল সময়ে-সময়ে তিনি পশ্চাৎ হইতে গলা-খেঁকারি দিতেন,—এবং "হুঁ-হুঁ—হুঁ-হুঁ"—এইরূপ একটা শব্দ করিয়া

উঠিতেন। ইহাতেই পতিতের সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিত,—দাঁত-কপাটী লাগিবার যো হইত। যে দুই-এক-দিন, কালাচাঁদ, পতিতের সম্মুখে চৌমাথার উপর হাত-তালি দিয়াছিলেন,—সে দুই-একদিনের ইতিহাস বড়ই রহস্যময়! কালাচাঁদ দুই চারিবার হাত-তালি দিবার পর, হো-হো শব্দ করিয়া হাসিতে হাসিতে অন্য পথে চলিয়া যাইতেন; কিন্তু তাঁহার হাত-তালির বিষম ব্রহ্মাস্ত্রে পতিতের যে, কি অনির্ব্বচনীয় দুর্দ্দশা ঘটিত, তাহা আর তিনি পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিয়া দেখিতেন না। একদিন পতিত ঐরূপ হাত-তালি খাইয়া বাপ্ বাপ্ রবে দৌড়িয়া যাইতে যাইতে হঠাৎ পা-মুচুড়িয়া পড়িয়া গেল। যে স্থলে পতিতের পতন হইল, সে স্থলটী পুষ্করিণীর পাড়। পতনের পর, পতিতপাবন, গড়াইতে-গড়াইতে, সেই পুকুরে গিয়া পড়িল। সুবিধার মধ্যে, পুকুরে তখন বেশী জল ছিল না;—পাঁকই বেশী; জল এক হাঁটুরও কম। পার্শ্ববর্ত্তী স্ত্রীলোকবৃন্দ সেই পুকুরে কেবল বাসন মাজিত।

পতিত পুকুরে পড়িয়াই পাঁকে গাড়া গেল। যে সকল স্ত্রীলোক বাসন মাজিতেছিল, তাহারা দৌড়িয়া গিয়া, পতিতকে ধরাধরি করিয়া তুলিল। পতিতের নাকে আঘাত, ঘাড়ে আঘাত, বুকে আঘাত, কোমরে আঘাত,—পতিত আঘাতময়। পতিতের চোখে, মুখে, চুলে কাদা; কোঁচায়, কাছায়, চাদরে কাদা; জামায়, জেবে, জুতায় কাদা; হাতে, পায়ে, ভাঁড়ে কাদা,—পতিত কর্দ্দমময়।

কামিনীকুলের সাহায্যে ক্রমশ পতিতপাবন সেই পুষ্করিণীর তীরে উত্তোলিত হইল। পতিত তথায় বসিল না, দাঁড়াইলও-না,—কেবল চিৎপাত হইয়া শুইয়া রহিল। পতিত চক্ষু মেলিয়া চাহিল না, মুখ খুলিয়া কথা কহিল না, অঙ্গ হেলাইয়া পাশ ফিরিল না,—তবে না হইলে নয়, তাই নিশ্বাসটী ফেলিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে পতিতকে বহুলোক ঘেরিয়া দাঁড়াইল। কেহ ভাবিল, পতিত মরিয়াছে; কেহ ভাবিল, গঙ্গা-যাত্রার উদ্যোগ হইতেছে; কেহ ভাবিল, কেবল

অচেতন অবস্থায় আছে। কিন্তু রোগ নির্ণয় করিতে সহজে কেহই সক্ষম হইল না। কেহ স্থির করিল, সাপে কামড়াইয়াছে; কেহ অনুমান করিল, ভূতে পাইয়াছে; কেহ বা ঘোষণাদ্বারা প্রকাশ করিল,—ইহা সাপও নহে, ভূতও নহে,—মূর্চ্ছা-বাই!

পতিতপাবনের এমন কিছু নিদারুণ আঘাত লাগে নাই যে, তাহাকে এতক্ষণ পর্য্যন্ত মূর্চ্ছিত হইয়া থাকিতেই হইবে! আঘাতটা অঙ্গের উপযুক্ত হইলেও, তাহাতে অচেতন হইবার উপকরণ কিছুই ছিল না। তবে পতিত নিশ্চল, নিস্পন্দ, অসাড় কেন? বোধ হয় পতিতের ধ্রুব ধারণা,—এমন করিয়া এরূপ ভাবে পড়িয়া গেলে, মূর্চ্ছিত হওয়াই নিত্য নিয়ম! তাই সে, মূর্চ্ছিত।

যাহাই হউক, পতিত কিছুক্ষণ এরূপ মূর্চ্ছিত থাকিয়া, বিশেষ কিছুই সুখ-স্বস্তি পাইল না। তখন অগত্যা সে একবার চাহিল। ক্রমশ ধীরে ধীরে কথা কহিল। অবশেষে উঠিয়া বসিল।

'কেন এমন ঘটিল,'—বহু ব্যক্তিকর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া, পতিত যেন প্রীতি-প্রফুল্ল অন্তরে উত্তর দিল,—"ঘরে কালসাপ পুষেছিনু, বাটী-বাটী দুধ খাইয়েছিনু,—তার এই ফল পেলুম্। কলিকাল কি-না! যার্ তুমি ভাল কর্‌বে, সে-ই তোমার মন্দ কর্‌বে! এই বড়-কর্ত্তার নাতীকে—এই কালাচাঁদকে,—আমি দু-বছর ধরে খাওয়ালুম—মাখালুম,—যা-ই তার হাতে দু-পয়সা হলো,—যা-ই নাতী-ঠাকুদ্দায় ভাব হলো, অমনি সে শিক্‌লি-কেটে উড়ে চলে গেল। তা, চলে যা'ক—সে জন্য দুঃখ করি না,—কিন্তু আমাকে এমন ক'রে মেরে ফেল্‌বার চেষ্টা করা কেন?—এই, আমি এখান দিয়ে যাচ্চি, অমনি সে, বাঘের মত ঝাঁপিয়ে প'ড়ে, এই পুকুরের পাঁকে আমাকে পুঁতে ফেল্‌তে লাগ্‌লো!—কি বল্‌বো,—তখন আমার বগলে ভাঁড় ছিল;—নহিলে, পতিতকে কায়দা করা বড় সোজা কাজ নয়!!—"

একজন বৃদ্ধা স্ত্রীলোক বলিল, "তোমার কেমন

কথা গা? তুমি ত নিজে আপন মনে এই পথ দিয়া দৌড়ে আস্‌ছিলে;—আস্‌তে আস্‌তে হোঁচট্ খেয়ে পড়ে গেলে! তোমাকে ত কেউ ফেলেও দেয় নাই,—পাঁকেও পোঁতে নাই! তুমি সেই ভালমানুষের ছেলের—সেই কালাচাঁদের দোষ দাও কেন? সে ত খুব ভাল ছেলে! ঘাড় হেঁট ক'রে পথ চলে। বৌ-ঝীয়ের উপর তার উঁচু নজর নেই! আমরা ত এই ঘাটে ব'সে বাসন মাজ্‌চি,—কিন্তু কালাচাঁদকে ত কৈ আজ দেখি নাই!"

আর একজন স্ত্রীলোক বলিল—"আহা! কালাচাঁদের সদর্শ ছেলে আর আছে কি?"

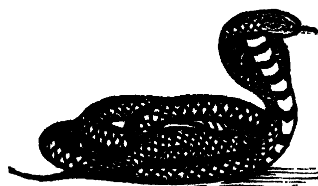
একজন বৃদ্ধপুরুষ বলিল,—"পরামাণিক! তুমি মিছামিছি কালাচাঁদের দোষ দাও কেন? এই মাত্র দেখে এলাম, কালাচাঁদ তার ঠাকুরদাদার বৈঠকখানায় বসে রয়েচে! ছি! ভদ্দর লোকের উপর কি এমন মিছা দোষ চাপাতে আছে?"

ক্রমশ সকলেই সমস্বরে এই ভাবে বলিতে লাগিল, "কালাচাঁদ অতি সুবোধ ব্যক্তি। তাহার

কোন দোষ নাই। এই নাপিতই দুষ্ট এবং দমবাজ।”

পতনে পতিতের যত-না যন্ত্রণা হইয়াছিল;—কালাচাঁদের প্রশংসা-কীর্ত্তনে তাহার শতগুণের অধিক যন্ত্রণা হইল। গতিক বড় ভাল নয় বুঝিয়া, পতিত তখন উঠিয়া দাঁড়াইল,—এবং এই ভাবিতে ভাবিতে চলিল,—

হুগলী বড়ই কঠিন ঠাঁই!
কীল্-খেয়ে কীল্-চুরি কর্‌রে ভাই!!



## নবম পরিচ্ছেদ।

কাজেই কালাচাঁদের মামারবাড়ী-গমনে পতিতের আজ অতুল আনন্দ। পতিত ভাবিতে লাগিল, "কালাচাঁদ মামারবাড়ী হইতে যদি আর না ফেরে, তাহা হইলে আমার আপদ-বিপদ দূর হইয়া সুখের উদয় হয়। কিন্তু ও-পাপ ত একবারে বিদায় হইবার নহে!—আবার সে, হুগলীতে আসিবে; আবার আমাকে জ্বালাইবে! কোন্ উপায়ে উহাকে হুগলী হইতে তাড়াই? উহার চেহারা ঠিক যমদূতের মত। উহাকে দেখিলেই আমার দাঁত-কপাটী লাগে! কালাচাঁদও মানুষ, আমিও মানুষ;—অথচ উহাকে দেখিলে আমার এত ভয় হয় কেন?

"আচ্ছা, বড়-কর্ত্তারই বা কেমন আক্কেল! আমার সঙ্গে যুক্তি পরামর্শ হইল যে, কালাচাঁদকে তাড়াইতে হইবে! কিন্তু যা-ই আমি কালাচাঁদকে বাসা হইতে তাড়াইলাম, বুড়ো-ব্যাটা অমনি

নাতীকে আদর করিয়া ডাকিয়া আশ্রয় দিল! ঐ বুড়ো-দেওয়ানটাকে আমি চিরকাল চিনি;—কথা যেন মিছরির ছুরি! ওর মুখে এক কথা, পেটে এক কথা! মনটা ঠিক যেন জিলিপির পাক্! বুড়োটা তখন আমায় তেমন-ক'রে খোষামোদ ক'রে, কালাচাঁদকে তাড়িয়ে দেওয়ালে,—আর নিজে কিনা ভাবে গদগদ হয়ে এখন কেবল কালাচাঁদকে কোলে ক'রে বসে রৈল!! কেন এমন হইল? কিছুই ত বুঝিতে পারিতেছি না। আমাকে বধ করিবার জন্যই কি এরূপ ষড়্যন্ত্র হইল? তা, বৈ আর কি? এখন কালাচাঁদকে আমার পেছনে ঠেকিয়ে দিয়ে, কর্ত্তা নিজে ঘরে বসে মজা দেখ্‌চেন্! আচ্ছা, যাই আজ বড়-কর্ত্তার কাছে!—তাঁকে আমার এতই ভয় কি? আজ খোলাখুলি কথা কয়ে আস্‌বো!"

এইরূপ ভাবিয়া সভ্য নাপিত পতিতপাবন উঠিল, পোষাক পরিল, বগলে ভাঁড় লইল, কাণে কলম গুঁজিল,—বাহু নাড়িয়া যাত্রা করিল।

এদিকে বড়-কর্ত্তা, নিভৃত-কক্ষে বসিয়া রাম-ঠাকুরের সহিত গল্প করিতেছেন। কর্ত্তা বলিতেছেন,—"তোমার সে কাজটা ভাল হয় নাই!"

রামঠাকুর। আপনি যা আজ্ঞে কর্‌চেন,—তাই ঠিক! তবে সে, এই তিনমাস ঘর-কর্‌তে এসেচে। আমি আপনাকে বল্‌বো-বল্‌বো মনে কর্‌ছিলাম,—এমন সময়,—এই ঘটনা ঘট্‌লো!

কর্ত্তা। তার বয়স ঠিক কত হলো?

রামঠাকুর। এই ষোল যেয়ে ঠিক সতর বছরে পড়েছে।

কর্ত্তা। রঙ কেমন?

রামঠাকুর। সে কথা কি আর বলবো? ঠিক যেন দুধে-আল্‌তা মাখানো চাঁপার কলি। তা, ময়রার ঘরে অমন সুন্দরী স্ত্রীলোক দেখি নাই, দেখ্‌বো-না,—হয় নাই, হবার নয়!

কর্ত্তা। তোমার সঙ্গে কি তার কখন চাক্ষুষ দেখা-শুনা হয়েছিল?

রামঠাকুর। আমার সঙ্গে একদিন তার এক রকম কথা-বার্ত্তাই হয়েছিলো,—বল্‌তে হবে।

কর্ত্তা। সে কি প্রকার?

রামঠাকুর। ভোলা-ময়রা সকালবেলা দোকানে আসে,—আর তার স্ত্রী দোয়ারের কপাটটী ফাঁক ক'রে মুখটী বাড়িয়ে সদাই দাঁড়িয়ে থাকে।

কর্ত্তা। এরূপ ভাবে এক-দমে কতক্ষণ থাকে?

রামঠাকুর। এক প্রহরের কম'ত নয়।

কর্ত্তা। আচ্ছা,—তার পর।

রামঠাকুর। আমার সঙ্গে তার প্রায়ই চার্‌-চক্ষে চাওয়া-চায়ি হয়। দেখা হইলেই সে অমনি কপাটটী বন্ধ করে মুখটী লুকিয়ে ফেলে।

কর্ত্তা। আচ্ছা, মুখ লুকাবার সময়, সে, মুচ্‌কি-হাসি হাসে কি না?

রামঠাকুর। অতি সুন্দর হাসি! যেন ঝর্‌ঝর্‌ করিয়া মুক্তা ঝরিতে থাকে।

কর্ত্তা। আচ্ছা, কপাট বন্ধ করিবার সময়, সে, আড়্‌নয়নে চায় কি না?

রামঠাকুর। ওঃ, খুব চায়। ডান-চোখের তারাটী যেন একেবারে ঠেলে কপালে এসে পড়ে!

কর্ত্তা। কোনরূপ অঙ্গ-ভঙ্গি করে কি না?

রামঠাকুর। হাঁ, করে বৈ কি!

কর্ত্তা। সে কি রকম?

রামঠাকুর। তার চোখ ঘুরিতে থাকে, ঠোঁট কাঁপিতে থাকে, নাকের নিশ্বাস ঘন-ঘন পড়িতে থাকে!

কর্ত্তা। আর কিছু হয় কি?

রামঠাকুর। তার কটীতট দোলে, পদযুগ দোলে, বাহু-মূল দোলে;—আর দোলে, তার নবীন কেশ-পাশ!

কর্ত্তা। তোমার সঙ্গে কোনও দিন তার কোন কথা হয়েছিল কি?

রামঠাকুর। কথা কওয়াই বটে! মেয়েটী একদিন কথা কই-কই করিয়া আর কথা কহিতে পারিল না!

কর্ত্তা। কেন কেন?

রামঠাকুর। লজ্জা বলুন, ভয় বলুন, বিভীষিকা

বলুন, আতঙ্ক বলুন,—এইরূপ একটা না-একটা, প্রথম-যৌবনে রমণীর হইয়াই থাকে! তা, সে জন্য কোন চিন্তা নাই। দু-দিন পরে সব দোষই সেরে যাবে।

কর্ত্তা। সে সব কথা যা'ক্। এখন তাকে পা'বার উপায় কি?

রামঠাকুর। সে মেয়েটা ত আমার হাতের মুঠার ভিতর।

কর্ত্তা। মুঠার ভিতর কিসে?

রামঠাকুর। ভোলা-ময়রা আপনার শ্রীচরণে শরণ নিয়েচে। আপনি তার এখন মরণ-কাটী, বাঁচন-কাটী। ভোলা-ব্যাটাকে এখন যা বল্‌বো,—এখন সে, তা-ই কর্‌তে বাধ্য। আমি ভোলা-ময়রাকে খুলেই বল্‌বো,—'ভোলানাথ! মেয়েদিগে একবার কর্ত্তার কাছে পাঠিয়ে দিও। কর্ত্তার অনুগ্রহ না হ'লে এবার ঐ চুরি-মোকদ্দমায় তোমার চৌদ্দ বৎসর মেয়াদ হবে। ভোলানাথ! আগে কর্ত্তাকে খুসী কর, তার পর তোমার উদ্ধার হবে।'

কর্ত্তা। ভোলা-ময়রাকে বশ কর্‌বার জন্য ত কোন কাজ আটক হবে না;—মেয়েটাকে আগে রাজী করিবার উপায় কি?

রামঠাকুর। আহা! সে জন্য কোন ভাবনা নাই। মেয়েটা যখন আপনার নাম শুন্‌বে, তখন সে, রাজী না হয়ে থাক্‌তে পারে কি? এদেশে আপনাকে কে না ভক্তি করে, মান্য করে, ভাল-বাসে? যখন আপনার কথা তার কাণে যাবে, তখন সে কি আর স্থির হয়ে দাঁড়াতে পার্‌বে?—সে, একেবারে খেয়ে যেয়ে আপনার বাগানবাড়ীতে উপস্থিত হবে। আপনি হ'লেন, এদেশের রাজা। সুতরাং কোন্ রমণীর আপনাকে ভজনা করিবার সাধ না হয়? রাজাকে যে রমণী উপভোগ করিতে পায়,—সে-ই ত প্রকৃত রাণী। রাণী হইবার জন্য কাহার না বাসনা প্রবলা হয়?

কর্ত্তা। মেয়েটার কি নাম?

রামঠাকুর। আতুরী। তার বাপের নাম বলদেব ময়রা। পিতামহের নাম হলধর-ময়রা। বেশ

সদ্বংশ। আতুরীর বাপ-পিতামহ দোল-দুর্গোৎসব কর্‌তো। কোন দোষ নাই। আতুরী পদ্মিনী-জাতীয়া স্ত্রী। সুলক্ষণ-সম্পন্না। বলেন ত, আতুরীর কুষ্ঠীখানি আনাই;—রাশি-লগ্ন এবং পতি-স্থানের বিচার করে দেখি। যদি কুষ্ঠী না থাকে, তবে না-হয় নষ্ট-কোষ্ঠীটাই উদ্ধার করিয়া ফেলি।

কৰ্ত্তা। থাক্, থাক্,—সে সব এখন থাক্। এক্ষণে এমন একটী পাকা লোক চাই, যাহাদ্বারা আতুরীর নিকট এ বিষয়ের প্রস্তাব হতে পারে। তা, সে লোকটী পুরুষ হ'লেও চল্‌তে পারে।

রামঠাকুর কিছুক্ষণ ঘাড় হেঁট করিয়া বিশেষ স্থিরবুদ্ধিতে এই গুরুতর বিষয়ের চিন্তা করিলেন। শেষে গ্রীবা উত্তোলন করিয়া, গম্ভীর ভাবে ধীরে ধীরে বলিলেন, "লোকের ভাবনা কি? লোক অনেক আছে। তবে কিনা এ-সব কাজে একটু পরিপক্ক লোক চাই। যার-তার-দ্বারা এ-সব কাৰ্য্য সম্পন্ন হয় না। একটী আটে-পিঠে-দড় লোক

হলেই ভাল হয়। আচ্ছা, প্রণিধানপূর্ব্বক একটা কথা শুনুন দেখি! পতিত পরামাণিক, ভোলা-ময়রার খুড়ীর ভিক্ষাপুত্র। ও-বাড়ীতে সে সদাই যাওয়া-আসা করে। বৌয়েদের সঙ্গে তার ঠাট্টা-তামাসাও চলে। লোকটাও পাকা ঝুনো বটে। হিসাব-বোধও তার বেশ আছে। বিশেষ, পতিত অতি সজ্জন ব্যক্তি। সকলের সঙ্গেই সে, হেসে-খেলে কথা কয়! তার কোনও দোষ দেখিতে পাই না। এই পতিতের দ্বারা আতুরীর নিকট প্রস্তাব করাইলে চলে না-কি?"

কর্ত্তা তখন মুখটীকে বিকৃত করিলেন,—একটু রুক্ষ-স্বরে রামঠাকুরকে বলিলেন,—"পতে নাপ্‌তেটা বড় পাজি! তার নাম মুখে এনো না। সে বদ্‌-মাইস্‌টা মিথ্যা-কথার বাদ্‌সা। সে, ভুলে সত্য কথা কয় না। একটা কথারও যদি তার ঠিক আছে! ইচ্ছা হয়, দেওয়ালে তার নাক ঘসাড়ে ছিঁড়ে দি।"

রামঠাকুর। আপনি যা বলচেন, সবই ঠিক্।

পতে ব্যাটা বড় বদ্‌মাইস্। সে নচ্ছার চোর, সিন্দেল, ডাকাত। সে, গুলিখোর, গাঁজাখোর, মদখোর। তার মা-মাসী জ্ঞান নাই। তার মুখ দেখ্‌লে অন্ন হয় না। তাকে আমি দেখ্‌তে পেলে এখনি দশ জুতা মারি! সে শ্যালা মিথ্যা কথা কয়—

কর্ত্তা। পতেটা কি কম মিথ্যাবাদী? সে ব্যাটা একদিন এসে বল্লে,—কালাচাঁদ খেতে পায় না, মাখ্‌তে পায় না,—তার কাপড়-চাদর-জুতা নাই—এমন কি, তার একটীও পয়সা নাই;—অথচ কালাচাঁদ, তার পরদিনই তোফা ধূতি-চাদর প'রে, মাছ-দই-সন্দেস নিয়ে, আমার বাড়ী উপস্থিত হ'লো। হেঁরে ব্যাটা পতে! বোম্বাই-বজ্জাত! কালাচাঁদের যদি একটীও পয়সা ছিল না, তবে সে পাঁচ-সাত টাকার বাজার ক'রে—এমন দশসের একটা রুইমাছ নিয়ে, কেমন করে এলো?—

রামঠাকুর। এঁ—এঁ, বলেন কি? আপনার সঙ্গে, সেই পাজি পতেটা এতদূর জুয়াচুরি কত্তে সাহস

করলে!! ব্যাটা বড় বাড় বেড়েচে! সুমুখে একবার পেলে, তাকে জুতিয়ে লম্বা ক'রে ফেলি! কড়িকাঠে টাঙ্গিয়ে জলবিছুটি দি!

এইরূপে নিভৃত-কক্ষে গুরুবিষয়ে গভীর গল্প চলিতেছে, এমন সময় পতিতপাবন বড়-কর্ত্তার গৃহে সমাগত হইল। বৈঠকখানার প্রকাণ্ড হ'লে, তখন কেহ ছিল না। পতিত আসিয়াই খানসামাকে জিজ্ঞাসিল,—"কর্ত্তা-মোশাই কোথা?"

চাকর। কর্ত্তা ও-ঘরে কাছারীর কাজ করচেন,—ও-ঘরে অন্য কাহারও এখন যাইতে নিষেধ।

পতিত। নিষেধ আবার কেন রে বাপু!—আমি পতিতপাবন পরামাণিক,—আমার নিষেধ কোথাও নাই।

চাকর। না—না,—তা হবে না,—তোমার ওখানে যাওয়া হবে না।

পতিত। (ক্রোধভরে) তুই কে-রে বাপু?—তুই হলি কাল্‌কের ছেলে, আজ ছমাসমাত্র চাকরী পেয়েচিস্—আমাকে এ বাড়ীতে নিষেধ করবার

তুই কে? তুই আজ আছিস্, কাল নেই। কিন্তু পতিত চিরকাল এ বাড়ীর চাকর।

এই কথা বলিতে-বলিতে পতিত সেই নিভৃত কক্ষের দিকে, বুক ফুলাইয়া, সতেজে হন্‌-হন্‌ চলিয়া যাইতে লাগিল। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ভৃত্যটী ফ্যাল্‌-ফ্যাল্‌ চাহিয়া রহিল।

পতিতকে কিন্তু অধিক দূর যাইতে হইল না। বড়-কর্ত্তা পতিতের সাড়া পাইয়াই সেই গুরু গল্প ভাঙ্গিয়া দিলেন। রামঠাকুর তৎক্ষণাৎ অমনি যেন পতিতকে প্রহারার্থ বীরদর্পে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কর্ত্তা, রামঠাকুরের উদ্দেশে ধীরে ধীরে বলিলেন,—"পতেকে হঠাৎ কিছু বলা হবে না—তুমি যেন হঠাৎ কোন গাল্‌ দিয়ে ফেলোনা।"

রামঠাকুর। আজ্ঞে, তা বৈ কি?

এইরূপ সংক্ষেপে কথা-বার্ত্তা শেষ হইলে, রামঠাকুর বাহির হইয়া পতিতের সম্মুখীন হইলেন।

পতিত। ঠাকুর-মোশাই গো! প্রণাম হই!

রামঠাকুর! জয়স্তু।

পতিত। (যোড়হাতে) একটু পদ-রজ আজ্ঞে করুন।

রামঠাকুর অমনি দক্ষিণ-পদ উঠাইয়া পতিতের বুকের নিকট ধরিলেন। পতিত প্রথমত তাহার মাথাটা সেই উত্তোলিত দক্ষিণ-পদে সংলগ্ন করিয়া দিল। কিছুক্ষণ এই ভাবে থাকিয়া, পতিত মাথা সরাইয়া লইল। শেষে, সে, দক্ষিণ-হস্তের সাহায্যে রামঠাকুরের পদতলের যাবতীয় ধূলিরাশি লইয়া, কতক নিজের ওষ্ঠে এবং কতক নিজের মাথায় স্থাপন করিল। অন্তিমে ভক্তিভাবে গদগদ হইয়া বলিল,—"আহা! সু-ব্রাহ্মণের পায়ের ধূলা অমৃতের তুল্য। ঠাকুর-মোশাই! আপনারাই ভগবান্,—আপনারাই রাত-দিনের কর্ত্তা।"

রামঠাকুর। পরামাণিক! সকল কথাই সত্য। কিন্তু এখন ঘোর কলি উপস্থিত। আজকাল আর আমাদিগকে মানে কে?—কয়জন লোক আছে

যে, ব্রাহ্মণ দেখিলে প্রণাম করে? পতিত! তোমার নাপিত-কুলে জন্মবটে, কিন্তু তোমার ন্যায় নিষ্ঠাবান্ ধার্ম্মিক, ভক্তব্যক্তি, আমি ব্রাহ্মণ-কায়স্থদের ভিতরও দেখিতে পাই না।

পতিত এবার যোড়হাতে প্রণাম করিল,—আবার রামঠাকুরের পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দিল,—বলিল,—"ঠাকুর গো! সমস্তই আপনার অনুগ্রহ! পতিত অতি ক্ষুদ্র মনুষ্য; তবে আপনারা অনুগ্রহ ক'রে পতিতকে যা কিছু বড় করেচেন।"

রামঠা র। আমরা পারি সব। শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণের এমনি শক্তি যে, তিনি ছোটকে বড় করিতে পারেন, বড়কে ছোট করিতে পারেন। দুর্ব্বাসা একদিন ক্রোধবশত দৃষ্টিমাত্রেই সংসারটা ভস্ম ক'রে ফেলেছিলেন। শুকদেব গোস্বামী কি? নারদ মুনিইবা কি? পরামাণিক! তুমি একবার এঁদের চরিত্র ভেবে দেখ দেখি! ভাবিলে, অবশ্যই তুমি এ তত্ত্ব বুঝিতে পারিবে।

পতিত। ঠাকুর-মোশাই! আপনি যা বল্‌চেন, তাই ঠিক্। তা, আমরা যতদিন বাঁচ্‌বো, আপনাদের চরণ-সেবা ক'রেই কাল কাটাবো; কিন্তু আমাদের ছেলে-পিলেরা এর-পর কি করবে বল্‌তে পারি না!

রামঠাকুর। তুমি ঠিক্ বল্‌চো!

পতিত। (যোড়হাতে) এইবার একটু বিপ্র-পাদক আজ্ঞে করুন।

পতিতের 'বিপ্রপাদ্‌ক' অর্থে ব্রাহ্মণের পদধৌত-জল।

রামঠাকুর বলিলেন,—"তথাস্তু।"

পতিত তখন একটী ছোট বাটীতে জল লইয়া রামঠাকুরের পদপ্রান্তে রাখিল। রামঠাকুর, দক্ষিণ-পদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটী সেই জলে ডুবাইলেন। পতিত সেই জল লইয়া পরমপ্রীতিভরে পান করিল। বলিল,—"আহা! এ জল অতিমিষ্ট। যেন আকের রস। আহা! কিবা গোলাপী গন্ধ! এ জল একবার পান করিলে, মানুষের আর ক্ষুধা-তৃষ্ণা হয়

না,—রোগ-শোক থাকে না। বিষয়-বাসনা থাকে না! মানুষ অমর হয়।

এইরূপ ভূমিকা করিয়া পতিত গ্রন্থারম্ভ করিল;—অর্থাৎ রামঠাকুরকে জিজ্ঞাসিল,—"বড়-কর্ত্তা-মোশাই কোথায়?"

রামঠাকুর। তাঁকে এখন কেন?

পতিত। তাঁর কাছে আমার এক নালিষ আছে। তিনি হলেন মা-বাপ, তাঁর কাছে না যেয়ে আর কোথায় যাবো।

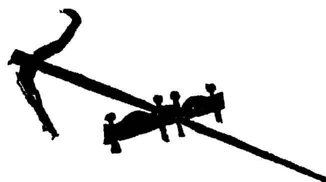
রামঠাকুর। কর্ত্তার এখন ঈষৎ অসুখ হয়েচে,—আমি তাঁকে ধরাধরি ক'রে বৈঠকখানায় নিয়ে আস্‌চি। তুমি একবার ওদিকে ব'স। বেশী বিলম্ব হবে না।

পতিত। আজ্ঞে,—আজ্ঞে,—এ দাস গোপনেই নালিষটা কর্‌বে! যদি অনুমতি হয়, তবে আমিই না-হয় ঐ ঘরে কর্ত্তার কাছে যাই।

রামঠাকুর। আচ্ছা, দাঁড়াও,—আমি কর্ত্তাকে একবার জিজ্ঞাসা করে আসি।

রামঠাকুরকে আর জিজ্ঞাসা করিতে যাইতে হইল না। কর্ত্তাই উচ্চকণ্ঠে বলিলেন,—"ঠাকুর মোশাই! পতেকে এদিকে আস্‌তে বল।"

শব্দমাত্রে পতিতপাবন আগে আগে, রামঠাকুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ বড়-কর্ত্তার কক্ষাভিমুখে যাত্রা করিল এবং করিলেন।



বলবে না। পতিতের গলায় পা দিন্,—দু-আধ-খানা ক'রে কেটে ফেলুন—পতিতকে গোর দিন্, বা গঙ্গার ঘাটে দাহ করুন,—পতিত সে-সময় একটীও কথা কবে না;—কিন্তু পতিত যে, মিথ্যা কথা কয়, এ-কথা বল্‌লে, কিছুতেই সহ্য কর্‌তে পার্‌বে না!"

কর্ত্তা। পতে! তুই কি একটীও মিথ্যা কথা ক'স্ না? ঠিক্ বলিস্!

পতিত। (যোড়হাতে) আজ্ঞে,—পূবের সূর্য্যি যদি পশ্চিমে গিয়ে উদয় হন, তবু পতিত মিথ্যা কথা কবে না।

কর্ত্তা। দেখ্,—এখন ওসব কথা রাখ্। পূব্-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণের কথা পরে হবে। আমার সাক্ষাতে ঠিক্ ক'রে বল্,—তুই কখন মিছে কথা কয়েচিস্ কি না?

পতিত। (যোড়হাতে) আজ্ঞে, আমি যদি কখন মিছে কথা কয়ে থাকি, তবে এখনি আমার মাথায় বজ্রাঘাত হউক।

কর্ত্তা। (বিরক্ত হইয়া) আরে! বাজপড়ার কথা আমি বলচি-না,—তুই ব্যাটা—

পতিত। (যোড়হাতে) তবে এখনি আমার ঠোঁটে-মুখে কুঠ হো'ক্,—গায়ে সাদা-সাদা চাকা-চাকা দাগ বেরুক্!

কর্ত্তা। তুই ব্যাটা বড় বদ্‌মাইস!

পতিত। আজ্ঞে, তাতে আমি অস্বীকার নই।

কর্ত্তা। ব্যাটাকে মারে কেগো!

পতিত। আজ্ঞে, তাতে-ও আমি গর্-রাজি নই।

কর্ত্তা। ওঃ, ব্যাটা কি ধড়ীবাজ মিথ্যাবাদী!!

পতিত। (যোড়হাতে) আজ্ঞে, এ গোলামকে ঐটী ক্ষমা করতে হবে! গোলাম, মিথ্যাকথা জানে না! কোন্ কথা কহিলে মিথ্যা কথা হয়,—এ দাস তাহা বুঝে না। মিথ্যা-কথার রঙ কেমন, এ চাকর তাহা দেখে নাই।

কর্ত্তা। (সুর একটু নরম্ করিয়া) আচ্ছা, তবে তুই বাপু! আমার সঙ্গে এমন মিথ্যা কথাটা কৈলি কেন?

পতিত জিহ্বা কাটিল। কিছুক্ষণ পরে জিহ্বা-টীকে মুখ-গহ্বরে গুটাইয়া লইয়া পতিত কহিল,—"সেকি কথা? এ রাজ-কাছারিতে আমার নামে বদ্‌নাম! নিশ্চয় আমার কেউ শত্রু আছে।"

কর্ত্তা। না-রে বাপু! তোর আবার শত্রু কে হ'তে গেল?

পতিত। (যোড়হাতে) আজ্ঞে, সে কথা বল্‌বেন না,—পতিতের শত্রু সকলেই।

কর্ত্তা। আচ্ছা, না-হয় তাই হলো,—কিন্তু তোর নামেত কেউ আমায় লাগায় নাই,—তুই যে নিজেই আমার সঙ্গে কার্‌সাঁজি খেলেচিস্‌!

পতিত। অ্যাঁ—অ্যাঁ! বলেন কি?

কর্ত্তা। তুই সে দিন বল্‌লি,—কালাচাঁদের কাছে এক পয়সাও নেই,—কালাচাঁদ খেতে পায় না,——

পতিত। আজ্ঞে, কালাচাঁদ-ত খেতেই পেত না; আপনিই তাকে আদর দিয়ে বাড়িয়েচেন এবং রাজভোগে খাওয়াচ্চেন। আমি মা-গঙ্গা-দরিমান্

বল্‌চি,—তার হাতে তখন একটী পয়সাও ছিল না।

কর্ত্তা। যদি একটী পয়সাও কালাচাঁদের ছিল না, তবে সে কেমন করিয়া তার পরদিনই আমাকে ৫।৭৲ টাকার সামগ্রী ভেট দিল?

পতিত। সে কথা আপনি জানেন, আর আপনার কালাচাঁদ জানে,—আমি কেমন ক'রে জান্‌বো? আপনাদের নাতী-ঠাকুরদাদার ভাব আমি কেমন ক'রে বুঝবো! আপনি কালাচাঁদ সম্বন্ধে আমাকে বল্লেন একরকম, আর এখন কল্লেন আর এক রকম। বল্লেন ফাঁসি শূলি, কল্লেন রত্ন-সিংহাসন। এখন সেই কালাচাঁদ আমাকে পথে দেখ্‌তে পেলেই লাঠী নিয়ে দৌড়ে মার্‌তে আসে———

কর্ত্তা। পতে! মুখ সামালে কথা ক'স্‌!

পতিত। সাম্‌লা-সাম্‌লিতে আর কাজ কি? আমাকে বিদেয় দিন্‌, আমি এ-দেশ থেকে চলে যাই। আমি এমন মারখেয়ে আর ক-দিন এখানে টিক্‌বো?

কর্ত্তা। কচি খোকাটী-গো! গলা টিপ্‌লে দুধ বার্ হয় কি না,—তাই তোকে কালাচাঁদ পথে দেখ্‌তে পেলেই অম্‌নি মার্‌তে যায়!! কালাচাঁদ অতি সুবোধ বালক।

রামঠাকুর ঘাড় দুলাইয়া বলিলেন,—"হাঁ-হাঁ,—কালাচাঁদ অতি সুবোধ! চাঁদে কলঙ্ক আছে, কিন্তু কালাচাঁদে মোটেই কলঙ্ক নাই!"

পতিত। আজ কালাচাঁদ অতি সুবোধ হবে বৈ কি? কিন্তু তখনকার কথাত——

কর্ত্তা। চোপ্‌রও,—বদ্‌মাস্! কোই হ্যায় রে!

রামঠাকুর। (কর্ত্তার উদ্দেশে) আপনি এত জোরে কথা কইবেন না,—আপনার বুকে হাঁপ লাগ্‌বে!

দুই জন দ্বারবান্ আসিয়া উপস্থিত হইল।

পতিত। "কোই হ্যায় হোয়ে" আর কাজ কি? কি কর্ত্তে হয়, আমাকেই বলুন-না,—তাই আমিই করি?

কর্ত্তা। চোপ্‌রও,—বদমাস্! ওস্‌কো শির্‌পর্ লাগাও জুতি।

পতিত তখন দড়াম করিয়া আছাড় খাইয়া পড়িল। পড়িয়া, বড়কর্ত্তার জুতা লইয়া, স্বয়ং সজোরে আপন কপালে আঘাত করিতে লাগিল। কিঞ্চিৎ রক্তপাত হইতে আরম্ভ হইলেও, পতিতের আঘাত-কার্য্য চটাচট্-পটাপট্ চলিতে লাগিল।

কর্ত্তা তখন রামঠাকুরের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "পতিতকে ধর, ধর।"

রামঠাকুর আজ্ঞামাত্রে পতিতের হাত হইতে জুতা কাড়িয়া লইলেন।

জুতা হস্তচ্যুত হইবামাত্র পতিত মূর্চ্ছার ভান করিয়া ভূতলে পতিত হইল।

কর্ত্তা দ্বারবান দুইজনকে বলিলেন, "তোমরা স্বস্থানে গিয়া ব'স। চাকরকে জল আনিতে বল।"

দ্বারবানদ্বয় চলিয়া গেল। চাকর জল আনিল। রামঠাকুর সেই জল পতিতের মুখে, চোখে, নাকে দিলেন,—বুকে, পিঠে, মাথায় দিলেন। পতিত মনে মনে ভাবিল—"ইহা ত এক কম বিপদ নয়? গায়ে এত জল ঢালে কেন? বোধ হয় কথা কহিলে

এ সকল লেঠা চুকিয়া যায়,—কিন্তু কথা কহিলে যদি অন্য বিপদ বাড়ে, তখন উপায়?” এইরূপ ভাবিয়া পতিত কথাও কহিতে পারিল না,—আর এদিকে রামঠাকুরের জলঢালা-কাণ্ডও থামিল না।

কর্ত্তা। (রামঠাকুরের প্রতি) ভাল ক’রে দেখ,—পতেটা ম’লো কি রৈল?

রামঠাকুর। মরে গেলেই বা ভাবনা কি আছে? সিন্দুকে লাস্ পূরে দুপুররাত্রে মাঝ-গঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়ে আস্‌বো।

কর্ত্তা ভাবিতে লাগিলেন, “তাই’ত পতেটা যদি সত্যসত্যই মরে, তা’হলে অনেক হাঙ্গামে পড়্‌তে হবে দেখ্‌চি। খুন হজম করা বড় সহজ নয়। বিশেষ, আজকালের আইন্‌-কানুন বড় খারাপ হয়েচে। আগে আগে যে সকল কাজ করেচি, তাহা হইতে সহজে সতেজে নিষ্কৃতি পেয়েচি! কিন্তু এখন আর সে-রকম আদালত নাই, ম্যাজিষ্টর নাই, জজ নাই! যাহা ঘটিয়াছে, তাহার আর চারা কি আছে? দেখা যাউক,—এখন কি হয়?”

পতিত ভাবিতে লাগিল;—ওরে বাবা! রামঠাকুরটা বলে কি? আমাকে সিন্দুকে পূরে গঙ্গায় ফেলে দিবে!! ওঃ, কি ভয়ানক বিপদে পড়েচি! যদি কথা কই, তবে দুটা দরোয়ান এসে এখনি মেরে খুন করবে! যদি চুপ করিয়া পড়িয়া থাকি,—তা'হলে রামঠাকুর এখনি হয় ত আমাকে সিন্দুকে পূরে ফেলে চাবি বন্দ করবে। আচ্ছা,—হঠাৎ কি সিন্দুকে পূরতে পারে? অনেকক্ষণ দেখবে-শুনবে,—তার পর ভাববে-চিন্তবে,—তবে ত সিন্দুকে পূরবে! সে কাজ করতে এখনও অনেক দেরী আছে! আপাতত আমি আড়ষ্ট হইয়া চুপ করিয়াই থাকি। যখন আমাকে পাথুরে-কোলা করিয়া ধরিয়া, সিন্দুকের ভিতর ঢোকাতে যাবে, তখনি আমি পাশমোড়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইব। কিন্তু একাজে এক দোষ ঘটে। রামঠাকুর যদি তখন মনে করেন,—আমি বাঁচিয়া উঠি নাই,—আমাকে "দানা" পাইয়াছে,—তাই কেবল আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম,—এবং এই ভাবিয়া, যদি রামঠাকুর তখনি আমার মাথায়

কুড়ুল মারেন,—তাহা হইলে ত একবারেই গিয়াছি! করি কি?—কথা কওয়া কিন্তু এখন কিছুতেই হবে না!"

পতিতপাবন প্রাণভয়ে এইরূপ ভাবিতেছে, বড়-কর্ত্তা তখন রামঠাকুরকে বলিলেন,—"ঠাকুর! দেখত,—পতেটার নাক্ দিয়া নিশ্বাস পড়্চে কি না?"

রামঠাকুর পতিতের নাকের নিকট তাঁহার দক্ষিণ-হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলিটী ধরিলেন।

'পতিত এখনও জীবিত আছে,'—পাছে রাম-ঠাকুর ইহা বুঝিতে পারেন,—তাই পরামাণিক তাহার নিশ্বাসটী বন্ধ করিয়া ফেলিল।

কর্ত্তা। (রামঠাকুরের প্রতি) নিশ্বাস পড়্চে কি?

রামঠাকুর। আজ্ঞে,—না।

কর্ত্তা। ভাল করিয়া দেখ,—বুঝিয়া ঠিক্ করিয়া বল,—নিশ্বাস পড়্চে কি না?

রামঠাকুর! আজ্ঞে, নিশ্বাসের লক্ষণ কিছুই দেখিতেছি না।

কর্ত্তা। নাকের নিকট অঙ্গুলি খানিকক্ষণ ধরিয়া থাক।

পতিত ভাবিয়াছিল, নাসিকাগ্রে একবার হাত লইয়া গিয়াই, রামঠাকুর তখনই হাত ফিরিয়া আনিবে এবং কর্ত্তাকে বলিবে, পতিতের নিশ্বাস নাই। এইরূপ আশায় আশ্বস্ত হইয়াই, পতিত নিশ্বাস বন্ধ করিয়াছিল; কিন্তু দৈবদুর্ব্বিপাকবশত হাত শীঘ্র ফিরিয়া আনা দূরে যাউক, রামঠাকুর যেন চিরস্থায়ীরূপে পতিতের নাকের গোড়ায় হাত রাখিয়া দিলেন।

পতিত নিশ্বাস বন্ধ করিয়া আর কতক্ষণ থাকিবে? পতিতের প্রাণ যায়-যায় হইল। পেট ফুলিল; বুক ফুলিল; মুখ ফুলিল; নাক ফুলিল; চক্ষু কপালে উঠিল; পতিত আর থাকিতে না পারিয়া, "বাপ্!" এইরূপ একটা উচ্চধ্বনি করিয়া হুস্-হুস্ শব্দে সমস্ত নিশ্বাসটা রামঠাকুরের হস্তে ফেলিয়া দিল।

রামঠাকুর উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—"পতিত

মরে নাই, মরে নাই! নিশ্বাস বন্ধ ক'রে ছিল। কল্লা ক'রে পড়েছিল।”

কর্ত্তা। বল কি? বল কি? ওঃ, ব্যাটা কি বাইস-বিটল! ঢের-ঢের বদমাইস দেখেচি, কিন্তু এমনটী আমি কখন দেখি নাই। দাও, ব্যাটার দেওয়ালে নাক ঘসাড়ে!

পতিত গাঝাড়া দিয়া উঠিয়া, যোড়হাতে বলিল, “আমার নাক ঘসাড়ে দিবার জন্য অন্য লোককে ডাকিবার দরকার কি? আমি নিজেই ঘস্‌ড়াচ্চি।”

এই কথা বলিয়া পতিত সেই ঘরের মেজেয় নাক ঘস্‌ড়াইতে আরম্ভ করিল।

কর্ত্তা। ওঠ্, ওঠ্,—আর ভাঁড়ামি কর্ত্তে হবে না—

পতিত উঠিয়া দাঁড়াইল।

কর্ত্তা। দেখ্, পতে! আজ তোকে আমি মাফ্ ক'রলাম;—ফের্ যদি তুই কালাচাঁদের কোন কথা মুখে আনিস্,—অথবা লোকের কাছে গল্প করিস্,—তবে তোকে কেটে দু-আধখানা ক'রে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিব।

পতিত। আজ্ঞে,—পতিত তা'তে অ-রাজি হবে না!

কর্ত্তা। পতে! ভাল ক'রে চোখ মুখ ধুয়ে, ঘরে যা!

পতিত। আজ্ঞে, পতিত কখন আপনার কথার অবাধ্য হ'তে পার্‌বে না। পতিত সব কর্‌তে প্যারে; প্যারে না কেবল, মিথ্যা কথা কইতে।

পতিত তখন চোখ মুখ ধুইল। কর্ত্তার সাক্ষাতে কাপড়টী সুস্পষ্টরূপে ঝাড়িয়া পড়িল। যাত্রাকালে অর্দ্ধস্ফুট স্বরে বলিল, "পতিত কখন মিথ্যা কথা কয় না।"

কর্ত্তা ভাবিতে লাগিলেন,—"পতেটাকে জব্দ করিবার উপায় কি? ঐ তুকাণ-কাটা, হেজলদাগড়া-টাকে ফাঁদে ফেলিবার উপায় কি?"

পতিত চলিয়া গেল। রামঠাকুর কিন্তু বসিয়াই রহিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, ভোলাময়রাণীর কথাটা আবার উত্থাপিত হয়। আবার তিনি,—কখন হাসিয়া, কখন গম্ভীর হইয়া, কখন ধীরে,

কখন দ্রুতপদে, কখন করুণ-ধীরে, কখন আদি-বীভৎসে—সেই অবনতাঙ্গী আতুরীর উপাখ্যান কীর্ত্তন করেন। কর্ত্তা মোদ্দা মুখ ফুটিয়া কোন কথাই কহিলেন না। রামঠাকুর, আতুরীর কথা উঠিবার জন্য মনে মনে ঠাকুর দেবতাকে মানসিক করিতে লাগিলেন।



## একাদশ পরিচ্ছেদ।

---

সপ্তগ্রাম কোথায়? মনে আছেত! তা, নিশ্চয়ই নাই। এ সব কথা মনে থাকিলে আর ভাবনা কি?

সপ্তগ্রাম, হুগলীর নিকটবর্ত্তী,—বর্ত্তমান ত্রিশ্‌-বিঘা ষ্টেসনের সমীপস্থ। সপ্তগ্রাম, বঙ্গের পূর্ব্ব রাজধানী।

ত্রিশবৎসর পূর্ব্বে সপ্তগ্রাম ভয়ানক জঙ্গল ছিল। উচ্চ মাটীর স্তূপ;—তার উপর নানারূপ বৃক্ষশ্রেণী, এবং নানারূপ লতাগুল্ম; আর, তার মাঝে মাঝে ভগ্ন-অট্টালিকার শেষ-চিহ্ন স্থানে স্থানে দৃষ্ট হইত।

এমনি নিবিড় অরণ্য হইয়াছিল যে, লোকে বলিত, সপ্তগ্রামে বাঘে বাসা করিয়াছে। কেহ বলিত, হাতী লুকাইয়া আছে। কেহ বা অনুমান করিত, বনে সদাই গণ্ডার বিচরণ করিতেছে।

ঙ্কল কথা, সে বনে সহসা কেহ প্রবেশ করিতে সাহসী হইত না।

ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ভূগর্ভে প্রোথিত বা ভূগর্ভ হইতে কিঞ্চিৎ উত্থিত অনেক বাড়ীর ভগ্নাবশেষ সপ্তগ্রামে দৃষ্ট হইত। কিন্তু রেল-কোম্পানীর কল্যাণে এখন আর তাহার কিছুই নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইষ্টইণ্ডিয়া-রেলপথে খোয়া দিবার জন্য, কোম্পানীর কর্ম্মচারীগণ মাটী খুঁড়িয়া সমস্ত ঘরবাড়ীর ইঁট পাথর তুলিয়া লয়েন। প্রস্তর ও ইষ্টক নির্ম্মিত যে সমস্ত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ভগ্ন অট্টালিকা ছিল, সেই সময় তৎসমুদায়েরই শেষ-চিহ্ন বিলুপ্ত হইয়া যায়। সেই সময়ই বহু পরিমাণে বনকাটা হয়। সেই সময় হইতেই গজ-ব্যাঘ্র-গণ্ডার-ভীতি নিবারিত হয়।

বত্রিশবৎসর পূর্ব্বে সপ্তগ্রামের সেই গভীর অরণ্যে দুইটী লোক বিচরণ করিতেছেন। একটী বৃদ্ধ, অপরটী যুবক। বৃদ্ধটী আগে আগে, যুবকটী পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছেন। বৃদ্ধটী পথ প্রদর্শক;

যুবকটী পথদ্রষ্টা। সেই নিবিড় জঙ্গলেও যাইবার পথ আছে। প্রশস্ত রাজপথ বা ফুট্‌পাথ অবশ্যই নাই,—গলিপথও নাই, গ্রাম্যপথও নাই, মেঠো পথও নাই,—আছে কেবল, পথচিহ্ন। অভিজ্ঞ ব্যক্তি ব্যতীত, কেবল সেই চিহ্ন দেখিয়া, অন্য কেহ সে পথে যাইতে একান্ত অক্ষম।

তপনদেব, গগন-পটের মধ্যখণ্ডে সমুদিত। ধরাধাম আলোক-মালায় বিভূষিত। কিন্তু সপ্তগ্রামের বন এমনি ঘোর-ঘন যে, সেই বিচরণকারী বৃদ্ধ এবং যুবকের অঙ্গে কিছুমাত্র সূর্য্য-রশ্মি লাগে নাই!

যাইতে যাইতে বৃদ্ধ হঠাৎ দাঁড়াইলেন। যুবককে বলিলেন,—"কোন্ পথ দিয়া যাবে?"

যুবক। আপনি যে পথ দিয়া আজ্ঞা কর্‌বেন—

বৃদ্ধ। এই সহজ পথে গেলে অনেক ঘোর হয়। পথ ভাল আছে বটে,—কিন্তু গড়ে পৌঁছিতে প্রায় দুই তিন দণ্ড দেরী লাগিবে। কিন্তু এই সম্মুখস্থ পথ দিয়া যাইতে পারিলে, অর্দ্ধদণ্ডেরও কমে তথায় যাওয়া যাইবে।

যুবক। তবে এই সম্মুখস্থ পথ দিয়া'ত যাওয়াই ভাল।

বৃদ্ধ। এই সম্মুখস্থ পথে কিন্তু কিঞ্চিৎ বিপদ আছে।

যুবক। কি বিপদ?

বৃদ্ধ। এই পথে যাইতে হইলে, প্রথমত একটা বৃহৎ গাছে উঠিতে হইবে। সেই গাছ হইতে আবার একটা অন্য গাছে লাফাইয়া পড়িতে হইবে। সেই দ্বিতীয় গাছ হইতে নামিয়া, একটু চলিয়া গিয়াই, এক ভগ্ন প্রাচীর দেখিবে। খুব সাবধানে সেই প্রাচীরে উঠিতে হইবে। সেই প্রাচীর হইতে প্রায় বার হাত নীচে এক লাফ দিতে হইবে। সেই নিম্নভূমে ইঁট, পাথর এবং অল্প জল আছে। সেই নিম্নভূমি হইতে একটু উচ্চে উঠিলেই গড়ের দ্বার দেখিবে। কিন্তু তুমি এমন বিপদজনক কার্য্য করিতে সক্ষম হইবে কি? যখন এক গাছ হইতে অন্য গাছে লাফাইতে হইবে, তখন দৈবাৎ যদি পড়িয়া যাও, তাহা হইলে একে-

বারে অতলস্পর্শে ডুবিয়া যাইবে। বৃক্ষের নিম্নেই প্রস্তর গ্রথিত এক জলাশয়। ঐ জলাশয় যে, কত গভীর, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। বারমাসই জল থাকে। বেশ বিবেচনা-পূর্ব্বক দেখ, তুমি এই বিপদপূর্ণ পথ দিয়া যাইতে সক্ষম হইবে কি না?

যুবক। আপনি যদি অনুমতি করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমি ঐ দুগম পথ দিয়া যাইতে সক্ষম হইব। ভয় আমার কিছুতেই নাই।

বৃদ্ধ। যুবকের শিরে হাত দিয়া, অশ্রুপূর্ণলোচনে বলিলেন, "বাছা! তুমি দীর্ঘজীবী হও। এমন সাহসপূর্ণ, তেজোময়-বাক্য বহুদিন আমাকে কেহ বলে নাই। বাছা! তোমার কথা শুনিয়া আমার আজ প্রাণ যুড়াইল।"

এই কথা বলিয়া বৃদ্ধ আগে আগে, কাঁটাবন ঠেলিয়া চলিলেন;—যুবক তৎপদানুসরণ করিয়া আসিতে লাগিলেন। অল্প দূর গিয়াই, বৃদ্ধ অঙ্গুলি নির্দ্দেশপূর্ব্বক দেখাইলেন,—"বাছা! ঐ দেখ—

সেই প্রকাণ্ড বৃক্ষ। উহা যেন আকাশ ভেদ করিয়া উচ্চে উঠিয়াছে। উহার শাখা-প্রশাখা চারিদিকে বিস্তৃত—যেন বহু বাহুদ্বারা পথিককুলকে আহ্বান করিতেছে।”

আরও একটু অগ্রসর হইয়া বৃদ্ধ বলিলেন, “এই স্থানে খুব সাবধানে পথ দেখিয়া আইস;—এখানে সর্পভয় আছে। বড় বড় গোখুরা সর্প ফণা উন্নত করিয়া, এস্থলে বেড়াইয়া বেড়ায়। দেখিও, যেন সাপের গায়ে পা লাগে না। সাপ দেখিলে ভীত বা সঙ্কুচিত হইবে না; ইতস্তত ধাবিত হইবে না;—উপেক্ষা করিয়া আপন মনে চলিয়া যাইবে। সাপ সুধুসুধু আক্রমণ বা দংশন করিবে না।”

সেই প্রকাণ্ড বৃক্ষতলে গিয়া বৃদ্ধ বলিলেন,—“ইহা কি গাছ, তাহা আমি জানি না। বোধ হয় কোন পার্ব্বতীয় বা আরণ্য বৃক্ষ হইবে! এ গাছে আগে তুমি উঠিবে, না, আগে আমি উঠিব?”

যুবক। যদি অনুমতি করেন, তবে আগে আমিই উঠি।

বৃদ্ধ। (হাসিয়া) না, আগে তোমার উঠিয়া কাজ নাই!—আমি কি রূপে, কি ভাবে গাছে উঠি, তাহা প্রথমে তুমি পর্য্যবেক্ষণ কর।

এই কথা বলিয়া বৃদ্ধ বিনা-আয়াসে, খুব সহজে খর্ খর্ করিয়া, বানরের ন্যায় গাছে উঠিয়া গেলেন। কিছু দূর গিয়া, স্থির হইয়া, তিনি এক ডালে বসিলেন। যুবককে বলিলেন,—"এই বার তুমি উঠ;—ধীরভাবে উঠ।"

বৃদ্ধের কার্য্য-কৌশল দেখিয়া, যুবক অবাক্। ভাবিলেন, "এই সত্তর বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ এরূপ তীরবেগে এই বৃহৎ বৃক্ষে উঠিয়া পড়িলেন! এমন দ্রুতগতিতে অথচ স্বচ্ছন্দভাবে উঠা'ত আমার কর্ম্ম নয়!"

প্রকাশ্যে আর কোন কথা না কহিয়া, যুবক, ধীরে ধীরে, বিশেষ সতর্কতার সহিত, গাছে উঠিতে লাগিলেন। বহু কষ্টে তিনি এ কার্য্যে সক্ষম হইলেন বটে, কিন্তু বৃদ্ধের গাছে উঠিতে

যে সময় লাগিয়াছিল, যুবকের তাহার চতুর্গুণ সময় লাগিল।

বৃক্ষশাখায় বৃদ্ধের নিকট যুবক পৌঁছিলে, বৃদ্ধ কহিলেন, "আইস আমার সঙ্গে। এই বৃক্ষের উচ্চ চূড়ায় যাইতে পারিবে ত?"

যুবক। আজ্ঞে, পারিব।

তখন উভয়ে সেই উচ্চ বৃক্ষের সর্ব্বোচ্চ শাখায় গিয়া উপনীত হইলেন। বৃদ্ধ কহিলেন,— "ঐ দেখ, অদূরে গঙ্গা প্রবাহিত। ঐ দেখ, পাল তুলিয়া নৌকা যাইতেছে। যে দিন আমরা গড়ের ভিতর বসিয়া মন্ত্রণা করি, সে দিন এই বৃক্ষোপরি দুই জন প্রহরী উঠিয়া চারি দিক পর্য্যবেক্ষণ করিতে থাকে। বাছা! তুমি চারি দিক ভাল করিয়া দেখিয়া লও। এমন উচ্চবৃক্ষ বোধ হয় এ দেশে আর নাই। আরও দেখ, পাতার এমন ঘন সন্নিবেশ যে, এ বৃক্ষোপরি উঠিলে, দূর হইতে তোমাকে কেহই দেখিতে পাইবে না; অথচ তুমি সকলকেই দেখিবে।

এই বৃক্ষ হইতে তীর ধনুক লইয়া যুদ্ধ করিবার বেশ সুবিধা! তুমি তীর ছুড়িবার কৌশল জান কি?

যুবক। আজ্ঞে,—না। খেলা-ছলে দুই-একবার তীর-ধনুক লইয়া হনুমান তাড়াইয়াছিলাম,—এই মাত্র!

বৃদ্ধ। তীরের তেজ বড় ভয়ঙ্কর। উপযুক্ত স্থানে অবস্থিত হইয়া, সুকৌশলে, শীঘ্রহস্তে তীর-ধনুক লইয়া যুদ্ধ করিতে পারিলে, শত্রুদল নিশ্চয়ই ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া পড়িবে। যখন আমাকে গ্রেফ্‌তার করিবার জন্য, এই বাঙ্গলার সমস্ত পুলিস এক হইল, আমাকে ধরিয়া ফাঁসি কাঠে লট্‌কাইবার জন্য রাজকর্ম্মচারীগণ প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিল, তখন আমি সাঁওতালদের দেশে গিয়া আশ্রয় লইলাম। লুকাইবার অমন সুবিধাজনক স্থান আর নাই। বন, পর্ব্বত, উপত্যকা, গিরিগুহা, নদীতট,—সাঁওতালদেশে সবই আছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বতাকীর্ণ এরূপ নিবিড় অরণ্য আছে যে, বোধ হয়,

তথায় আজ পর্য্যন্ত মনুষ্যের গতায়াত হয় নাই। সে দেশে আমাকে আর ধরে কে? বিশেষ, সাঁওতালগণ বড়ই বিশ্বাসী, অতিথি-সেবা-তৎপর, এবং শরণাগতের আশ্রয়। আমি তাহাদের মধ্যে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে লাগিলাম। ক্রমশ তাহাদের সহিত আমার সদ্ভাব জন্মিল। কালক্রমে সেই প্রসিদ্ধ সাঁওতাল-যুদ্ধ উপস্থিত হইল। আমিও তখন সাঁওতালদের একজন দলপতি হইয়া হাতে তীর-ধনুক ধরিলাম। ইংরেজের সহিত যুদ্ধ করিতে পাইব বলিয়া মনে বড়ই আহ্লাদ এবং উৎসাহ হইল। ইংরেজের সহিত সম্মুখ সমরে পরাস্ত হইব জানি, ইংরেজের গোলায় প্রাণ যাইবে, তাহাও বুঝি,—তথাচ ইংরেজকে একবার হাত দেখাইয়া মরিতে ইচ্ছা হইল;—আমরাও যে, জননীর স্তন্যপান করিয়াছি, ইংরেজকে তাহা একবার দেখাইবার সাধ জন্মিল। রণভেরী বাজিয়া উঠিবা মাত্র ইংরেজসৈন্য দলে-দলে সাঁওতালদেশে প্রবেশ করিল। আমি একশত সাঁওতাল যোদ্ধার

নেতা হইলাম। প্রত্যেক সাঁওতালই এক এক জন বীরপুরুষ; মৃত্যুকে ভয় করে না; প্রভুর আজ্ঞাবহ দাস; এবং যুদ্ধকালে ভীষ্ম-প্রতিজ্ঞ। আমরা মাজিষ্ট্রেরের বাঙ্গলা পোড়াইলাম, কালেক্টরি লুটিলাম, সিপাহীগণের নিকট হইতে সজোরে রসদ কাড়িয়া লইলাম, ভাল ভাল বন্দুক দখল করিলাম। কোম্পানি কাঁপিয়া উঠিল। আতঙ্কে শিহরিল। ভাবিল, বুঝি সাঁওতালগণই ইংরেজকে দেশছাড়া করিবে। আমি অবশ্যই বুঝিয়াছিলাম, সাঁওতালদের এ ব্যাপার জলবুদ্বুদ মাত্র,—ইহা বালির বাঁধ এবং জলের আল্পনার সহিত তুলনীয়।

যুবক। আপনি সে সময় কোন্ অস্ত্র লইয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন? বন্দুক না তীর?

বৃদ্ধ। (হাসিয়া) অস্ত্র কিছু ছিল না বলিলেই হয়। গোটা পঁচিশ বন্দুক ইংরেজের নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া সংগ্রহ করিয়াছিলাম, কিন্তু বন্দুক ছুড়িবার উপকরণ কিছুই ছিল না। বিশেষ, সাঁওতালগণ বন্দুক ছুড়িতে অভ্যস্ত নহে। তবে শোভার

স্বরূপ বন্দুকগুলি সঙ্গে থাকিত। তীর-ধনুকে তাহারা সিদ্ধ ছিল। কিন্তু সিদ্ধ থাকিলে কি হয়? তীরগুলি মরিচা ধরা, ধনুকের ছিলা ছেঁড়া।

যুবক। তবে যুদ্ধাদি হইত কিরূপে?

বৃদ্ধ। কামার ডাকাইয়া, তাড়াতাড়ি করিয়া সংক্ষিপ্তভাবে কতক তীরে শান্ দিয়া লইলাম। আমি বিশ হাজার তীরের বরাদ্দ করিলাম। লোহা ইস্পাত যুটিল বটে, কিন্তু এত কামার কোথা পাইব? যে কয়জন কামার পাইলাম,—তাহারা কারিকর প্রায় আমারই মতন। শুনিলাম, এদেশে আগে খুব ভাল কারিকর ছিল, কিন্তু ইংরেজের আমলে, অস্ত্রাদির আবশ্যকতা না থাকায় কামার-বংশ এক-কালে ধ্বংস হইয়াছে। পেটের দায়ে তাহারা কে কোথায় পলাইয়াছে, তাহার ঠিক নাই। অধুনা, তীর তৈয়ারি আর বড় হয় না। কাজেই কামার, তীর তৈয়ারিতে কারিকর হইতে পায় না। যাহা হউক কয়েকজন কামার আসিল; আমরাও তাহা-দের সহিত যোগ দিলাম। এই উভয়দলে একত্র

মিলিয়া আড়াই হাজারের অধিক তীর তৈয়ারি হইল না। তাহা লইয়াই যাত্রা করিলাম।

যুবক। কোন্ দিকে প্রথমে গেলেন?

বৃদ্ধ। সাতক্রোশ দূরে এক পুলিস-থানা ছিল। তথায় ষোলজন মাত্র ভোজপুরে সিপাহী থাকিত। সিপাহীগুলা অকর্ম্মার একশেষ। এক কড়ার যোগ্যতা নাই,—কেবল ছাতু খাইতে মজবুত। তাহাদের বন্দুক আছে, তোজদান আছে, সঙ্গীন আছে—আছে সব; কিন্তু সে সব নাড়ে কে? তোলে কে? আমরা এক দিন শেষরাত্রে "হো—হা" করিয়া গিয়া তথায় পড়িলাম, সিপাহীগুলা যে কোথায় পলাইয়া গেল, তাহার কিছুই নির্ণয় করিতে পারিলাম না। উহারা দক্ষ, কেবল পলাইবার সময়।

যুবক। শুনিয়াছি, সিপাহীগণ ত ভাল যোদ্ধা।

বৃদ্ধ। যুদ্ধ করিতে পারিবে না কেন?—কিন্তু বড়ই কাপুরুষ। উহারা যুদ্ধ করে, কেবল ইংরেজের ভয়ে। কর্ত্তব্যজ্ঞান আদৌ নাই।

যখন তাহারা বুঝে যে, যুদ্ধ না করিলেও, শেষে ইংরেজের হস্তে প্রাণ যাইবে, তখন উহারা বীরের ন্যায় যুদ্ধ করিতে থাকে। সে দিন থানায় যদি একটা লালমুখ গোরা থাকিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সিপাহীগণ পলাইত না। সেই গোরার আজ্ঞায় আমাদের সহিত প্রকৃত প্রস্তাবে যুদ্ধ আরম্ভ করিত। আর, সম্মুখ যুদ্ধ হইলে, যুদ্ধের ফলাফল কি হইত, তাহা বলা যায় না। কারণ উহারা আগ্নেয় অস্ত্রধারী—আমরা একরূপ নিরস্ত্র। আমি জানিতাম, "হো—হা" শব্দ করিলেই,—কেবল হাত-তালিতেই নিশ্চয় ভোজপুরে-গুলা পলাইবে,—তাই ওরূপ ভাবে আক্রমণ করিয়াছিলাম। গোরা থাকিলে, আক্রমণের কৌশল অন্যরূপ হইত।

যুবক। সে কৌশল কিরূপ?

বৃদ্ধ। (হাসিয়া) গভীর রাত্রে লঙ্কাদগ্ধ করিতাম। আগুন ধূ ধূ জ্বলিয়া উঠিত। গোরা-বাছাধনগণ অবশ্যই বাহির হইয়া পড়িত।

আমরা কোন নিভৃত স্থান হইতে, বা এইরূপ কোন বৃক্ষের উপর হইতে—গোরার-পোয়ের প্রাণ লইতাম। কিন্তু এই কয়টা ভোজপুরেদের জন্য এত কষ্ট স্বীকার করিব কেন?

যুবক। আচ্ছা,—ভোজপুরে মাত্রেই কি এত অকর্ম্মণ্য!

বৃদ্ধ। তা, কে বলিল? কতকগুলা ভোজপুরে আছে, কেবল ছাতু খাইবার জন্যই তাহারা জীবন ধারণ করিয়া থাকে। অন্যান্য ভোজপুর-বাসীগণ কর্ত্তব্য-পরায়ণ, স্থির-বুদ্ধি এবং রণ-দুর্ম্মদ।

যুবক। থানা দখলের পর কি করিলেন?

বৃদ্ধ। তার পর-দিন গিয়া কালেক্টরি লুঠিলাম।

যুবক। এখানে যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল কি?

বৃদ্ধ। (হাসিয়া) না। যুদ্ধ অধিকাংশ সময়ই করিতে হয় না, কেবল বাহু প্রতাপে শত্রু-পক্ষ পলায়। যদি প্রতি পদে যুদ্ধ করিতে

হইত, তাহা হইলে সংসার চলিত? যুদ্ধ আমাকে কোন দিনই করিতে হয় নাই;—কেবল একটী দিন মাত্র যুদ্ধ ঘটিয়াছিল। সে দিন শত্রু-পক্ষের রাঙ্গারক্তে কালো পাহাড় ভূষিত হইয়াছিল।

যুবক। সে যুদ্ধ কি রকম?

বৃদ্ধ। আমাকে এবং আমার দলকে ধরিবার জন্য তখন আড়াইশত গোরা এবং এক হাজার সিপাহী ধাবিত হইয়াছে। ইহারা আবার চারি পাঁচ দলে বিভক্ত হইয়া আমাকে অন্বেষণ করিতেছে। কিন্তু আমি ধরা না দিলে, আমাকে ধরিবে কিরূপে? ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ করিব,—ইহাই আমার চির-দিনের অন্তরের সাধ। একটা সুবিধাজনক স্থান পাইয়া সেই খানে আড্ডা করিলাম। সেই স্থানের এক দিকে ঢালু পাহাড়; সেই পাহাড়ের গায়ে বড় বড় গাছ, এবং বিষম কাঁটাবন। অভ্যাস না থাকিলে, এবং পথ না জানিলে, সে পাহাড়ে অন্যে উঠিতে অক্ষম। বেলা দ্বিপ্রহরে ইংরেজ-

ছাউনিতে একজন গোয়েন্দা সংবাদ দিল, আমি এখানে সসৈন্যে আছি। কোম্পানির সে ছাউনিতে তখন একশত গোরা এবং আড়াইশত সিপাহী ছিল। তাহারা সকলে অস্ত্র শস্ত্রে মণ্ডিত হইয়া, আমার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য ধাবিত হইল। সূর্য্যদেব পশ্চিম-গগনে পাটে বসিয়াছেন,—আমি একাকী, সাতজন বিশ্বস্ত অনুচরের সহিত, পর্ব্বতোপরি উঠিয়া দেখিতেছি,—সিপাহীদল আগে আগে, গোরা-দল পশ্চাৎ পশ্চাৎ তালে তালে পা ফেলিয়া আসিতেছে। বন্দুকের সঙ্গীন, সূর্য্যের রক্তিম আভায়, যেন রক্তময় হইয়া উঠিয়াছে। অশ্বারোহী, অশ্বে আরোহণ করিয়া, তরবারি ঘুরাইতেছে। ঐরাবত-সদৃশ বৃহৎ বৃহৎ গজ এবং উষ্ট্র, পৃষ্ঠদেশে তাঁবু এবং আহারীয় সামগ্রী বহন করিয়া আনিতেছে। তাহার পশ্চাতে প্রায় এক শত ডুলি, বাহকগণ স্কন্ধে করিয়া বহিতেছে। সৈন্যগণ অন্যূন পঞ্চাশ দলে বিভক্ত হইয়া শ্রেণীবদ্ধ হইয়া, দ্রুত-পদে অগ্রসর হইতেছে।

এই সমস্ত আয়োজন দেখিয়া আমি আমাকে বড় ভাগ্যবান্ বলিয়া ভাবিলাম। আজ কি শুভদিন! আমার অদৃষ্টে আর এমন দিন ঘটিবে না। এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বাঙ্গালীর জন্য এত উদ্যোগ! আমি আজ ইংরেজের সহিত সম্মুখ-সমরে আত্ম-প্রাণ বিসর্জ্জন করিব। পরক্ষণেই মনে হইল, আমি একা নহি; আমার সহিত এই দেড়শত লোক সুধু সুধু মরিবে কেন? কৌশল করিতে হইবে,—উপায়ে কার্য্য সিদ্ধি করিতে হইবে। সেই সাতজন অনুচরের সহিত পরামর্শ করিলাম। যোল-জন লোক থাকাই স্থির হইল।

যুবক। আপনি ত এইরূপ ভাবিতেছেন এবং পরামর্শ করিতেছেন; কিন্তু সেই ইংরেজ-সৈন্য ইতিমধ্যে কতদূর অগ্রসর হইল?

বৃদ্ধ। পথিমধ্যে এক গিরি-নদী ছিল। ক্ষুদ্র নদী,—জল বেশী ছিল না; হাঁটিয়া পার হওয়া যায়। সেই নদী হইতে পর্ব্বত অর্দ্ধ ক্রোশ পথ। ইংরেজ-সৈন্যদল সেই নদী

পার হইবামাত্র,—আমার সেনাগণ তীর-বর্ষণ আরম্ভ করিল ;—শ্রাবণের বারিধারার মত তীর বৃষ্টি হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে পাঁচ-শ জন ইংরেজ-সৈন্য তীর-বিদ্ধ হইয়া ভূপতিত হইল। আমরা আনন্দ-উল্লাসে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলাম। কিন্তু সে রব ক্ষণমাত্র! আমরা যেরূপ তীর-বর্ষণ আরম্ভ করিয়াছিলাম, তৎক্ষণাৎ ইংরেজ-সৈন্যগণ সেইরূপ গুলি-বর্ষণ আরম্ভ করিল। বন্দুকের সেই উত্তপ্ত গুলির আঘাতে একাদশ জন সাঁওতাল ভূপতিত হইয়া একবারে প্রাণত্যাগ করিল। দেখিতে দেখিতে আরও পাঁচজন মরিল। আমি তখন বংশীধ্বনি করিয়া নাগরায় কাঠি দিলাম। আমার সৈন্যদল পাহাড়ের অপর প্রান্ত দিয়া দ্রুতপদে পলাইল। ইংরেজ-সৈন্য বেগে অগ্রসর হইতে লাগিল। শত্রু পলায়িত দেখিয়া, তাহারা এক ভৈরব হুঙ্কার ছাড়িল। এই সময় এক মহা গোল উঠিল। তখন সূর্য্য ডুবু-ডুবু, সন্ধ্যা হয়-হয়! সন্ধ্যার ঈষৎ